PART- 03

সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী
রহ.

www.banglabookpdf.blogspot.com

আল মা–য়েদাহ

৫

নামকরণ

এ সূরার ১৫ রুকূ'র

هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ

আয়াতে উল্লেখিত "মা–য়েদাহ" শব্দ থেকে এ নামকরণ করা হয়েছে। কুরআনের অধিকাংশ সূরার নামের মতো এ সূরার নামের সাথেও এর আলোচ্য বিষয়বস্তুর তেমন কোন সম্পর্ক নেই। নিছক অন্যান্য সূরা থেকে আলাদা হিসেবে চিহ্নিত করার জন্যই একে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হোদাইবিয়ার সন্ধির পর ৬ হিজরীর শেষের দিকে অথবা ৭ হিজরীর প্রথম দিকে এ সূরাটি নাযিল হয়। সূরায় আলোচ্য বিষয় থেকে একথা সুস্পষ্ট হয় এবং হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনাও এর সত্যতা প্রমাণ করে। ষষ্ঠ হিজরীর যিলকাদ মাসের ঘটনা। চৌদ্দশ' মুসলমানকে সাথে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরাহ সম্পন্ন করার জন্য মক্কায় উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু কুরাইশ কাফেররা শত্রুতার বশবর্তী হয়ে আরবের প্রাচীনতম ধর্মীয় ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁকে উমরাহ করতে দিল না। অনেক তর্ক বিতর্ক ও বাদানুবাদের পর তারা এতটুকু মেনে নিল যে, আগামী বছর আপনারা আল্লাহর ঘর যিয়ারত করার জন্য আসতে পারেন। এ সময় একদিকে মুসলমানদেরকে কাবাঘর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করার নিয়ম কানুন বাতলে দেবার প্রয়োজন ছিল, যাতে পরবর্তী বছর পূর্ণ ইসলামী শান শওকতের সাথে উমরাহর সফর করা যায় এবং অন্য দিকে তাদেরকে এ মর্মে ভালভাবে তাকীদ করারও প্রয়োজন ছিল যে, কাফের শত্রু দল তাদের উমরাহ করতে না দিয়ে যে বাড়াবাড়ি করেছে তার জবাবে তারা নিজেরা অগ্রবর্তী হয়ে যেন আবার কাফেরদের ওপর কোন অন্যায় বাড়াবাড়ি ও জুলুম না করে বসে। কারণ অনেক কাফের গোত্রকে হজ্জ সফরের জন্য মুসলিম অধিকারভুক্ত এলাকার মধ্য দিয়ে যাওয়া আসা করতে হতো। মুসলমানদেরকে যেভাবে কাবা যিয়ারত করতে দেয়া হয়নি সেভাবে তারাও এ ক্ষেত্রে জোর পূর্বক এসব কাফের গোত্রের কাবা যিয়ারতের পথ বন্ধ করে দিতে পারতো। এ সূরার শুরুতে ভূমিকাস্বরূপ যে ভাষণটির অবতারণা করা হয়েছে সেখানে এ প্রসংগই আলোচিত হয়েছে। সামনের দিকে তের রুকূ'তে আবার এ প্রসংগটি উত্থাপিত হয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, প্রথম রুকূ' থেকে নিয়ে চৌদ্দ রুকূ' পর্যন্ত একই ভাষণের ধারাবাহিকতা চলছে। এ ছাড়াও এ সূরার মধ্যে আর যে সমস্ত বিষয়বস্তু আমরা পাই তা সবই একই সময়কার বলে মনে হয়।

বর্ণনার ধারাবাহিকতা দেখে মনে হয় এ সমগ্র সূরাটি একটি মাত্র ভাষণের অন্তরভুক্ত এবং সম্ভবত এটি একই সংগে নাযিল হয়েছে. আবার এর কোন কোন আয়াত পরবর্তীকালে পৃথক পৃথকভাবে নাযিল হতেও পারে এবং বিষয়বস্তুর একাত্মতার কারণে সেগুলোকে এ সূরার বিভিন্ন স্থানে জায়গা মতো জুড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু বর্ণনার ধারাবাহিকতার মধ্যে কোথাও সামান্যতম শূন্যতাও অনুভূত হয় না। ফলে একে দুটি বা তিনটি ভাষণের সমষ্টি মনে করার কোন অবকাশ নেই।

নাযিলের উপলক্ষ

আলে ইমরান ও আন্‌নিসা সূরা দু'টি যে যুগে নাযিল হয় সে যুগ থেকে এ সূরাটির নাযিলের যুগে পৌছতে পৌছতে বিরাজমান পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে অনেক বড় রকমের পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। ওহোদ যুদ্ধের বিপর্যয় যেখানে মদীনার নিকটতম পরিবেশও মুসলমানদের জন্য বিপদসংকুল করে তুলেছিল; সেখানে এখন সম্পূর্ণ ভিন্নতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আরবে ইসলাম এখন একটি অজেয় ও অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র একদিকে নজ্‌দ থেকে সিরিয়া সীমান্ত এবং অন্যদিকে লোহিত সাগর থেকে মক্কার নিকট এলাকা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। ওহোদে মুসলমানরা যে আঘাত পেয়েছিল তা তাদের হিম্মত ও সাহসকে দমিত এবং মনোবলকে নিস্তেজ করার পরিবর্তে তাদের সংকল্প ও কর্মোন্মাদনার জন্য চাবুকের কাজ করেছিল। তারা আহত সিংহের মতো গর্জে ওঠে এবং মাত্র তিন বছরের মধ্যে সমগ্র পরিস্থিতি পাল্টে দেয়। তাদের ক্রমাগত প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও আত্মদানের ফলে মদীনার চারদিকে দেড়শ' দুশ' মাইলের মধ্যে সমস্ত বিরোধী গোত্রের শক্তির দর্প চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। মদীনার ওপর সবসময় যে ইহুদী বিপদ শকুনির মতো ডানা বিস্তার করে রেখেছিল তার অশুভ পাঁয়তারার অবসান ঘটেছিল চিরকালের জন্য। আর হিজাযের অন্যান্য যেসব জায়গায় ইহুদী জনবসতি ছিল সেসব এলাকা মদীনার ইসলামী শাসনের অধীনে এসে গিয়েছিল। ইসলামের শক্তিকে দমন করার জন্য কুরাইশরা সর্বশেষ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল খন্দকের যুদ্ধে। এতেও তারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। এরপর আরববাসীদের মনে এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহই রইলো না যে, ইসলামের এ আন্দোলনকে খতম করার সাধ্য দুনিয়ার আর কোন শক্তির নেই। ইসলাম এখন আর নিছক একটি আকীদা-বিশ্বাস ও আদর্শের পর্যায় সীমিত নয়। নিছক মন ও মস্তিষ্কের ওপরই তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত নয়। বরং ইসলাম এখন একটি পরাক্রান্ত রাষ্ট্রীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং এ রাষ্ট্রের সীমানায় বসবাসকারী সমস্ত অধিবাসীর জীবনের ওপর তার কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত। এখন মুসলমানরা এতটা শক্তির অধিকারী যে, যে চিন্তা ও ভাবধারার ওপর তারা ঈমান এনেছিল সে অনুযায়ী স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলার এবং সে চিন্তা ও ভাবধারা ছাড়া অন্য কোন আকীদা-বিশ্বাস, ভাবধারা, কর্মনীতি অথবা আইন-বিধানকে নিজেদের জীবন ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করতে না দেয়ার পূর্ণ ইখতিয়ার তারা লাভ করেছিল।

তাছাড়া এ কয়েক বছরের মধ্যে ইসলামী মূলনীতি ও দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী মুসলমানদের নিজস্ব একটি কৃষ্টি ও সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছিল। এ সংস্কৃতি জীবনের যাবতীয় বিস্তারিত বিষয়ে অন্যদের থেকে আলাদা একটি স্বতন্ত্র ভাবমূর্তির অধিকারী ছিল। নৈতিকতা,

স্বভাব–চরিত্র, আচার–আচরণ, জীবন যাপন প্রণালী, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রে মুসলমানরা এখন অমুসলিমদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামী রাষ্ট্রের সমস্ত মুসলিম অধ্যুসিত জনপদে মসজিদ ও জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক জনবসতিতে ও প্রত্যেক গোত্রে একজন ইমাম নিযুক্ত রয়েছে। ইসলামের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন–কানুন অনেকটা বিস্তারিত আকারে প্রণীত হয়ে গেছে এবং মুসলমানদের নিজস্ব আদালতের মাধ্যমে সর্বত্র সেগুলো প্রবর্তিত হচ্ছে। লেনদেন ও কেনা–বেচা ব্যবসায় বাণিজ্যের পুরাতন রীতি ও নিয়ম রহিত করে নতুন সংশোধিত পদ্ধতির প্রচলন চলছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের স্বতন্ত্র বিধান তৈরী হয়ে গেছে। বিয়ে ও তালাকের আইন, শ'রয়ী পরদা ও অনুমতি নিয়ে অন্যের গৃহে প্রবেশের বিধান এবং যিনা ও মিথ্যা অপবাদের শাস্তি বিধান জারি হয়ে গেছে। এর ফলে মুসলমানদের সমাজ জীবন একটি বিশেষ ছাঁচে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। মুসলমানদের ওঠা বসা, কথাবার্তা, পানাহার, পোশাক–পরিচ্ছদ এবং জীবন যাপন ও বসবাস করার পদ্ধতিও একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্টে সমুজ্জল হয়ে উঠেছে। এভাবে ইসলামী জীবন একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করার এবং মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও তামাদ্দুন গড়ে ওঠার পর, তারা যে আবার কোন দিন অমুসলিম সমাজের সাথে মিলে একাত্ম হয়ে যেতে পারে। তেমনটি আশা করা তৎকালীন অমুসলিম বিশ্বের পক্ষে আর সম্ভবপর ছিল না।

হোদাইবিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হবার পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের পথে একটি বড় প্রতিবন্ধক ছিল এই যে, কুরাইশ কাফেরদের সাথে তাদের ক্রমাগত যুদ্ধ, সংঘর্ষ ও সংঘাত লেগেই ছিল। নিজেদের ইসলামী দাওয়াতের সীমানা বৃদ্ধি ও এর পরিসর প্রশস্ত করার কোন অবকাশই তারা পায়নি। হোদাইবিয়ার বাহ্যিক পরাজয় ও প্রকৃত বিজয় এ বাধা দূর করে দিয়েছিল। এর ফলে কেবল নিজেদের রাষ্ট্রীয় সীমায়ই তারা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরে পায়নি বরং আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলামের দাওয়াত বিস্তৃত করার সুযোগ এবং অবকাশও লাভ করেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজটিরই উদ্বোধন করলেন ইরান, রোম, মিসর ও আরবের বাদশাহ ও রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে পত্র লেখার মাধ্যমে। এ সাথে ইসলাম প্রচারকবৃন্দ মানুষকে আল্লাহর দীনের দিকে আহবান জানাবার জন্য বিভিন্ন গোত্র ও কওমের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লেন।

আলোচ্য বিষয়সমূহ

এ ছিল সূরা মা–য়েদাহ নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট। নিম্নলিখিত তিনটি বড় বড় বিষয় এ সূরাটির অন্তরভুক্ত ঃ

এক ঃ মুসলমানদের ধর্মীয়, তামাদ্দুনিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আরো কিছু বিধি নির্দেশ। এ প্রসংগে হজ্জ সফরের রীতি–পদ্ধতি নির্ধারিত হয়। ইসলামী নিদর্শনগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং কাবা যিয়ারতকারীদেরকে কোন প্রকার বাধা না দেবার হুকুম দেয়া হয়। পানাহার দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে হালাল ও হারামের চূড়ান্ত সীমা প্রবর্তিত হয়। জাহেলী যুগের মনগড়া বাধা নিষেধগুলো উঠিয়ে দেয়া হয়। আহলি কিতাবদের সাথে পানাহার ও তাদের মেয়েদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়। অযু,

গোসল ও তায়াম্মুম করার রীতি পদ্ধতি নির্ধারিত হয়। বিদ্রোহ ও অরাজকতা সৃষ্টি এবং চুরি–ডাকাতির শাস্তি প্রবর্তিত হয়। মদ ও জুয়াকে চূড়ান্তভাবে হারাম ও নিষিদ্ধ করা হয়। কসম ভাঙার কাফ্ফারা নির্ধারিত হয়। সাক্ষ প্রদান আইনের আরো কয়েকটি ধারা প্রবর্তন করা হয়।

দুই ঃ মুসলমানদেরকে উপদেশ প্রদান। এখন মুসলমানরা একটি শাসক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে যাওয়ায় তাদের হাতে ছিল শাসন শক্তি। এর নেশায় বহু জাতি পথভ্রষ্ট হয়। মজলুমীর যুগের অবসান ঘটতে যাচ্ছিল এবং তার চাইতে অনেক বেশী কঠিন পরীক্ষার যুগে মুসলমানরা পদার্পণ করেছিল। তাই তাদেরকে সম্বোধন করে বারবার উপদেশ দেয়া হয়েছে ঃ ন্যায়, ইনসাফ ও ভারসাম্যের নীতি অবলম্বন করো। তোমাদের পূর্ববর্তী আহ্লি কিতাবদের মনোভাব ও নীতি পরিহার করো। আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর হুকুম ও আইন কানুন মেনে চলার যে অংগীকার তোমরা করেছো তার ওপর অবিচল থাকো। ইহুদী ও খৃস্টানদের মতো তার সীমালংঘন করে তাদের মতো একই পরিণতির শিকার হয়ো না। নিজেদের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালার জন্য আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করো। মুনাফিকী নীতি পরিহার করো।

তিন ঃ ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে উপদেশ প্রদান। এ সময় ইহুদীদের শক্তি খর্ব হয়ে গেছে। উত্তর আরবের প্রায় সমস্ত ইহুদী জনপদ মুসলমানদের পদানত। এ অবস্থায় তাদের অনুসৃত ভ্রান্ত নীতি সম্পর্কে তাদেরকে আর একবার সতর্ক করে দেয়া হয়। তাদেরকে সত্য–সঠিক পথে আসার দাওয়াত দেয়া হয়। এ ছাড়া যেহেতু হোদাইবিয়ার চুক্তির কারণে সমগ্র আরবে ও আশপাশের দেশগুলোয় ইসলামের দাওয়াত প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তাই খৃস্টানদেরকেও ব্যাপকভাবে সম্বোধন করে তাদের বিশ্বাসের ভ্রান্তিগুলো জানিয়ে দেয়া হয় এবং শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনার জন্য তাদেরকে আহবান জানানো হয়। যেসব প্রতিবেশী দেশে মূর্তিপূজারী ও অগ্নি উপাসক জাতির বসবাস ছিল সেসব দেশের অধিবাসীদেরকে সরাসরি সম্বোধন করা হয়নি। কারণ ইতিপূর্বে তাদের সমমনা আরবের মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে মক্কায় যে হেদায়াত নাযিল হয়েছিল তা–ই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۬ؕ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ①

হে ঈমানদারগণ! বন্ধনগুলো পুরোপুরি মেনে চলো।[১] তোমাদের জন্য চতুষ্পদ গৃহপালিত পশু জাতীয় সব পশুই হালাল করা হয়েছে[২] তবে সামনে যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের জানানো হবে সেগুলো ছাড়া। কিন্তু ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করা নিজেদের জন্য হালাল করে নিয়ো না।[৩] নিসন্দেহে আল্লাহ যা ইচ্ছা আদেশ করেন।[৪]

১. অর্থাৎ এ সূরায় তোমাদের প্রতি যে সমস্ত নীতি–নিয়ম ও বিধি–বিধান আরোপ করা হচ্ছে এবং সাধারণভাবে আল্লাহর শরীয়াত যেগুলো তোমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে, সেগুলো মেনে চলো। ভূমিকা স্বরূপ এ ছোট্ট একটি বাক্যের অবতারণা করার পর এবার সে বাঁধনগুলোর বর্ণনা শুরু হচ্ছে যেগুলো মেনে নেবার হুকুম দেয়া হয়েছে।

২. মূল শব্দ হচ্ছে, "বাহীমাতুল আন'আম"। "আন'আম" শব্দটি বললে আরবী ভাষায় উট, গরু, ছাগল ও ভেড়া বুঝায়। আর "বাহীমা" বলতে প্রত্যেক বিচরণশীল চতুষ্পদ জন্তু বুঝানো হয়। যদি আল্লাহ বলতেন, "আন'আম" তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, তাহলে এর ফলে কেবলমাত্র আরবীতে যে চারটি জন্তুকে আন'আম বলা হয় সে চারটি জন্তুই হালাল হতো। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন ঃ গৃহপালিত পশু পর্যায়ের বিচরণশীল চতুষ্পদ প্রাণী তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এর ফলে নির্দেশটি ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং গৃহপালিত গবাদি পশু পর্যায়ের সমস্ত বিচরণশীল চতুষ্পদ প্রাণী এর আওতায় এসে গেছে। অর্থাৎ যাদের শিকারী দাঁত নেই, যারা জান্তব খাদ্যের পরিবর্তে উদ্ভিজ্জ খাদ্য খায় এবং অন্যান্য প্রাণীগত বৈশিষ্টের ক্ষেত্রে আরবের 'আন'আম'–এর সাথে সাদৃশ্য রাখে। এ সংগে এখানে এ ইংগিতও পাওয়া যায় যে, গৃহপালিত চতুষ্পদ পশুর বিপরীতধর্মী যে সমস্ত পশুর শিকারী দাঁত আছে এবং অন্য প্রাণী শিকার করে খায়, সেসব পশু হালাল নয়। এ ইংগিতটিকে সুস্পষ্ট করে হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, শিকারী হিংস্র প্রাণী হারাম। অনুরূপভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন সব পাখিকেও হারাম গণ্য করেছেন যাদের শিকারী পাঞ্জা আছে, অন্য প্রাণী

শিকার করে খায় বা মৃত খায়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন ঃ

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِىْ مَخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرَ –

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিকারী দাঁত সম্পন্ন প্রত্যেকটি পশু এবং নখরধারী ও শিকারী পাঞ্জা সম্পন্ন প্রত্যেকটি পাখি আহার করতে নিষেধ করেছেন।" এর সমর্থনে অন্যান্য বহু সংখ্যক সাহাবীর হাদীসও বর্ণিত হয়েছে।

৩. কাবাঘর যিয়ারত করার জন্য যে ফকিরী পোশাক পরা হয় তাকে বলা হয় "ইহরাম।" কাবার চারদিকে কয়েক মনযিল দূরত্বে একটি করে সীমানা চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। কোন যিয়ারতকারীর নিজের সাধারণ পোশাক বদলে ইহরামের পোশাক পরিধান না করে এ সীমানাগুলো পার হয়ে এগিয়ে আসার অনমুতি নেই। এ পোশাকের মধ্যে থাকে কেবল মাত্র একটি সেলাই বিহীন লুংগী ও একটি চাদর। চাদরটি দিয়ে শরীরের ওপরের অংশ ঢাকা হয়। একে ইহরাম বলার কারণ হচ্ছে এই যে, এ পোশাক পরিধান করার সাথে সাথে মানুষের জন্য এমন অনেক কাজ হারাম হয়ে যায় যেগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় তার জন্য হালাল ছিল। যেমন ক্ষৌরকার্য করা, সুগন্ধি ব্যবহার, সবধরনের সাজসজ্জা, সৌন্দর্য চর্চা, যৌনাচার ইত্যাদি। এ অবস্থায় কোন প্রাণী হত্যা করা যাবে না, শিকার করা যাবে না এবং শিকারের খোঁজও দেয়া যাবে না।, এগুলোও এ বিধিনিষেধের অন্তরভুক্ত।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী একচ্ছত্র শাসক। তিনি নিজের ইচ্ছেমতো যে কোন হুকুম দেবার পূর্ণ ইখতিয়ার রাখেন। তাঁর নির্দেশ ও বিধানের ব্যাপারে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করার বা আপত্তি জানানোর কোন অধিকার মানুষের নেই। তাঁর সমস্ত বিধান জ্ঞান, প্রজ্ঞা, যুক্তি, ন্যায়নীতি ও কল্যাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও ঈমানদার মুসলিম যুক্তিসংগত, ন্যায়ানুগ ও কল্যাণকর বলেই তার আনুগত্য করে না বরং একমাত্র সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহর হুকুম বলেই তার আনুগত্য করে। যে জিনিসটি তিনি হারাম করে দিয়েছেন তা কেবল তাঁর হারাম করে দেবার কারণেই হারাম হিসেবে গণ্য। আর ঠিক তেমনিভাবে যে জিনিসটি তিনি হালাল করে দিয়েছেন সেটির হালাল হবার পেছনে অন্য কোন কারণ নেই বরং যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ এসব জিনিসের মালিক তিনি নিজের দাসদের জন্য এ জিনিসটি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন বলেই এটি হালাল। তাই কুরআন মজীদ সর্বোচ্চ বলিষ্ঠতা সহকারে এ মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, কোন বস্তুর হালাল ও হারাম হবার জন্য সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহর অনুমোদন ও অননুমোদন ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন ভিত্তির আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে আল্লাহ যে কাজটিকে বৈধ গণ্য করেছেন সেটি বৈধ এবং যেটিকে অবৈধ গণ্য করেছেন সেটি অবৈধ, এ ছাড়া মানুষের জন্য কোন কাজের বৈধ ও অবৈধ হবার দ্বিতীয় কোন মানদণ্ড নেই।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ②

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য ও ভক্তির নিদর্শনগুলোর অমর্যাদা করো না।[৫] হারাম মাসগুলোর কোনটিকে হালাল করে নিয়ো না। কুরবানীর পশুগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করো না। যেসব পশুর গলায় আল্লাহর জন্য উৎসর্গীত হবার আলামত স্বরূপ পট্টি বাঁধা থাকে তাদের ওপরও হস্তক্ষেপ করো না। আর যারা নিজেদের রবের অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টির সন্ধানে সম্মানিত গৃহের (কাবা) দিকে যাচ্ছে তাদেরকেও উত্যক্ত করো না।[৬]. হাঁ, ইহরামের অবস্থা শেষ হয়ে গেলে অবশ্যি তোমরা শিকার করতে পারো।[৭] আর দেখো, একটি দল তোমাদের জন্য মসজিদুল হারামের পথ বন্ধ করে দিয়েছে, এ জন্য তোমাদের ক্রোধ যেন তোমাদেরকে এতখানি উত্তেজিত না করে যে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা অবৈধ বাড়াবাড়ি করতে শুরু কর।[৮] নেকী ও আল্লাহভীতির সমস্ত কাজে সবার সাথে সহযোগিতা করো এবং গুনাহ ও সীমালংঘনের কাজে কাউকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। তাঁর শাস্তি বড়ই কঠোর।

৫. যে জিনিসটি কোন আকীদা–বিশ্বাস, মতবাদ, চিন্তাধারা, কর্মনীতি বা কোন ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে তাকে তার "শেআ'র'' বলা হয়। কারণ সেটি তার আলামত, নিদর্শন বা চিহ্নের কাজ করে। সরকারী পতাকা, সেনাবাহিনী ও পুলিশ প্রভৃতির ইউনিফরম, মুদ্রা, নোট ও ডাকটিকিট সরকারের "শেআ'র" বা নিশানীর অন্তরভুক্ত। সরকার নিজের বিভিন্ন বিভাগের কাছে বরং তার অধীনস্থ সকলের কাছে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দাবী জানায়। গীর্জা, ফাঁসির মঞ্চ ও ক্রুশ খৃষ্টবাদের শেআ'র বা নিশানী। টিকি, পৈতা ও মন্দির ব্রাহ্মণ্যবাদের নিশানী। ঝুঁটি বাঁধা চুল, হাতের বালা ও কৃপাণ ইত্যাদি শিখ ধর্মের নিশানী। হাতুড়ি ও কাস্তে সমাজতন্ত্রের নিশানী। স্বস্তিকা আর্য বংশ–পূজার নিশানী। এ ধর্ম বা মতবাদগুলো তাদের নিজেদের অনুসারীদের কাছে এ নিদর্শনগুলোর প্রতি মর্যাদা

প্রদর্শনের দাবী করে। যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যবস্থার নিশানীসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি নিশানীর অবমাননা করে, তাহলে এটি মূলত তার ঐ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করার আলামত হিসেবে বিবেচিত হয়। আর ঐ অবমাননাকারী নিজে যদি ঐ ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত হয়, তাহলে তার এ কাজটি তার নিজের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সমার্থক বলে গণ্য হয়।

"শাআইর" হচ্ছে "শে'আর" শব্দের বহুবচন। "শাআইরুল্লাহ" বলতে এমন সব আলামত বা নিশানী বুঝায় যা শিরক, কুফরী ও নাস্তিক্যবাদের পরিবর্তে নির্ভেজাল আল্লাহর আনুগত্য সূচক মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করে। এ ধরনের আলামত ও চিহ্ন যেখানে যে মতবাদ ও ব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যাবে, প্রত্যেক মুসলমানকে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে সেখানে শর্ত হচ্ছে তাদের মনস্তাত্বিক পটভূমিতে নির্ভেজাল আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের মানসিকতা বিরাজ করা চাই এবং সকল প্রকার মুশরিকী ও কুফরী চিন্তার মিশ্রণ থেকে তাদের মুক্ত হওয়া চাই। কোন ব্যক্তি, সে কোন অমুসলিম হলেও, যদি তার নিজের বিশ্বাস ও কর্মের মধ্যে এক আল্লাহর আরাধনা ও ইবাদাতের কোন অংশ থেকে থাকে তাহলে অন্তত সেই অংশে মুসলমানদের উচিত তার সাথে একাত্ম হওয়া এবং সেই অধ্যায়ে তার যে সমস্ত "শে'আর" নির্ভেজাল আল্লাহর ইবাদাত উপসনার আলামত হিসেবে বিবেচিত হবে সেগুলোর প্রতিও পূর্ণ মর্যাদা প্রদর্শন করা। এ বিষয়ে তার ও আমাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই বরং সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য আছে। সে আল্লাহর বন্দেগী করে কেন, এটা বিরোধের বিষয় নয়। বরং বিরোধের বিষয় হচ্ছে এই যে, আল্লাহর বন্দেগীর সাথে সে অন্য কিছুর বন্দেগীর মিশ্রণ ঘটাচ্ছে কেন?

মনে রাখতে হবে, আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এ নির্দেশ এমন এক সময় দেয়া হয়েছিল যখন আরবে মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। মক্কা ছিল মুশরিকদের দখলে। আরবের প্রত্যক এলাকা থেকে মুশরিক গোত্রের লোকেরা হজ্জ ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কাবাগৃহের দিকে আসতো। এ জন্য অনেক গোত্রকে মুসলমানদের এলাকা অতিক্রম করতে হতো। তখন মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তারা মুশরিক হলেও এবং তোমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করলেও তারা যখন আল্লাহর ঘরের দিকে যাচ্ছে তখন তাদেরকে বাধা দিয়ো না। হজ্জের মাসগুলোয় তাদের ওপর আক্রমণ করো না এবং আল্লাহর সমীপে নজরানা পেশ করার জন্য যে পশুগুলো তারা নিয়ে যাচ্ছে সেগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করো না। কারণ তাদের বিকৃত ধর্মে আল্লাহর আরাধনার যতটুকু অংশ বাকি রয়ে গেছে তা অবশ্যি সম্মান লাভের যোগ্য, অসম্মান লাভের নয়।

৬. আল্লাহর নিশানীসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সাধারণ নির্দেশ দেবার পর কয়েকটি নিশানীর নাম উল্লেখ করে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ তৎকালীন যুদ্ধাবস্থার দরুন মুসলমানদের হাতে ঐগুলোর অবমাননা হবার আশংকা দেখা দিয়েছিল। এ কয়েকটি নিশানীর নাম উল্লেখ করার অর্থ এ নয় যে, কেবল এ ক'টিই মর্যাদা লাভের যোগ্য।

৭. ইহ্‌রামও আল্লাহর একটি অন্যতম নিশানী। এ ব্যাপারে যে বিধিনিষেধগুলো আরোপিত হয়েছে তার মধ্য থেকে কোন একটি ভংগ করার অর্থই হচ্ছে ইহ্‌রামের

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ
إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ
ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ
لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ③

তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে মৃতজীব[৯], রক্ত, শূকরের গোশ্ত, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে যবেহকৃত জীব[১০] এবং কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে, আহত হয়ে, ওপর থেকে পড়ে গিয়ে বা ধাক্কা খেয়ে মরা অথবা কোন হিংস্র প্রাণী চিরে ফেলেছে এমন জীব, তোমরা জীবিত পেয়ে যাকে যবেহ করে দিয়েছো সেটি ছাড়া।[১১] আর যা কোন বেদীমূলে[১২] যবেহ করা হয়েছে তাও তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে।[১৩] এ ছাড়াও শর নিক্ষেপের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য নির্ণয় করাও তোমাদের জন্য জায়েয নয়।[১৪] এগুলো ফাসেকীর কাজ। আজ তোমাদের দীনের ব্যাপারে কাফেররা পুরোপুরি নিরাশ হয়ে পড়েছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো।[১৫] আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করেছি এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছি (কাজেই তোমাদের ওপর হালাল ও হারামের যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে তা মেনে চলো।)[১৬] তবে যদি কোন ব্যক্তি ক্ষুধার জ্বালায় বাধ্য হয়ে ঐগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি জিনিস খেয়ে নেয় গুনাহের প্রতি কোন আকর্ষণ ছাড়াই, তাহলে নিসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।[১৭]

অবমাননা করা। তাই আল্লাহর নিশানী প্রসংগে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, যতক্ষণ তোমরা ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় থাকো ততক্ষণ শিকার করা আল্লাহর ইবাদাতের নিশানীগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি নিশানীর অবমাননা বুঝাবে। তবে শরীয়াতের বিধি অনুযায়ী ইহ্রামের সীমা খতম হয়ে গেলে তোমাদের শিকার করার অনুমতি আছে।

৮. যেহেতু কাফেররা সে সময় মুসলমানদেরকে কাবা ঘরের যিয়ারতে বাধা দিয়েছিল এবং আরবের প্রাচীন রীতির বিরুদ্ধাচরণ করে মুসলমানদেরকে হজ্জ থেকেও বঞ্চিত করেছিল, তাই মুসলমানদের মনে এ চিন্তার উদয় হলো যে, যেসব কাফের গোত্রকে কাবা যাবার জন্য মুসলিম অধ্যুসিত এলাকার কাছ দিয়ে যেতে হয়, তাদের হজ্জযাত্রার পথ তারা বন্ধ করে দেবে এবং হজ্জের মওসুমে তাদের কাফেলার ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালাবে। কিন্তু এ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তাদেরকে এ সংকল্প থেকে বিরত রাখলেন।

৯. অর্থাৎ যে পশুর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

১০. অর্থাৎ যাকে যবেহ করার সময় আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নাম নেয়া হয়। অথবা যাকে যবেহ করার আগে এ মর্মে নিয়েত করা হয় যে, অমুক মহাপুরুষ অথবা অমুক দেবী বা দেবতার নামে উৎসর্গীত। (সূরা বাকারার ১৭১ টীকা দেখুন)।

১১. অর্থাৎ যে প্রাণীটি উপরোক্ত দুর্ঘটনাগুলোর শিকার হবার পরও মরেনি। বরং তার মধ্যে জীবনের কিছু আলামত পাওয়া যায়। তাকে যবেহ করলে তার গোশ্‌ত খাওয়া যেতে পারে। এ থেকে একথাও জানা যায় যে, হালাল প্রাণীর গোশ্‌ত একমাত্র যবেহর মাধ্যমে হালাল হয়। একে হালাল করার আর দ্বিতীয় কোন সঠিক পথ নেই। এ 'যবেহ' ও 'যাকাত' ইসলামের একটি বিশেষ পরিভাষা। এর অর্থ হচ্ছে, গলার এতখানি অংশ কেটে দেয়া যার ফলে শরীরের সমস্ত রক্ত ভালভাবে বের হয়ে যেতে পারে। এক কোপে কেটে বা গলায় ফাঁস দিয়ে অথবা অন্য কোনভাবে প্রাণী হত্যা করলে যে ক্ষতিটা হয় তা হচ্ছে এই যে, এর ফলে রক্তের বেশীর ভাগ অংশ তার শরীরের মধ্যে আটকে যায় এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জমে গিয়ে তা গোশ্‌তের সাথে মিশে যায়। অন্য দিকে যবেহ করলে মস্তিষ্কের সাথে শরীরের সম্পর্ক দীর্ঘ সময় বজায় থাকে। এর ফলে প্রতিটি শিরা উপশিরা থেকে রক্ত নিংড়ে বেরিয়ে আসে। এভাবে সারা দেহের গোশ্‌ত রক্তশূন্য হয়ে যায়। রক্ত হারাম একথা আগেই বলা হয়েছে। কাজেই গোশ্‌তের পাক ও হালাল হবার জন্য অবশ্যি তার পুরোপুরি রক্তশূন্য হওয়া অপরিহার্য।

১২. আসলে 'নুসুব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে এমন সব স্থান বুঝায় যেগুলোকে লোকেরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর উদ্দেশ্যে বলিদান ও নজরানা পেশ করার জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। সেখানে কোন পাথর বা কাঠের মূর্তি থাক বা না থাক তাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের ভাষায় এরি সমার্থবোধক শব্দ হচ্ছে বেদী বা 'আস্তানা'। কোন মহাপুরুষ, কোন দেবতা বা মুশরিকী আকীদার সাথে এ স্থানটি জড়িত থাকে।

১৩. এখানে একথাটি ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, পানাহারযোগ্য দ্রব্যাদির মধ্যে শরীয়াত যেগুলোকে হালাল ও হারাম বলে দিয়েছে সেগুলোর হালাল ও হারাম হবার মূল ভিত্তি তাদের ভেষজ উপকারিতা ও অনুপকারিতা নয়। বরং তাদের নৈতিক লাভ ও ক্ষতিই এর ভিত্তি। প্রাকৃতিক বিষয়গুলোকে আল্লাহ মানুষের নিজের প্রচেষ্টা, সাধনা, অনুসন্ধান ও গবেষণার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। জীব ও জড় পদার্থগুলোর মধ্যে কোন্‌টি মানুষের দেহে সুখাদ্যের যোগান দিতে পারে এবং কোন্‌টি খাদ্য হিসেবে তার জন্য ক্ষতিকর ও অনুপকারী তা উদ্ভাবন ও নির্ণয় করার দায়িত্ব মানুষের নিজের ওপর বর্তায়। এসব বিষয়ে তাকে পথনির্দেশ দেবার দায়িত্ব শরীয়াত নিজের কাঁধে তুলে নেয়নি। এ

দায়িত্ব যদি শরীয়াত নিজের কাঁধে তুলে নিতো তাহলে সর্বপ্রথম 'বিষ' হারাম বলে ঘোষণা করতো। কিন্তু আমরা দেখি কুরআন ও হাদীসের কোথাও এর অথবা মানুষের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর অন্যান্য মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের আদৌ কোন উল্লেখই নেই। শরীয়াত খাদ্যের ব্যাপারে যে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করে তা হচ্ছে এই যে, কোন্ খাদ্যটি মানুষের নৈতিকতার ওপর কি প্রভাব বিস্তার করে, আত্মার পবিত্রতার জন্য কোন্ খাদ্যটি কোন্ পর্যায়ভুক্ত এবং খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতিগুলোর মধ্য থেকে কোন্ পদ্ধতিটি বিশ্বাস ও প্রকৃতিগত দিক দিয়ে ভুল বা নির্ভুল? যেহেতু এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাবার সাধ্য মানুষের নেই এবং এ অনুসন্ধান চালাবার জন্য যে উপায় উপকরণের প্রয়োজন তাও মানুষের আয়ত্বের বাইরে, আর এ জন্যই এসব ব্যাপারে মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুল করে বসেছে, তাই শরীয়াত কেবলমাত্র এসব বিষয়েই তাকে পথনির্দেশ দেয়। যেগুলোকে সে হারাম গণ্য করেছে, সেগুলোকে হারাম করার কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষের নৈতিক বৃত্তির ওপর সেগুলোর খারাপ প্রভাব পড়ে বা সেগুলো তাহারাত ও পবিত্রতা বিরোধী অথবা কোন খারাপ আকীদার সাথে সেগুলোর সম্পর্ক রয়েছে। পক্ষান্তরে যে জিনিসগুলোকে শরীয়াত হালাল গণ্য করেছে সেগুলোর হালাল হবার কারণ হচ্ছে এই যে, উপরোল্লিখিত দোষগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি দোষেও সেগুলো দুষ্ট নয়।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, এ জিনিসগুলোর হারাম হবার কারণ আল্লাহ আমাদের বুঝাননি কেন? কারণ বুঝিয়ে দিলে তো আমরা যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারতাম। এর জবাব হচ্ছে, আমাদের পক্ষে ঐ কারণগুলো অনুধাবন করা সম্ভব নয়। যেমন রক্ত, শূকরের গোশ্ত বা মৃত জীব খেলে আমাদের নৈতিক বৃত্তিতে কোন্ ধরনের দোষ, কতটুকু এবং কি পরিমাণে দেখা দেয়, সে সম্পর্কে কোন প্রকার অনুসন্ধান চালাবার কোন ক্ষমতাই আমাদের নেই। কারণ নৈতিকতা পরিমাপ করার কোন উপকরণই আমাদের আয়ত্বাধীন নয়। ধরুন যদি এদের খারাপ প্রভাব বর্ণনা করে দেয়াও হতো, তাহলেও সংশয় পোষণকারীরা প্রায় সে একই জায়গায় থাকতেন যেখানে বর্তমানে অবস্থান করছেন। কারণ এ বর্ণনা ভুল না নির্ভুল, তা সে পরিমাপ করবে কিসের সাহায্যে? তাই মহান আল্লাহ হালাল ও হারামের সীমানা মেনে চলাকে ঈমানের ওপর নির্ভরশীল করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি মেনে নেবে যে, কুরআন আল্লাহরই কিতাব, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহরই রসূল এবং আল্লাহকে সর্বজ্ঞ ও সবচেয়ে জ্ঞানী ও কুশলী বলে স্বীকার করবে সে তাঁর নির্ধারিত সীমানা অবশ্যই মেনে চলবে। এর কারণ বোধগম্য হোক বা না হোক তার পরোয়া সে করবে না। আর যে ব্যক্তি এ মৌলিক আকীদাটির ব্যাপারেই নিসংশয় নয় তার জন্য যেসব জিনিসের ক্ষতিকর বিষয় মানুষের জ্ঞানে ধরা পড়েছে কেবল মাত্র সেগুলো থেকে দূরে থাকা এবং যেগুলোর ক্ষতিকর বিষয় মানুষের জ্ঞানে ধরা পড়তে পারেনি সেগুলোর ক্ষতির দুর্ভোগ পোহাতে থাকা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

১৪. এ আয়াতে যে জিনিসটি হারাম করা হয়েছে দুনিয়ায় তার তিনটি সংস্করণ প্রচলিত আছে। আয়াতে ঐ তিনটিকেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

এক ঃ মুশরিকদের মতো করে 'ফাল' গ্রহণ করা। এতে কোন বিষয়ে দেব-দেবীর কাছে ভাগ্যের ফায়সালা জানার জন্য জিজ্ঞেস করা হয় অথবা গায়েবের—অজানার ও

অদৃশ্যের খবর জিজ্ঞেস করা হয় বা পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসা করে নেয়া হয়। মক্কার মুশরিকরা কাবা ঘরে রক্ষিত 'হুবল' দেবতার মূর্তিকে এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। তার বেদীমূলে সাতটি তীর রাখা হয়েছিল। সেগুলোর গায়ে বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য খোদাই করা ছিল। কোন কাজ করার বা না করার প্রশ্নে দোদুল্যমানতা দেখা দিলে, হারানো জিনিসের সন্ধান লাভ করতে চাইলে বা হত্যা মামলার ফায়সালা জানতে চাইলে, মোট কথা যেকোন কাজের জন্যই হুবল–এর তীর রক্ষকের কাছে যেতে হতো, সেখানে নজরানা পেশ করতে হতো এবং হুবল–এর কাছে এ মর্মে প্রার্থনা করা হতো, "আমাদের এ ব্যাপারটির ফায়সালা করে দিন।" এরপর তীর রক্ষক তার কাছে রক্ষিত তীরগুলোর সাহায্যে 'ফাল' বের করতো। এতে যে তীরটিই বের হয়ে আসতো, তার গায়ে লিখিত শব্দকেই হুবল–এর ফায়সালা মনে করা হতো।

দুই ঃ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ফাল গ্রহণ। এ ক্ষেত্রে চিন্তা–ভাবনা ও জ্ঞান–বুদ্ধির সাহায্যে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের মীমাংসার পরিবর্তে কোন প্রকার কুসংস্কার ও অমূলক ধারণা–কল্পনা বা কোন আকস্মিক ঘটনার মাধ্যমে কোন বিষয়ের মীমাংসা করা হয়। অথবা এমন সব উপায়ে ভাগ্যের অবস্থা জানবার চেষ্টা করা হয়, যেগুলো গায়েব জানার উপায় হিসেবে কোন তাত্বিক পদ্ধতিতে প্রমাণিত নয়। হস্তরেখা গণনা, নক্ষত্র গণনা, রমল করা, বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার এবং নানা ধরনের ফাল বের করা এর অন্তরভুক্ত।

তিন ঃ জুয়া ধরনের যাবতীয় খেলা ও কাজ। যেখানে অধিকার, কর্মমূলক অবদান ও বুদ্ধিবৃত্তিক ফায়সালার মাধ্যমে বস্তু বন্টনের পদ্ধতি গ্রহণ না করে নিছক কোন ঘটনা–ক্রমিক কার্যক্রমের ভিত্তিতে বস্তু বন্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যেমন, লটারীতে ঘটনাক্রমে অমুক ব্যক্তির নাম উঠেছে, কাজেই হাজার হাজার ব্যক্তির পকেট থেকে বের হয়ে আসা টাকা তার একার পকেটে চলে যাবে। অথবা তাত্বিক দিক দিয়ে কোন একটি ধাঁধার একাধিক উত্তর হতে পারে কিন্তু পুরস্কারটি পাবে একমাত্র সেই ব্যক্তি যার উত্তর কোন যুক্তিসংগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নয় বরং নিছক ঘটনাক্রমে ধাঁধাঁ প্রতিযোগিতা পরিচালকের সিন্ধুকে রক্ষিত উত্তরটির সাথে মিলে যাবে।

এ তিন ধরনের ফাল গ্রহণ ও অনুমানভিত্তিক লটারী করাকে হারাম ঘোষণা করার পর ইসলাম 'কুরআ' নিক্ষেপ বা লটারী করার একমাত্র সহজ সরল পদ্ধতিটিকেই বৈধ গণ্য করেছে। এ পদ্ধিতিতে দু'টি সমান বৈধ কাজের বা দু'টি সমপর্যায়ের অধিকারের মধ্যে ফায়সালা করার প্রশ্ন দেখা দেয়। যেমন, একটি জিনিসের ওপর দু' ব্যক্তির অধিকার সবদিক দিয়ে একদম সমান এবং ফায়সালাকারীর জন্য দু'জনের কাউকে অগ্রাধিকার দেবার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই আর তাদের দু'জনের মধ্য থেকে কোন একজন নিজের অধিকার প্রত্যাহার করতেও প্রস্তুত নয়। এ অবস্থায় তাদের সম্মতিক্রমে লটারীর মাধ্যমে ফায়সালা করা যেতে পারে অথবা দু'টি একই ধরনের সঠিক ও জায়েয কাজ। যুক্তির মাধ্যমে তাদের কোন একটিকে অগ্রাধিকার দেবার ব্যাপারে এক ব্যক্তি দোটানায় পড়ে গেছে। এ অবস্থায় প্রয়োজন হলে লটারী করা যেতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে যখন দু'জন সমান হকদারের মধ্যে একজনকে প্রাধান্য দেবার প্রশ্ন দেখা দিতো এবং তাঁর আশংকা হতো যে, তিনি একজনকে প্রাধান্য দিলে তা অন্যজনের মনোকষ্টের কারণ হবে তখন তিনি সাধারণত এ পদ্ধতিটি অবলম্বন করতেন।

১৫. 'আজ' বলতে কোন বিশেষ দিন, ক্ষণ বা তারিখ বুঝানো হয়নি বরং যে যুগে ও যে সময়ে এ আয়াত নাযিল হয় সেই সময়কালকে বুঝানো হয়েছে। আমাদের ভাষায়ও 'আজ' শব্দটি একইভাবে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

"তোমাদের দীনের ব্যাপারে কাফেররা পুরোপুরি নিরাশ হয়ে পড়েছে।"—অর্থাৎ তোমাদের দীন এখন একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে এবং সে তার নিজস্ব শাসন ও কর্তৃত্ব ক্ষমতার জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কাফেররা এতদিন তার পথে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আসছিল। কিন্তু এখন তারা এ দীনকে ধ্বংস করার এবং তোমাদেরকে আবার জাহেলিয়াতের অন্ধকার গর্ভে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে। "কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো।" অর্থাৎ এ দীনের বিধান এবং এর হেদায়াত কার্যকর করার ব্যাপারে এখন তোমাদের আর কোন কাফের শক্তির প্রভাব, পরাক্রম, প্রতিবন্ধকতা, প্রাধান্য ও হস্তক্ষেপের সম্মুখীন হতে হবে না। এখন আর মানুষকে ভয় করার কেন কারণ নেই। তোমাদের এখন আল্লাহকে ভয় করা উচিত। আল্লাহর বিধান কার্যকর করার ব্যাপারে এখন যদি তোমরা কোন ত্রুটি করো তাহলে এ জন্য তোমাদের কাছে এমন কোন ওজর থাকবে না যার ভিত্তিতে তোমাদের সাথে কোমল ব্যবহার করা যেতে পারে। এখন আর শরীয়াতের বিরুদ্ধাচরণের অর্থ এ হবে না যে, এ ব্যাপারে তোমরা অন্যদের প্রভাবে বাধ্য হয়ে এমনটি করেছো। বরং এর পরিষ্কার অর্থ হবে, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করতে চাও না।

১৬. দীনকে পরিপূর্ণ করে দেবার অর্থই হচ্ছে তাকে একটি স্বতন্ত্র চিন্তা ও কর্ম ব্যবস্থা এবং একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় পরিণত করা হয়েছে। তার মধ্যে জীবনের সমস্ত প্রশ্নের নীতিগত বা বিস্তারিত জবাব পাওয়া যায়। হেদায়াত ও পথনির্দেশ লাভ করার জন্য এখন আর কোন অবস্থায়ই তার বাইরে যাবার প্রয়োজন নেই। নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দেবার অর্থ হচ্ছে, হেদায়াতের নিয়ামত পূর্ণ করা। আর ইসলামকে দীন হিসেবে গ্রহণ করে নেবার অর্থ হচ্ছে এই যে, তোমরা আমার আনুগত্য ও বন্দেগী করার যে অংগীকার করেছিলে তাকে যেহেতু তোমরা নিজেদের প্রচেষ্টা ও কর্মের মাধ্যমে সত্য ও আন্তরিক অংগীকার হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছো, তাই আমি তাকে গ্রহণ করে নিয়েছি এবং তোমাদেরকে কার্যত এমন অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছি যে, এখন তোমাদের গলায় প্রকৃতপক্ষে আমার ছাড়া আর কারোর আনুগত্য ও বন্দেগীর শৃংখল নেই। এখন আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যেমন তোমরা আমার মুসলিম (আনুগত্যকারী) ঠিক তেমনি কর্মজীবনেও আমার ছাড়া আর কারোর মুসলিম (আনুগত্যকারী) হয়ে থাকতে তোমরা কোনক্রমেই বাধ্য নও। এ অনুগ্রহগুলোর কথা উচ্চারণ করার পর মহান আল্লাহ নীরবতা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু এ বাক পদ্ধতি থেকে একথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটে ওঠে, যেন এখানে আল্লাহ বলতে চাচ্ছেন, আমি যখন তোমাদের ওপর এ অনুগ্রহগুলো করেছি তখন এর দাবী হচ্ছে, এখন আমার আইনের সীমার মধ্যে অবস্থান করার ব্যাপারে তোমাদের পক্ষ থেকে যেন আর কোন ত্রুটি দেখা না দেয়।

বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, এ আয়াতটি বিদায় হজ্জের সময় ১০ হিজরীতে নাযিল হয়েছিল। কিন্তু যে বক্তব্যের ধারাবাহিকতার সাথে এর সম্পর্ক তা ৬ হিজরীতে হোদাইবিয়া চুক্তির সমসাময়িক কালের। বর্ণনা রীতির কারণে বাক্য দু'টি পরস্পর

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۫ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ④

লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, তাদের জন্য কি হালাল করা হয়েছে? বলে দাও, তোমাদের জন্য সমস্ত পাক–পবিত্র জিনিস হালাল করা হয়েছে।[১৮] *আর যেসব শিকারী প্রাণীকে তোমরা শিক্ষিত করে তুলেছো, যাদেরকে আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে তোমরা শিকার করা শিখিয়েছো, তারা তোমাদের জন্য যেসব প্রাণী ধরে রাখে, তাও তোমরা খেতে পারো।*[১৯] *তবে তার ওপর আল্লাহর নাম নিতে হবে।*[২০] *আর আল্লাহর আইন ভাঙ্গার ব্যাপারে সাবধান। অবশ্যি হিসেব নিতে আল্লাহর মোটেই দেরী হয় না।*

এমনভাবে মিশে গেছে যার ফলে কোন ক্রমেই ধারণা করা যাবে না যে, শুরুতে এ বাক্যগুলো ছাড়াই এ ধরাবাহিক বক্তব্যটি নাযিল হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে এ বাক্যগুলো নাযিল হবার পর তা এখানে এনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। অবশ্য প্রকৃত ব্যাপার একমাত্র আল্লাহই জানেন, তবে আমার অনুমান, প্রথমে এ আয়াতটি এ একই প্রসংগে নাযিল হয়েছিল। তাই লোকেরা তখন এর আসল গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেনি। পরে যখন সমগ্র আরব ভূখণ্ড বিজিত হলো এবং ইসলাম শক্তি অর্জন করে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গেলো তখন মহান আল্লাহ পুনর্বার এ বাক্য তাঁর নবীর প্রতি নাযিল করেন এবং এটি ঘোষণা করে দেবার নির্দেশ জারি করেন।

১৭. সূরা বাকারার ১৭২ টীকা দেখুন।

১৮. এ জবাবের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। ধর্মীয় ভাবাপন্ন লোকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন এক মানসিকতার শিকার হন যার ফলে তারা কোন জিনিসকে সুস্পষ্টভাবে হালাল গণ্য না করা পর্যন্ত দুনিয়ার সব জিনিসকেই হারাম গণ্য করে থাকেন। এ মানসিকতার ফলে মানুষের ওপর সন্দেহ প্রবণতা ও আইনের গৎবাঁধা রীতি চেপে বসে। জীবনের প্রত্যেকটি কাজে সে হালাল বস্তু ও জায়েয কাজের তালিকা চেয়ে বেড়ায় এবং প্রত্যেকটি কাজ ও প্রত্যেকটি জিনিসকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে, যেন সব কিছুই নিষিদ্ধ। এখানে কুরআন এ মানসিকতার সংশোধন করছে। প্রশ্নকারীদের উদ্দেশ্য ছিল, সমস্ত হালাল জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ তাদের জানিয়ে দিতে হবে, যাতে তারা সেগুলো ছাড়া অন্য সব জিনিসকে হারাম মনে করতে পারে। জবাবে কুরআন হারাম জিনিসগুলো বিস্তারিতভাবে বলে দিয়েছে এবং এরপর সমস্ত পাক পবিত্র জিনিস হালাল, এ সাধারণ নির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। এভাবে পুরাতন ধর্মীয় মতাদর্শ সম্পূর্ণ রূপে উল্টে গেছে। পুরাতন মতাদর্শ অনুযায়ী সবকিছুই ছিল হারাম কেবলমাত্র যেগুলোকে হালাল গণ্য

করা হয়েছে সেগুলো ছাড়া। কুরআন এর বিপরীত পক্ষে এ নীতি নির্ধারণ করেছে যে, সবকিছুই হালাল কেবল মাত্র সেগুলো ছাড়া যেগুলোর হারাম হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। এটি ছিল একটি অনেক বড় সংশোধন। মানুষের জীবনকে বাঁধন মুক্ত করে এ সংশোধন প্রশস্ত দুনিয়ার দুয়ার তার জন্য খুলে দিয়েছে। প্রথমে একটি গণ্ডীবদ্ধ ক্ষুদ্র পরিসরের কিছু জিনিস ছিল তার জন্য হালাল, বাকি সমস্ত দুনিয়া ছিল তার জন্য হারাম। আর এখন একটি গণ্ডিবদ্ধ পরিসরের কিছু জিনিস তার জন্য হারাম বাদবাকি সমস্ত দুনিয়াটাই তার জন্য হালাল হয়ে গেছে।

হালালের জন্য "পাক-পবিত্রতার" শর্ত আরোপ করা হয়েছে, যাতে এ সাধারণ বৈধতার দলীলের মাধ্যমে নাপাক জিনিসগুলোকে হালাল গণ্য করার চেষ্টা না করা হয়। এখন কোন জিনিসের "পাক-পবিত্র" হবার বিষয়টি কিভাবে নির্ধারিত হবে, এ প্রশ্নটি থেকে যায়। এর জবাব হচ্ছে, যেসব জিনিস শরীয়াতের মূলনীতিগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি মূলনীতির আওতায় নাপাক গণ্য হয় অথবা ভারসাম্যপূর্ণ রুচিশীলতা যেসব জিনিস অপছন্দ করে বা ভদ্র ও সংস্কৃতিবান মানুষ সাধারণত যেসব জিনিসকে নিজের পরিচ্ছন্নতার অনুভূতির বিরোধী মনে করে থাকে সেগুলো ছাড়া বাকি সবকিছুই পাক।

১৯. শিকারী প্রাণী বলতে বাঘ, সিংহ, বাজ পাখি, শিকরা ইত্যাদি এমনসব পশু-পাখি বুঝায় যাদেরকে মানুষ শিকার করার কাজে নিযুক্ত করে। শিক্ষিত পশু-পাখির বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, তারা যা কিছু শিকার করে সাধারণ পশু-পাখির মতো তাদেরকে ছিঁড়ে ফেড়ে খেয়ে ফেলে না বরং নিজের মালিকের জন্য রেখে দেয়। তাই সাধারণ পশু-পাখির শিকার করা প্রাণী হারাম কিন্তু শিক্ষিত পশু-পাখির শিকার করা প্রাণী হালাল।

এ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে কিছুটা মতবিরোধ আছে। এক দলের মতে, শিকারী পশু-পাখি তার শিকার করা প্রাণী থেকে যদি কিছুটা খেয়ে নেয় তাহলে তা হারাম হয়ে যাবে। কারণ তার খাওয়া প্রমাণ করে যে, শিকারটিকে সে মালিকের জন্য নয়, নিজের জন্য ধরেছে। ইমাম শাফেঈ এ মত অবলম্বন করেছেন। দ্বিতীয় দলের মতে, সে যদি তার শিকার করা প্রাণীর কিছুটা খেয়ে নেয় তাহলেও তা হারাম হয়ে যায় না। এমনকি এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত খেয়ে নিলেও বাকি দু'-তৃতীয়াংশ হালালই থেকে যাবে। আর এ ব্যাপারে পশু ও পাখির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইমাম মালেক এ মত অবলম্বন করেছেন। তৃতীয় দলের মতে, শিকারী পশু যদি তার শিকার থেকে কিছু খেয়ে নেয় তাহলে তা হারাম হয়ে যাবে কিন্তু যদি শিকারী পাখি তার শিকার থেকে কিছু খেয়ে নেয় তাহলে তা হারাম হয়ে যাবে না। কারণ শিকারী পশুকে এমন শিক্ষা দেয়া যেতে পারে যার ফলে সে শিকার থেকে কিছুই না খেয়ে তাকে মালিকের জন্য সংরক্ষণ করে রাখতে পারে কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, শিকারী পাখিকে এ ধরনের শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর শাগরিদবৃন্দ এমত অবলম্বন করেছেন। এর বিপরীত পক্ষে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন, শিকারী পাখির শিকার আদৌ জায়েয নয়। কারণ শিকারকে নিজে না খেয়ে মালিকের জন্য রেখে দেবার ব্যাপারটি তাকে কোনক্রমেই শেখানো সম্ভব নয়।

২০. অর্থাৎ শিকারী পশুকে শিকারের পেছনে লেলিয়ে দেবার সময় "বিসমিল্লাহ" বলো। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আদী ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۪ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ؗ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْۤ اَخْدَانٍ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ؗ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

আজ তোমাদের জন্য সমস্ত পাক–পবিত্র বস্তু হালাল করে দেয়া হয়েছে। আহ্‌লি কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল।[২১] আর সংরক্ষিত মেয়েরা তোমাদের জন্য হালাল, তারা ঈমানদারদের দল থেকে হোক বা এমন জাতিদের মধ্য থেকে হোক, যাদেরকে তোমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছিল।[২২] তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, তোমরা তাদের মোহরানা আদায় করে দিয়ে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে তাদের রক্ষক হবে। তোমরা অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত হতে পারবে না অথবা লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করতেও পারবে না। আর যে ব্যক্তি ঈমানের পথে চলতে অস্বীকার করবে, তার জীবনের সকল সৎকার্যক্রম নষ্ট হয়ে যাবে এবং আখেরাতে সে হবে নিঃস্ব ও দেউলিয়া।[২৩]

ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আমি কি কুকুরের সাহায্যে শিকার করতে পারি?' জবাবে তিনি বলেন ঃ "যদি তাকে ছাড়ার সময় তুমি "বিসমিল্লাহ" বলে থাকো, তাহলে তা খেয়ে নাও অন্যথায় খেয়ো না। আর যদি সে শিকার থেকে কিছু খেয়ে নিয়ে থাকে, তাহলে তা খেয়ো না। কারণ সে শিকারকে আসলে তার নিজের জন্য ধরেছে," তারপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আমি যদি শিকারের ওপর নিজের কুকুর ছেড়ে দেবার পর দেখি সেখানে আর একটি কুকুর আছে তাহলে?' তিনি জবাব দিলেন ঃ "এ অবস্থায় ঐ শিকারটি খেয়ো না। কারণ আল্লাহর নাম তুমি নিজের কুকুরের ওপর নিয়েছিলে, অন্য কুকুরটির ওপর নয়?"

এ আয়াত থেকে জানা যায়, শিকারের ওপর শিকারী পশুকে ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম নেয়া জরুরী। এরপর যদি শিকারকে জীবিত পাওয়া যায় তাহলে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তাকে যবেহ করতে হবে। আর যদি জীবিত না পাওয়া যায় তাহলে যবেহ

করা ছাড়াই তা হালাল। কারণ শুরুতে শিকারী পশুকে তার ওপর ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছিল। তীর দিয়ে শিকার করার ব্যাপারেও এ একই কথা।

২১. আহ্‌লি কিতাবদের খাদ্যের মধ্যে তাদের যবেহকৃত প্রাণীও অন্তরভুক্ত। আমাদের জন্য তাদের এবং তাদের জন্য আমাদের খাদ্য হালাল হবার মানে হচ্ছে এই যে, আমাদের ও তাদের মধ্যে পানাহারের ব্যাপারে কোন বাধ্য বা শুচি–অশুচির ব্যাপার নেই। আমরা তাদের সাথে খেতে পারি এবং তারা আমাদের সাথে খেতে পারে। কিন্তু এভাবে সাধারণ অনুমতি দেবার আগে এ বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যে, "তোমাদের জন্য সমস্ত পাক–পবিত্র জিনিস হালাল করে দেয়া হয়েছে।" এ থেকে জানা গেলো, আহলি কিতাব যদি পাক–পবিত্রতা ও তাহারাতের ব্যাপারে শরীয়াতের দৃষ্টিতে অপরিহার্য বিধানগুলো মেনে না চলে অথবা যদি তাদের খাদ্যের মধ্যে হারাম বস্তু অন্তরভুক্ত থাকে তাহলে তা থেকে দূরে থাকতে হবে। যেমন, যদি তারা আল্লাহর নাম না নিয়েই কোন প্রাণী যবেহ করে অথবা তার ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নাম নেয়, তাহলে তা খাওয়া আমাদের জন্য জায়েয নয়। অনুরূপভাবে যদি তাদের দস্তরখানে মদ, শূকরের গোশ্‌ত বা অন্য কিছু হারাম খাদ্য পরিবেশিত হয়, তাহলে আমরা তাদের সাথে আহারে শরীক হতে পারি না।

আহ্‌লি কিতাবদের ছাড়া অন্যান্য অমুসলিমদের ব্যাপারেও এ একই কথা। তবে সেখানে পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, আহলি কিতাবদের যবেহ করা প্রাণী জায়েয, যদি তারা যবেহ করার সময় তার ওপর আল্লাহর নাম নিয়ে থাকে কিন্তু আহলি কিতাব ছাড়া অন্যান্য অমুসলিমদের হত্যা করা প্রাণী আমরা খেতে পারি না।

২২. এখানে ইহুদী ও খৃষ্টানদের কথা বলা হয়েছে। কেবলমাত্র তাদের মেয়েদেরকেই বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে আর এ সংগে শর্তও আরোপিত হয়েছে যে, তাদের 'মুহসানাত' (সংরক্ষিত মহিলা) হতে হবে। এ নির্দেশটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিরূপণের ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে আব্বাসের (রা) মতে এখানে আহ্‌লি কিতাব বলতে সে সব আহ্‌লি কিতাবকে বুঝানো হয়েছে যারা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা। অন্যদিকে দারুল হারব ও দারুল কুফ্‌রের ইহুদী ও খৃষ্টানদের মেয়েদের বিয়ে করা জায়েয নয়। হানাফী ফকীহগণ এর থেকে সামান্য একটু ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের মতে বহির্দেশের আহ্‌লি কিতাবদের মেয়েদেরকে বিয়ে করা হারাম না হলেও মকরূহ, এতে কোন সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব ও হাসান বসরীর মতে, আয়াতটির হুকুম সাধারণভাবে প্রযোজ্য। কাজেই এখানে যিম্মী ও অযিম্মীর মধ্যে পার্থক্য করার কোন প্রয়োজন নেই। তারপর 'মুহসানাত' শব্দের অর্থের ব্যাপারেও ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হযরত উমরের (রা) মতে, এর অর্থ পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী মেয়েরা। মুহসানাত শব্দের এ অর্থ গ্রহণ করার কারণে তিনি আহ্‌লি কিতাবদের স্বেচ্ছাচারী মেয়েদের বিয়ে করাকে এ অনুমতির আওতার বাইরে রেখেছেন। হাসান, শা'বী ও ইব্রাহীম নাখ্‌ঈ (র) এ একই মত পোষণ করেন। হানাফী ফকীহগণও এ মত অবলম্বন করেছেন। অন্যদিকে ইমাম শাফেঈর মতে, এখানে এ শব্দটি ক্রীতদাসীদের মোকাবিলায় ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এখানে এ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, আহলি কিতাবদের এমন সব মেয়ে যারা ক্রীতদাসী নয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ
وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى
الْكَعْبَيْنِ ۭ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۭ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰي
سَفَرٍ اَوْ جَاۗءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۗىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۗءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۗءً
فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ۭ
مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

২ রুকূ’

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য তৈরী হও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত দু’টি কনুই পর্যন্ত ধুয়ে ফেলো, মাথার ওপর হাত বুলাও এবং পা দু’টি গেরো পর্যন্ত ধুয়ে ফেলো।[২৪] যদি তোমরা ‘জানাবাত’ অবস্থায় থাকো, তাহলে গোসল করে পাক সাফ হয়ে যাও।[২৫] যদি তোমরা রোগগ্রস্ত হও বা সফরে থাকো অথবা তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করে আসে বা তোমরা নারীদেরকে স্পর্শ করে থাকো এবং পানি না পাও, তাহলে পাক–পবিত্র মাটি দিয়ে কাজ সেরে নাও। তার ওপর হাত রেখে নিজের চেহারা ও হাতের ওপর মসেহ করে নাও।[২৬] আল্লাহ তোমাদের জন্য জীবনকে সংকীর্ণ করে দিতে চান না কিন্তু তিনি চান তোমাদেরকে পাক–পবিত্র করতে এবং তাঁর নিয়ামত তোমাদের ওপর সম্পূর্ণ করে দিতে,[২৭] হয়তো তোমরা শোকর গুজার হবে।

২৩. আহলি কিতাবদের মেয়েদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেবার পর এখানে সতর্কবাণী হিসেবে এ বাক্যটি সন্নিবেশিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি এ অনুমতি থেকে লাভবান হতে চাইবে সে যেন নিজের ঈমান ও চরিত্রের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে। এমন যেন না হয়, কাফের স্ত্রীর প্রেমে আত্মহারা হয়ে অথবা তার আকীদা ও কর্মকাণ্ডে প্রভাবিত হয়ে তিনি নিজের ঈমানের মূল্যবান সম্পদ হারিয়ে বসেন বা সামাজিক জীবন যাপন ও আচরণের ক্ষেত্রে ঈমান বিরোধী পথে এগিয়ে চলেন।

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٧ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۫ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝٨ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝٩ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝١٠

আল্লাহ তোমাদের যে নিয়ামত দান করেছেন[২৮] *তার কথা মনে রাখো এবং তিনি তোমাদের কাছ থেকে যে পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছেন তা ভুলে যেয়ো না। অর্থাৎ তোমাদের একথা—"আমরা শুনেছি ও আনুগত্য করেছি।" আর আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ মনের কথা জানেন। হে ঈমানদারগণ! সত্যের ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত ও ইনসাফের সাক্ষদাতা হয়ে যাও।*[২৯] *কোন দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এমন উত্তেজিত না করে দেয় যার ফলে তোমরা ইনসাফ থেকে সরে যাও। ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত করো। এটি আল্লাহভীতির সাথে বেশী সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত আছেন। যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দেয়া হবে এবং তারা বিরাট প্রতিদান লাভ করবে আর যারা কুফরী করবে এবং আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী।*

২৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হুকুমটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা থেকে জানা যায়, কুল্লি করা ও নাক সাফ করাও মুখ ধোয়ার অন্তরভুক্ত। এ ছাড়া মুখমণ্ডল ধোয়ার কাজটি কখনই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। আর কান যেহেতু মাথার একটি অংশ তাই মাথা মসেহ করার মধ্যে কানের ভেতরের ও বাইরের উভয় অংশও শামিল হয়ে যায়। তাছাড়া অযূ শুরু করার আগে দু' হাত ধুয়ে নেয়া উচিত। কারণ যে হাত দিয়ে অযূ করা হচ্ছে সে হাতেরই তো আগে পাক-পবিত্র হবার প্রয়োজন রয়েছে।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যা তিনি (এ সাম্প্রতিককালে) তোমাদের প্রতি করেছেন, যখন একটি দল তোমাদের ক্ষতি করার চক্রান্ত করেছিল কিন্তু আল্লাহ তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন।[৩০] *আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো। ঈমানদারদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।*

২৫. স্ত্রী সহবাসের কারণে 'জানাবাত' হোক বা স্বপ্নে বীর্য স্খলনের কারণে হোক উভয় অবস্থায়ই গোসল ওয়াজিব। এ অবস্থায় গোসল ছাড়া নামায পড়া বা কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নয়। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য সূরা আন্ নিসার ৬৭, ৬৮ ও ৬৯ টীকা দেখুন)।

২৬. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আন নিসার ৬৯ ও ৭০ টীকা।

২৭. আত্মার পবিত্রতা যেমন একটি নিয়ামত ঠিক তেমনি শরীরের পবিত্রতাও একটি নিয়ামত। আর মানুষের ওপর আল্লাহর নিয়ামত তখনই সম্পূর্ণ হতে বা পূর্ণতা লাভ করতে পারবে যখন সে আত্মা ও শরীর উভয়ের তাহারাত ও পাক-পবিত্রতা অর্জনের জন্য পূর্ণ হেদায়াত লাভ করতে সক্ষম হবে।

২৮. অর্থাৎ আল্লাহর এ নিয়ামত যে, জীবনের সরল সঠিক রাজপথ তিনি তোমাদের জন্য আলোকোজ্জ্বল করে দিয়েছেন এবং সারা দুনিয়ার মানুষের হেদায়াত ও নেতৃত্ব দানের আসনে তোমাদের সমাসীন করেছেন।

২৯. সূরা আন নিসার ১৬৪ ও ১৬৫ টীকা দেখুন।

৩০. এখানে একটি বিশেষ ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এ সম্পর্কে রেওয়ায়াত করেছেন ঃ ইহুদীদের একটি দল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বিশেষ বিশেষ সাহাবীদেরকে একটি ভোজে আমন্ত্রণ করেছিল। এই সংগে তারা গোপনে চক্রান্ত করেছিল যে, নবী করীম (সা) ও সাহাবীগণ এসে গেলে একযোগে তাদের ওপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে শেষ করে দেবে এবং এভাবে তারা ইসলামের মূলোৎপাটনে সক্ষম হবে। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে ঠিক সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলেন। তিনি দাওয়াতে অংশ গ্রহণ করলেন না। যেহেতু এখান থেকে বনী ইসরাঈলদেরকে

وَلَقَدْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ
وَقَالَ اللّٰهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ
بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ
سَيِّاٰتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ
كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ ⑪

৩ রুকূ'

আল্লাহ বনী ইসরাঈলদের থেকে পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে বারোজন 'নকীব'[৩১] নিযুক্ত করেছিলেন। আর তিনি তাদেরকে বলেছিলেন ঃ "আমি তোমাদের সাথে আছি। যদি তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও, আমার রসূলদেরকে মানো ও তাদেরকে সাহায্য করো[৩২] এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে থাকো,[৩৩] তাহলে নিশ্চিত বিশ্বাস করো আমি তোমাদের থেকে তোমাদের পাপগুলো মোচন করে দেবো[৩৪] এবং তোমাদের এমন সব বাগানের মধ্যে প্রবেশ করাবো যার তলদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে। কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কুফরী নীতি অবলম্বন করবে, সে আসলে 'সাওয়া-উস-সাবীল[৩৫] তথা সরল সঠিক পথ হারিয়ে ফেলেছে।

সম্বোধন করে বক্তব্য পেশ করা শুরু হয়েছে, তাই ভূমিকা হিসেবে এ ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

এখান থেকে যে ভাষণ শুরু হচ্ছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে দু'টো। প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলমানদের পূর্বসূরী আহলি কিতাবরা যে পথে চলছিল সে পথে চলা থেকে তাদেরকে বিরত রাখা। কাজেই তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, যেভাবে আজ তোমাদের থেকে অংগীকার নেয়া হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে ইতিপূর্বে বনী ইসরাঈল ও ঈসা আলাইহিস সালামের উম্মতদের থেকেও এ একই অংগীকার নেয়া হয়েছিল। তারা যেভাবে নিজেদের অংগীকার ভংগ করে পথভ্রষ্ট হয়েছে তোমরাও যেন তেমনি অংগীকার ভংগ করে পথভ্রষ্ট হয়ে না যাও। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইহুদী ও খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায়কে তাদের ভুলের জন্য সতর্ক করে দেয়া এবং তাদেরকে সত্য দীন তথা ইসলামের দওয়াত দেয়া।

৩১. 'নকীব' অর্থ পর্যবেক্ষক, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও তদন্তকারী। বনী ইসরাঈল ছিল বারোটি গোত্রে বিভক্ত। আল্লাহ প্রত্যেক গোত্র থেকে একজনকে নিয়ে সে গোত্রের ওপরই তাকে নকীব নিযুক্ত করার হুকুম দিয়েছিলেন। নকীবের কাজ ছিল তার গোত্রের লোকদের চালচলন ও অবস্থার প্রতি নজর রাখা এবং তাদেরকে বেদীনী ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা। বাইবেলের গণনা পুস্তকে বারো জন 'সরদার'–এর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআনে এ 'নকীব' শব্দের মাধ্যমে তাদের যে পদমর্যাদা ও দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে বাইবেলের বর্ণনা থেকে তা প্রকাশ হয় না। বাইবেল তাদেরকে নিছক সরদার ও প্রধান হিসেবে পেশ করেছে। অন্যদিকে কুরআন তাদেরকে নৈতিক ও ধর্মীয় পর্যবেক্ষক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী বলে গণ্য করেছে।

৩২. অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে যে রসূলই আসবে যদি তোমরা তাঁর দাওয়াত কবুল করতে থাকো এবং তাকে সাহায্য করতে থাকো।

৩৩. অর্থাৎ আল্লাহর পথে নিজের ধন সম্পদ ব্যয় করতে থাকো। যেহেতু মানুষ আল্লাহর পথে যা ব্যয় করে আল্লাহ তার এক একটি পাইকেও কয়েকগুণ বাড়িয়ে ফেরত দেবার ওয়াদা করেন, তাই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর পথে অর্থ সম্পদ ব্যয় করাকে "ঋণ" হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। তবে এখানে শর্ত হচ্ছে, তা অবশ্যি "উত্তম ঋণ" হতে হবে। অর্থাৎ বৈধ উপায়ে সংগৃহীত অর্থ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে এবং আন্তরিকতা, সদিচ্ছা ও সৎ সংকল্প সহকারে ব্যয় করতে হবে।

৩৪. কারোর পাপ মোচন করার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, সত্য ও সঠিক পথ অবলম্বন করার এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী চিন্তা ও কর্মের সঠিক পথে চলার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ মানুষের আত্মা বিভিন্ন প্রকার পাপের মলিনতা থেকে এবং তার জীবনধারা বহু প্রকার দোষ ও ত্রুটি থেকে মুক্ত হয়ে যেতে থাকবে।

দুই, এ পরিশুদ্ধি সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি সামগ্রিকভাবে পূর্ণতার পর্যায়ে না পৌঁছুতে পারে এবং তার মধ্যে কিছু ত্রুটি ও গুনাহ থেকে যায় তাহলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাকে জবাবদিহির সম্মুখীন করবেন না এবং সে গুনাহগুলো তার হিসেব থেকে বিলুপ্ত করে দেবেন। কারণ যে ব্যক্তি মৌলিক হেদায়াত ও সংশোধন গ্রহণ করে নিয়েছে আল্লাহ তার ছোটখাট ও পরোক্ষ ত্রুটিগুলো পাকড়াও করার মতো কঠোর নীতি অবলম্বন করবেন না।

৩৫. অর্থাৎ সে 'সাওয়া–উস–সাবীল' পেয়ে আবার তা হারিয়ে ফেলেছে এবং ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়েছে। 'সাওয়া–উস–সাবীলের' অনুবাদ করা যেতে পারে 'সরল–সঠিক ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যম পথ।' কিন্তু এরপরও তার পুরোপুরি অর্থ প্রকাশিত হয় না। তাই আয়াতের অনুবাদের সময় হুবহু মূল শব্দটিই রাখা হয়েছে।

এ শব্দটির গভীর অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য প্রথমেই একথাটি হৃদয়ংগম করে নিতে হবে যে, মানুষের অস্তিত্বের মধ্যেই নিহিত রয়েছে একটি ছোটখাটো জগত। এ খুদে জগতটি অসংখ্য শক্তি ও যোগ্যতায় পরিপূর্ণ। ইচ্ছা, আকাংখা, আবেগ, অনুভূতি ও বিভিন্ন ধরনের প্রবণতা এখানে বাসা বেঁধে আছে। দেহ ও প্রবৃত্তির বিভিন্ন দাবী এবং আত্মা ও মানবিক প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকার চাহিদার ভীড় এখানে সর্বক্ষণ। তারপর ব্যক্তি মানুষেরা একত্র হয়ে যে সমাজ কাঠামো নির্মাণ করে সেখানেও ঘটে অসংখ্য জটিল সম্পর্কের সমন্বয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশের সাথে সাথে এ জটিলতাও বেড়ে যেতে থাকে। এরপর সারা দুনিয়ায় মানুষের চারদিকে জীবন ধারণের যেসব উপকরণ ছড়িয়ে আছে সেগুলো কাজে লাগাবার এবং মানবিক প্রয়োজনে ও মানব সভ্যতার বিনির্মাণে সেগুলো ব্যবহার করার প্রশ্নও ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ে অসংখ্য ছোট বড় সমস্যার জন্ম দেয়।

মানুষ তার সহজাত দুর্বলতার কারণে জীবনের এ সমগ্র কর্মক্ষেত্রটির ওপর একই সময়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টি দিতে পারে না। তাই মানুষ নিজেই নিজের জীবনের জন্য এমন কোন পথ তৈরী করতে পারে না যেখানে তার সমস্ত শক্তির সাথে পুরোপুরি ইনসাফ করা যেতে পারে, যেখানে তার সমস্ত ইচ্ছা ও আশা-আকাংখা যথাযথভাবে পূর্ণ করা যায়, তার সমস্ত আবেগ, অনুভূতি ও প্রবণতার মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, একটি ন্যায়ানুগ সমতা রক্ষা করে তার ভেতরের ও বাইরের সমস্ত চাহিদা ও দাবী পূরণ করা যায়, তার সমাজ জীবনের সমস্ত সমস্যার প্রতি যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করে তাদের সুষ্ঠু সমাধান বের করা যায় এবং জড় বস্তুগুলোকেও ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ন্যায়, ইনসাফ, সমতা, ভারসাম্য ও সত্যনিষ্ঠা সহকারে ব্যবহার করা যায়। মানুষ নিজেই যখন নিজের নেতা ও বিধাতায় পরিণত হয় তখন সত্যের বিভিন্ন দিকের মধ্য থেকে কোন একটি দিক, জীবনের প্রয়োজনের মধ্য থেকে কোন একটি প্রয়োজন, সমাধান প্রত্যাশী সমস্যাগুলোর কোন একটি সমস্যা তার মস্তিষ্ক ও চিন্তা জগতকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যে, অন্যান্য দিক, প্রয়োজন ও সমস্যাগুলোর সাথে সে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বে-ইনসাফী করতে থাকে। তখন তার এ সিদ্ধান্তকে জোরপূর্বক প্রতিষ্ঠিত করার ফলে জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং সে ভারসাম্যহীনতার কোন এক প্রান্তের দিকে বাঁকাভাবে চলতে থাকে। তারপর এভাবে চলতে চলতে বক্রতার শেষ প্রান্তে পৌঁছার আগেই তা মানুষের জন্য অসহনীয় হয়ে ওঠে। ফলে যে সমস্ত দিক, প্রয়োজন ও সমস্যার সাথে বেইনসাফী করা হয়েছিল তারা বিদ্রোহ শুরু করে দেয় এবং তাদের সাথে ইনসাফ করার জন্য তারা চাপ দিতে থাকে। কিন্তু এরপরও ইনসাফ হয় না। কারণ আবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। অর্থাৎ আগের ভারসাম্যহীনতার কারণে যেগুলোকে সবচেয়ে বেশী দাবিয়ে দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্য থেকে কোন একটি মানুষের মস্তিষ্ক ও চিন্তা জগতকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং একটি বিশেষ দাবী অনুযায়ী একটি বিশেষ দিকে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এখানে আবার অন্যান্য দিক, প্রয়োজন ও সমস্যার সাথে
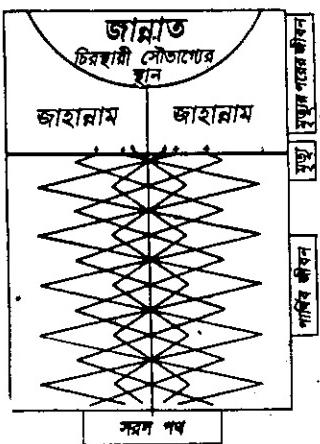
বেইনসাফী হতে থাকে। এভাবে সরল সোজা পথে চলা মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব হয় না। সবসময়ই সে ঢেউয়ের দোলায় দোদুল্যমান থাকে এবং ধ্বংসের এক কিনার থেকে আর এক কিনারে তাকে ঠেলে দেয়া হয়। মানুষ নিজের জীবন ক্ষেত্রে চলার জন্য যতগুলো পথ তৈরী করেছে সবই বক্র রেখার মতো। একটি ভুল দিক থেকে যাত্রা শুরু করে আর একটি ভুল প্রান্তে গিয়ে তার চলা শেষ হয়। আবার সেখান থেকে যখন চলা শুরু করে তখন কোন ভুল দিকেই এগিয়ে চলে।

এ অসংখ্য বক্র ও ভুল পথের মধ্য দিয়ে এমন একটি পথ চলে গেছে যার অবস্থান ঠিক মধ্যভাগে। এ পথে মানুষের সমস্ত শক্তি সামর্থ, প্রবণতা, আশা–আকাংখা, আবেগ, অনুভূতি, তার দেহ ও আত্মার সমস্ত দাবী ও চাহিদা এবং তার জীবনের যাবতীয় সমস্যার সাথে পূর্ণ ইনসাফ করা হয়েছে। এ পথে কোন প্রকার বক্রতার লেশ মাত্র নেই। কোন দিকের প্রতি অযথা পক্ষপাতিত্ব ও তাকে সুযোগ–সুবিধা দান এবং কোন দিকের সাথে জুলুম ও বেইনসাফী করার প্রশ্নই এখানে নেই। মানুষের জীবনের সঠিক উন্নয়ন, ক্রমবিকাশ এবং তার সাফল্য ও অগ্রগতির জন্য এ ধরনের একটি পথ একান্ত অপরিহার্য। মানুষের মূল প্রকৃতি এ পথেরই সন্ধানে ফিরছে। এ সোজা সরল রাজপথটির অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকার কারণেই তার বিভিন্ন বক্র পথের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু নিজের চেষ্টায় এ রাজপথের সন্ধান লাভ করার ক্ষমতা মানুষের নেই। একমাত্র আল্লাহই তাকে এ পথের সন্ধান দিতে পারেন। মানুষকে এ পথের সন্ধান দেবার জন্যই আল্লাহ তাঁর রসূল পাঠিয়েছেন।

কুরআন এ পথকেই 'সাওয়া–উস–সাবীল' ও 'সিরাতুল মুস্তাকীম' আখ্যা দিয়েছে। দুনিয়ার এ জীবন থেকে নিয়ে আখেরাতের জীবন পর্যন্ত অসংখ্য বক্র পথের মধ্য দিয়ে এ সরল সোজা রাজপথটি চলে গেছে। যে ব্যক্তি এ পথে অগ্রসর হয়েছে সে এ দুনিয়ায়ও সঠিক পথের যাত্রী এবং আখেরাতেও সফলকাম হয়েছে। আর যে ব্যক্তি এ পথ হারিয়ে ফেলেছে সে এখানে বিভ্রান্ত হয়েছে, ভুল পথে চলেছে এবং আখেরাতেও অনিবার্যভাবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। কারণ, জীবনের সমস্ত বক্র পথ জাহান্নামের দিকেই চলে গেছে।

আধুনিক যুগের কতিপয় অজ্ঞ দার্শনিক মানুষকে উপর্যুপরি এক প্রান্তিকতা থেকে আর এক প্রান্তিকতার দিকে ধেয়ে চলতে দেখে এ ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া (Dialectic Process) মানব জীবনের উন্নতি, অগ্রগতি ও ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক পথ। নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কারণে তারা এ ধারণা করে বসেছেন যে, প্রথমে একটি চরমপন্থী দাবী (Thesis) মানুষকে একদিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তারপর এর

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَٰسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ ۙ وَنَسُوا۟ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّا نَصَٰرَىٰٓ أَخَذْنَا مِيثَٰقَهُمْ فَنَسُوا۟ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾

তারপর তাদের নিজেদের অংগীকার ভংগের কারণেই আমি তাদেরকে নিজের রহমত থেকে দূরে নিক্ষেপ করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি। এখন তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা শব্দের হেরফের করে কথাকে একদিক থেকে আর একদিকে নিয়ে যায়, যে শিক্ষা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল তার বড় অংশ তারা ভুলে গেছে এবং প্রায় প্রতিদিনই তাদের কোন না কোন বিশ্বাসঘাতকতার খবর তুমি লাভ করে থাকো, তাদের অতি অল্প সংখ্যক লোকই এ দোষমুক্ত আছে (কাজেই তারা যখন এ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তখন তাদের যে কোন কুকর্ম মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়)। তাই তাদেরকে মাফ করে দাও এবং তাদের কাজকর্মকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখো। আল্লাহ তাদেরকে পসন্দ করেন যারা সৎকর্মশীলতা ও পরোপকারের নীতি অবলম্বন করে।

এভাবে যারা বলেছিল আমরা "নাসারা"[৩৬] তাদের থেকেও আমি পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের স্মৃতিপটে যে শিক্ষা সংবদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল তারও বড় অংশ তারা ভুলে গেছে। শেষ পর্যন্ত আমি তাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও পারস্পরিক হিংসা–বিদ্বেষের বীজ বপন করে দিয়েছি। আর এমন এক সময় অবশ্যি আসবে যখন আল্লাহ তাদের জানিয়ে দেবেন তারা দুনিয়ায় কি করতো।

প্রতিক্রিয়ায় একই পর্যায়ের আরেকটি চরম ভাবাপন্ন দাবী (Antithesis) তাকে আর এক প্রান্তে ঠেলে নিয়ে যায়। আর এরপর তাদের উভয়ের মিশ্রণে (Synthesis) জীবনের অগ্রগতি ও বিকাশের পথ তৈরী হয়। তাদের মতে এটিই হচ্ছে মানব জীবনের ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশের পথ। অথচ এটি মোটেই ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির পথ নয়। বরং এ

হচ্ছে দুর্ভাগ্যের ধাক্কা, যা মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার এবং তার যথার্থ ক্রমবিকাশের পথে বারবার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। প্রত্যেকটি চরমপন্থী ও প্রান্তিকতাবাদী দাবী জীবনকে কোন একটি লক্ষের দিকে চালিত করে এবং তাকে টেনে নিয়ে চলে। এভাবে চলতে চলতে যখন সে 'সাওয়া–উস–সাবীল' থেকে অনেক দূরে সরে যায় তখন জীবনেরই অপর কতকগুলো উপেক্ষিত সত্য, যাদের সাথে বেইনসাফী করা হচ্ছিল, তারাই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকে। এ বিদ্রোহ একটি পাল্টা দাবীর আকারে আত্মপ্রকাশ করে তাকে উল্টো দিকে টানতে থাকে। 'সাওয়া–উস্ সাবীল' যত কাছে আসতে থাকে ততই এ সংঘর্ষশীল দাবীগুলোর মধ্যে আপোস হতে থাকে এবং তাদের মিশ্রণে এমন কিছু জিনিস অস্তিত্বলাভ করে যা মানুষের জীবনের জন্য উপকারী ও লাভজনক। কিন্তু যখন সেখানে 'সাওয়া–উস–সাবীলের' সন্ধান দেয়ার মতো আলো থাকে না এবং তার ওপর অবিচল থাকার মতো ঈমানেরও অস্তিত্ব থাকে না তখন এ পাল্টা দাবী জীবনকে সেই স্থানে টিকে থাকতে দেয় না বরং নিজের শক্তির জোরে তাকে বিপরীত প্রান্তিকতার দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত জীবনের অন্য কিছু সত্যকে অস্বীকার করার পর্ব শুরু হয়ে যায়। এর ফলে আর একটা বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এসব সংকীর্ণ দৃষ্টির অধিকারী দার্শনিকদের মধ্যে যদি কুরআনের আলো পৌঁছে গিয়ে থাকতো এবং তারা 'সাওয়া–উস–সাবীল' কি জিনিস তা দেখতে পেতেন। তাহলে তারা জানতে পারতেন, এ 'সাওয়া–উস–সাবীল'ই মানুষের জন্য একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল পথ। বক্র রেখায় ক্রমাগত এক প্রান্তিকতা থেকে আর এক প্রান্তিকতায় ধাক্কা খেয়ে বেড়ানো মানব জীবনের ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশের কোন সঠিক ও নির্ভুল পথ নয়।

৩৬. অনেকে মনে করেন নাসারা (نصارى) শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে হযরত ঈসার জন্মভূমির নাম 'নাসেরা' (ناصره) থেকে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। আসলে নাসারা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'নুসরাত' (نصرت) থেকে। ঈসা আলাইহিস সালামের উক্তি من انصارى الى الله (আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে?) এর জবাবে তাঁর হাওয়ারীগণ نحن انصار الله (আমরা হবো আল্লাহর কাজে সাহায্যকারী) বলে বক্তব্য পেশ করেছিলেন। সেখান থেকেই এর উৎপত্তি। খৃষ্টান লেখকরা নিছক বাহ্যিক সাদৃশ্য দেখে এ বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন যে, খৃষ্টবাদের ইতিহাসের প্রথম যুগে নাসেরীয়া(Nazarenes) নামে একটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল; তাদেরকে তাচ্ছিল্যের সাথে নাসেরী ও ইবূনী বলা হতো এবং কুরআন তাদের নামকেই সমগ্র খৃষ্টান সম্প্রদায়ের জন্য ব্যবহার করেছে। কিন্তু এখানে কুরআন দ্ব্যর্থহীন কন্ঠে ঘোষণা করছে যে, তারা নিজেরাই বলেছিল ঃ 'আমরা নাসারা'। আর একথাও সুস্পষ্ট যে, খৃষ্টানরা নিজেরা কখনো নিজেদেরকে নাসেরী বলে পরিচয় দেয়নি।

এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কখনো নিজের অনুসারীদেরকে 'ঈসায়ী' 'খৃষ্টান' বা 'মসীহী' নামে আখ্যায়িত করেননি। কারণ তিনি নিজের নামে কোন নতুন ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করতে আসেননি। হযরত মূসা

আলাইহিস সালাম এবং তাঁর আগের ও পরের নবীগণ যে দীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন তারই পুনরুজ্জীবন ছিল তাঁর দাওয়াতের লক্ষ। তাই তিনি সাধারণ বনী ইসরাঈলদের এবং মূসার শরীয়াতের অনুসারীদের থেকে আলাদা কোন দল গঠন করেননি এবং তাদের কোন আলাদা নামও রাখেননি। তাঁর প্রাথমিক যুগের অনুসারীরা নিজেদেরকে ইসরাঈলী মিল্লাত থেকে আলাদা মনে করতেন না এবং নিজেরা কোন স্বতন্ত্র দল হিসেবেও সংগঠিত হননি। নিজেদের পরিচিতির জন্য তারা কোন বৈশিষ্টমূলক নাম ও চিহ্ন গ্রহণ করেননি। তারা ইহুদীদের সাথে বাইতুল মাকদিসের হাইকেলেই (ধর্মধাম) ইবাদাত করতে যেতেন এবং মূসার শরীয়াতের বিধিবিধান মেনে চলাকেই নিজেদের কর্তব্য মনে করতেন। (দেখুন বাইবেল, প্রেরিতদের কার্য বিবরণ পুস্তক ৩ ঃ ১–১০, ৫ ঃ ২১–২৫)।

পরবর্তী সময়ে উভয় পক্ষ থেকেই বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যক্রম শুরু হয়েছে। একদিকে হযরত ঈসার (আ) অনুসারীদের মধ্য থেকে সেন্টপল ঘোষণা করেন যে, শরীয়াতের বিধান অনুসরণের আর প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র ঈসার ওপর ঈমান আনাই নাজাতের তথা পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট। আবার অন্যদিকে ইহুদী আলেমগণও হযরত ঈসার অনুসারীদেরকে একটি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় বলে ঘোষণা করে তাদেরকে সাধারণ বনী ইসরাঈলদের থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। কিন্তু এ বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও শুরুতে এ নতুন সম্প্রদায়ের কোন পৃথক নাম ছিল না। হযরত ঈসার অনুসারীরা নিজেদেরকে কখনো 'শিষ্য' বলে উল্লেখ করতেন, কখনো 'ভ্রাতৃগণ' (ইখওয়ান), 'বিশ্বাসী' (মুমিন), 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে' (আল্লাযীনা আমানূ) আবার কখনো 'পবিত্রগণ' বলেও উল্লেখ করেছেন (প্রেরিতদের কার্যবিবরণ পুস্তক, ২ঃ৪৪; ৪ঃ৩২; ৯ঃ২৬; ১১ঃ২৯; ১৩ঃ৫২; ১৫ঃ১ ও ২৩, রোমীয় ১৫ঃ২৫; কলসীয় ১ঃ১২)। অন্যদিকে ইহুদীরা এদেরকে কখনো 'গালীলী', কখনো 'নাসেরী' বা 'নাসরতী' আবার কখনো 'বেদাতী সম্প্রদায়' বলে অভিহিত করতো (প্রেরিতদের কার্য বিবরণ ২৪ঃ৫, লূক ১৩ঃ২)। নিছক নিন্দা ও বিদ্রূপচ্ছলে হযরত ঈসার অনুসারীদেরকে এ নামে ডাকার কারণ ছিল এই যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মভূমি ছিল নাসেরা এবং তা ছিল ফিলিস্তিনের গালীল জেলার অন্তর্গত। কিন্তু তাদের এ বিদ্রূপাত্মক শব্দগুলো খুব বেশী প্রচলিত হতে পারেনি। ফলে এগুলো হযরত ঈসার অনুসারীদের নামে পরিণত হতে সক্ষম হয়নি।

এ দলের বর্তমান নাম "খৃষ্টান" (Christian) সর্বপ্রথম আন্তাকিয়াতে (انطاكيه) প্রদত্ত হয়। সেখানে ৪৩ বা ৪৪ খৃষ্টাব্দে কতিপয় মুশরিক অধিবাসী হযরত ঈসার অনুসারীদেরকে এ নামে অভিহিত করে। সে সময় সেন্টপল ও বার্নাবাস সেখানে পৌঁছে ধর্ম প্রচারের কাজে নিয়োজিত হন। (প্রেরিতদের কার্য ১১ঃ২৬)। এ নামটিও মূলত বিরোধীদের পক্ষ থেকেই ঠাট্টা–বিদ্রূপচ্ছলেই রাখা হয়েছিল। ঈসার অনুসারীরা নিজেরাও এটাকে তাদের নাম হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু তাদের শত্রুরা যখন তাদেরকে ঐ নামে ডাকতে শুরু করলো তখন তাদের নেতারা বললেন, যদি তোমাদেরকে খৃষ্টের সাথে যুক্ত করে খৃষ্টান বলে ডাকা হয়। তাহলে তাতে তোমাদের লজ্জা পাবার কি কারণ থাকতে পারে? (১–পিতর ৪ঃ১৬) এভাবে তারা নিজেরাই ধীরে ধীরে শত্রুদের বিদ্রূপচ্ছলে দেয়া এ নামে নিজদেরকে আখ্যায়িত করতে থাকে। অবশেষে তাদের মধ্যে এ অনুভূতিই

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ كَثِيرٗا مِّمَّا كُنتُمۡ تُخۡفُونَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖۚ قَدۡ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٞ وَكِتَٰبٞ مُّبِينٞ ﴿١٥﴾ يَهۡدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضۡوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِهِۦ وَيَهۡدِيهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ﴿١٦﴾

হে আহলি কিতাব! আমার রসূল তোমাদের কাছে এসে গেছে। সে আল্লাহর কিতাবের এমন অনেক কথা তোমাদের কাছে প্রকাশ করছে যেগুলো তোমরা গোপন করে রাখতে এবং অনেক ব্যাপার ক্ষমার চোখেও দেখছে।[৩৭] *তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে গেছে এক জ্যোতি এবং এমন একখানি সত্য দিশারী কিতাব, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর সন্তোষকামী লোকদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথপ্রদর্শন করেন*[৩৮] *এবং নিজ ইচ্ছাক্রমে তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের দিকে নিয়ে আসেন এবং সরল–সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করেন।*

খতম হয়ে যায় যে, এটি আসলে একটি খারাপ নাম এবং তাদেরকে শত্রুরা বিদ্রূপচ্ছলে এ নাম দিয়েছিল।

কুরআন এ কারণেই খৃস্টের অনুসারীদের ঈসায়ী, মসীহী বা খৃস্টান নামে আখ্যায়িত করেনি। বরং তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, তোমরা আসলে সেসব লোকদের অন্তর্গত যাদেরকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম 'মান আনসারী ইলাল্লাহ (কে আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে?) বলে আহবান জানিয়েছিলেন এবং এর জবাবে সেই লোকেরা বলেছিল 'নাহ্নু আনসারুল্লাহ (আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী)।' তাই তোমরা নিজেদের প্রাথমিক ও মৌলিক তাৎপর্যের দিক দিয়ে নাসারা বা আনসার। কিন্তু আজকের খৃষ্টীয় মিশনারীরা এ বিস্মৃত বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেবার কারণে কুরআনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে উলটো অভিযোগ জানাচ্ছে যে, কুরআন তাদেরকে খৃস্টান না বলে নাসারা বলছে কেন?

৩৭. অর্থাৎ তোমাদের অনেক চুরি ও খেয়ানত ফাঁস করে দিচ্ছেন, আল্লাহর সত্য দীন কায়েম করার জন্য যেগুলো ফাঁস করে দেয়া অপরিহার্য। আর যেগুলো ফাঁস করে দেয়ার তেমন কোন যথার্থ প্রয়োজন নেই সেগুলো এড়িয়ে যাচ্ছেন।

৩৮. শান্তি ও নিরাপত্তা মানে ভুল দেখা, ভুল আন্দাজ–অনুমান করা ও ভুল কাজ করা থেকে দূরে থাকা এবং এর ফলাফল থেকেও নিজেকে সংরক্ষিত রাখা। যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের জীবন থেকে আলো সংগ্রহ করে, চিন্তা ও কর্মের

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥ وَمَن فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

যারা বলে, "মারয়াম পুত্র মসীহই আল্লাহ" তারা অবশ্যি কুফরী করেছে।[৩৯] হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, আল্লাহ যদি মারয়াম পুত্র মসীহকে, তার মাকে ও সারা দুনিয়াবাসীকে ধ্বংস করতে চান, তাহলে তাঁকে তাঁর এ সংকল্প থেকে বিরত রাখার ক্ষমতা কার আছে? আল্লাহ তো আকাশসমূহের এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন।[৪০] তাঁর শক্তি সবকিছুর ওপর পরিব্যাপ্ত।

প্রতিটি চৌমাথায় পৌছে সে কিভাবে এ ভুলগুলো থেকে সংরক্ষিত থেকেছে তা বুঝতে পারে।

৩৯. খৃষ্টবাদীরা শুরুতেই ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যক্তিত্বকে মানবিক সত্তা ও ইলাহী সত্তার মিশ্রণ গণ্য করে যে ভুল করেছিল তার ফলে হযরত ঈসার যথার্থ রূপ গোলক ধাঁধায় পরিণত হয়েছে। খৃষ্টীয় আলেম সমাজ এ ধাঁধাঁর রহস্য উন্মোচনে যতই বাগাড়ম্বর ও কল্পনা–অনুমানের আশ্রয় নিয়েছেন। ততই জটিলতা বেড়ে গেছে। তাদের মধ্য থেকে যার চিন্তায় এ মিশ্র ব্যক্তিত্বের মানবিক সত্তার দিকটি বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে তিনি ঈসাকে আল্লাহর পুত্র এবং তিন জন স্বতন্ত্র খোদার একজন হবার ওপর জোর দিয়েছেন। আর যার চিন্তায় ইলাহী সত্তার দিকটি বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে, তিনি ঈসাকে আল্লাহর দৈহিক প্রকাশ গণ্য করে তাঁকে পুরোপুরি আল্লাহ বানিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁকে আল্লাহ মনে করে তাঁর ইবাদাত করেছেন। আবার এ উভয় দলের মাঝামাঝি একটা পথ বের করতে যারা চেয়েছেন তারা নিজেদের সমস্ত শক্তি এমন সব শাব্দিক ব্যাখ্যা সংগ্রহে নিয়োগ করেছেন যাতে হযরত ঈসাকে মানুষও বলা যায় আবার এ সংগে তাঁকে আল্লাহ মনে করাও যেতে পারে। আল্লাহ ও ঈসা পৃথক পৃথক থাকতে পারেন আবার একীভূতও হতে পারেন।(দেখুন, সূরা নিসা, ২১২, ২১৩ ও ২১৫ টীকা)।

৪০. এ বাক্যের মধ্যে এ মর্মে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়েছে যে, নিছক ঈসার অলৌকিক জন্ম, তাঁর নৈতিক ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং দৃষ্টি ও অনুভূতি গ্রাহ্য অলৌকিক কার্যকলাপে বিভ্রান্ত হয়ে যারা ঈসাকে 'আল্লাহ' মনে করছে তারা আসলে একান্তই অজ্ঞ। ঈসাতো আল্লাহর অসংখ্য অলৌকিক সৃষ্টির একটি নমুনা মাত্র। এটি দেখেই এসব দুর্বল দৃষ্টির অধিকারী লোকদের চোখ ঝল্সে গেছে। এদের দৃষ্টি যদি আর একটু প্রসারিত হতো

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ
يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ
وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؗ
وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿۱۸﴾ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى
فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ؗ فَقَدْ جَآءَكُمْ
بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۹﴾

ইহুদী ও খৃষ্টানরা বলে, "আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়পাত্র।" তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তাহলে তোমাদের গোনাহের জন্য তিনি তোমাদের শাস্তি দেন কেন? আসলে তোমরাও ঠিক তেমনি মানুষ যেমন আল্লাহ অন্যান্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি যাকে চান মাফ করে দেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন। পৃথিবী ও আকাশসমূহ এবং এ দুয়ের মধ্যকার যাবতীয় সৃষ্টি আল্লাহর মালিকানাধীন এবং তাঁরই দিকে সবাইকে যেতে হবে।

হে আহ্‌লি কিতাব! আমার এ রসূল এমন এক সময় তোমাদের কাছে এসেছেন এবং তোমাদেরকে দীনের সুস্পষ্ট শিক্ষা দিচ্ছেন যখন দীর্ঘকাল থেকে রসূলদের আগমনের সিল্‌সিলা বন্ধ ছিল, তোমরা যেন একথা বলতে না পারো, "আমাদের কাছে তো সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী আসেনি।" বেশ, এই দেখো, এখন সেই সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী এসে গেছেন এবং আল্লাহ সবকিছুর ওপর শক্তিশালী।[৪১]

তাহলে এরা দেখতে পেতো, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির এর চাইতে আরো অনেক বেশী বিস্ময়কর নমুনা পেশ করে যাচ্ছেন এবং তাঁর শক্তি কোন একটি বিশেষ সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নেই। কাজেই সৃষ্টির কোন বিস্ময়কর ক্ষমতা দেখে তাকে স্রষ্টা মনে করা বিরাট অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। বরং সৃষ্টির কৃতিত্ব ও বিস্ময়কর কার্যাবলীর মধ্যে যে ব্যক্তি স্রষ্টার অসীম ক্ষমতার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে এবং তা থেকে ঈমানের আলো সংগ্রহ করে সে-ই যথার্থ বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী।

৪১. এ বাক্যটি গভীর অর্থব্যঞ্জক ও উচ্চাংগের সাহিত্যিক অলংকারে সমৃদ্ধ। এখানে এর একটি অর্থ হচ্ছে, যে আল্লাহ ইতিপূর্বে সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَٰقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ
أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾
يَٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ
أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا يَٰمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ
وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا
دَاخِلُونَ ﴿٢٢﴾

৪ রুকূ'

স্মরণ করো যখন মূসা তার জাতিকে বলেছিল, "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা আল্লাহর সেই নিয়ামতের কথা মনে করো, যা তিনি তোমাদের দান করেছিলেন। তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নবীর জন্ম দিয়েছেন, তোমাদেরকে শাসকে পরিণত করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন সব জিনিস দিয়েছেন, যা দুনিয়ায় আর কাউকে দেননি।[৪২] হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! সেই পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন।[৪৩] পিছনে হটো না। পিছনে হটলে তোমরা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৪৪] তারা জবাব দিল, "হে মূসা! সেখানে একটা অতীব দুর্ধর্ষ জাতি বাস করে। তারা সেখান থেকে বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা কখনই সেখানে যাবো না। হাঁ, যদি তারা বের হয়ে যায় তাহলে আমরা সেখানে প্রবেশ করতে প্রস্তুত আছি।"

পাঠাবার ক্ষমতা রাখতেন এখন তিনিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেই একই দায়িত্বে নিয়োগ করেছেন এবং এ ধরনের নিযুক্তির ক্ষমতাও তাঁর ছিল। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা এ সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারীর কথা না মানো, তাহলে মনে রেখো, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু করতে সক্ষম। তিনি তোমাদের যে শাস্তি দিতে চান তা কার্যকর করার ব্যাপারে তাঁকে কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয় না।

৪২. এখানে বনী ইসরাঈলের অতীত গৌরবের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের বহু পূর্বে কোন এক সময়ে তারা এ গৌরবের অধিকারী ছিল। একদিকে তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিলেন হযরত ইবরাহীম, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফের মতো মহান নবী ও রসূলগণ এবং অন্যদিকে তারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের আমলে ও তার পরবর্তী কালে মিসরে

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۛ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

ঐ ভীরু লোকদের মধ্যে দু'জন এমন লোকও ছিল[৪৫] যাদের প্রতি আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলেন। তারা বললো, "এ শক্তিশালী লোকদের মোকাবিলা করে দরজার মধ্যে ঢুকে পড়ো। ভেতরে প্রবেশ করলে তোমরাই জয়ী হবে। আর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহর ওপর নির্ভর করো।" কিন্তু তারা আবার সেই একই কথা বললো ঃ "হে মূসা! যতক্ষণ তারা সেখানে অবস্থান করবে ততক্ষণ আমরা কোনক্রমেই সেখানে যাবো না। কাজেই তুমি ও তোমার রব, তোমরা দু'জনে সেখানে যাও এবং লড়াই করো, আমরা তো এখানে বসেই রইলাম।" একথায় মূসা বললো, "হে আমার রব! আমার ও আমার ভাই ছাড়া আর কারোর ওপর আমার কোন ইখতিয়ার নেই। কাজেই তুমি এ নাফরমান লোকদের থেকে আমাকে আলাদা করে দাও।" আল্লাহ জবাব দিলেন ঃ ঠিক আছে, তাহলে ঐ দেশটি চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য হারাম। তারা পৃথিবীতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবে,[৪৬] এ নাফরমানদের প্রতি কখনো সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করো না।"[৪৭]

ব্যাপক শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছিল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারাই ছিল তৎকালীন সভ্য জগতের সবচেয়ে প্রতাপশালী শাসক শক্তি এবং মিসর ও তার আশপাশের দেশে তাদেরই মুদ্রা প্রচলিত ছিল। সাধারণত ঐতিহাসিকগণ বনী ইসরাঈলের উত্থানের ইতিহাস শুরু করেন হযরত মূসার (আ) আমল থেকে। কিন্তু কুরআন এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করছে যে, বনী ইসরাঈলের উত্থানের আসল যুগটি ছিল হযরত মূসার পূর্বে এবং হযরত মূসা নিজেই তার জাতির সামনে তাদের এ গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরেছিলেন।

৪৩. এখানে ফিলিস্তিনের কথা বলা হয়েছে। এ দেশটি হযরত ইবরাহীম, হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকুবের আবাসভূমি ছিল। বনী ইসরাঈল মিসর থেকে বের হয়ে এলে

আল্লাহ তাদের জন্য এ দেশটি নির্দিষ্ট করেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে এ দেশটি জয় করার নির্দেশ দেন।

৪৪. হযরত মূসা তাঁর জাতিকে নিয়ে মিসর থেকে বের হবার প্রায় দু'বছর পর যখন তাদের সাথে ফারানের মরু অঞ্চলে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করছিলেন তখনই এ ভাষণটি দেন। এ মরু অঞ্চলটি আরবের উত্তরে ও ফিলিস্তিনের দক্ষিণ সীমান্ত সংশ্লিষ্ট সাইনা উপদ্বীপে অবস্থিত।

৪৫. 'ভীরু লোকদের মধ্য থেকে দু'জন বললো'–এ বাক্যাংশটির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, যারা শক্তিশালীদেরকে ভয় করছিল তাদের মধ্য থেকে দুজন বলে উঠলো। দুই, যারা আল্লাহকে ভয় করতো তদের মধ্য থেকে দু'জন বলে উঠলো।

৪৬. এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বাইবেলের গণনা পুস্তক, দ্বিতীয় বিবরণ ও যিহোশূয় পুস্তকে পাওয়া যাবে। এর সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে ঃ হযরত মূসা ফিলিস্তিনের অবস্থা জানার জন্য ফারান থেকে বনী ইসরাঈলের ১২ জন সরদারকে ফিলিস্তিন সফরে পাঠান। তারা ৪০ দিন সফর করার পর সেখান থেকে ফিরে আসেন। জাতির এক সাধারণ সমাবেশে তারা জানান যে, ফিলিস্তিন তো খাদ্য ও অন্যান্য ভোগ্য সামগ্রীর প্রাচুর্যে ভরা এক সুখী সমৃদ্ধ দেশ, এতে সন্দেহ নেই। "কিন্তু সেখানকার অধিবাসীরা অত্যন্ত শক্তিশালী ...... তাদের ওপর আক্রমণ করার ক্ষমতা আমাদের নেই......... সেখানে আমরা যত লোক দেখেছি তারা সবাই বড়ই দীর্ঘদেহী। সেখানে আমরা বনী ইনাককেও দেখেছি। তারা মহাপরাক্রমশালী ও দুর্ধর্ষ। তারা বংশ পরম্পরায় পরাক্রমশালী। আর আমরা তো নিজেদের দৃষ্টিতেই ফড়িংয়ের মতো ছিলাম এবং তাদের দৃষ্টিতেও।"......এ বর্ণনা শুনে সবাই সমস্বরে বলে উঠে ঃ "হায়, যদি আমরা মিসরেই মরে যেতাম! হায়, যদি এ মরুর বুকেই আমরা মরে যেতাম! আল্লাহ কেন আমাদের ঐ দেশে নিয়ে গিয়ে তরবারির সাহায্যে হত্যা করাতে চায়? এরপর আমাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা তো লুটের মালে পরিণত হবে। আমাদের জন্য মিসরে ফিরে যাওয়াই কি মংগলজনক হবে না?" তারপর তারা পরস্পর বলাবলি করতে থাকে এসো আমরা কাউকে নিজেদের সরদার বানিয়ে নিই এবং মিসরে ফিরে যাই। একথা শুনে ফিলিস্তিনে যাদেরকে পাঠানো হয়েছিল সেই বারোজন সরদারদের মধ্য থেকে দু'জন—ইউশা ও কালেব উঠে দাঁড়ান। তারা এ ভীরুতা ও কাপুরুষতার জন্য জাতিকে তিরস্কার করেন। কালেব বলেন, "চলো, আমরা অতর্কিতে আক্রমণ করে সে দেশটি দখল করে নিই। কারণ সে দেশটি পরিচালনা করার যোগ্যতা আমাদের আছে।" তারপর তারা দু'জন এক বাক্যে বলে ওঠেন, "যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে তিনি অবশ্যি আমাদের সে দেশে পৌছাবেন।....... তবে তোমরা যেন আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করো এবং সে দেশের লোকদের ভয়ে ভীত না হও।" "আমাদের সাথে আল্লাহ আছেন, কাজেই ওদের ভয় পেয়ো না।" কিন্তু জাতি তার জবাব দিল একথা বলে, "ওদেরকে পাথর মেরে হত্যা করো।" অবশেষে আল্লাহর ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠলো এবং তিনি ফায়সালা করলেন, এখন ইউশা ও কালেব ছাড়া এ জাতির বয়স্ক পুরুষদের মধ্য থেকে আর কেউ সে ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে পারবে না। এ জাতি চল্লিশ বছর পর্যন্ত গৃহহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে থাকবে। অবশেষে যখন এদের মধ্যকার বিশ বছরের থেকে শুরু করে তার ওপরের বয়সের সমস্ত লোক মরে যাবে এবং নবীন বংশধররা যৌবনে প্রবেশ

বনী ইসরাঈলের মরু পরিক্রমা
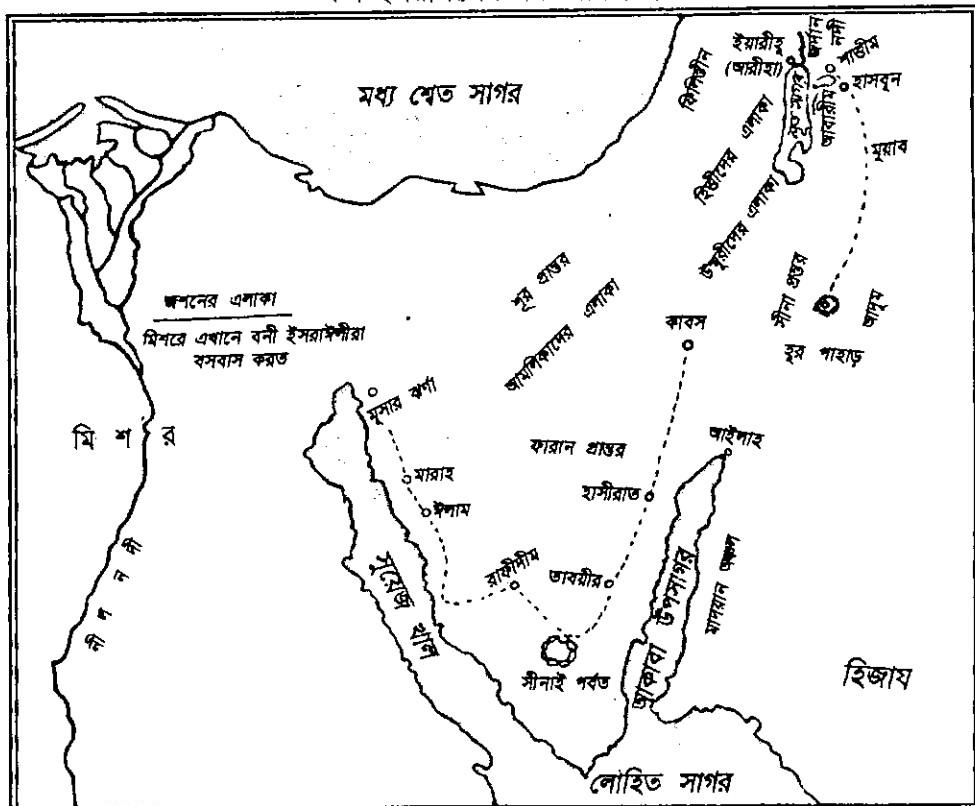
ব্যাখ্যা ঃ হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলদের মিসর হতে বের করে সীনা প্রান্তরের মারাহ, ঈলাম ও রফীদাম-এর পথে সীনা পর্বতের দিকে আসেন এবং এক বছরের কিছু বেশী কাল পর্যন্ত এ স্থানে অবস্থান করতে থাকেন। তাওরাতের বেশীর ভাগ বিধান এখানেই নাযিল হয়। অতপর তাকে বনী ইসরাঈলদের নিয়ে ফিলিস্তিনের দিকে যাওয়ার এবং উহা জয় করার নির্দেশ দেয়া হয়। বলা হয়, ইহা তোমাদেরকে মীরাস হিসেবে দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ অনুযায়ী হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলদের সাথে নিয়ে তাব্য়ীর ও হাসীরাত-এর পথে 'ফারান' প্রান্তরে উপস্থিত হন। এখান হতে তিনি ফিলিস্তিনের অবস্থা জানার জন্য একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। ফিদিল নামক জায়গায় এ প্রতিনিধিদল ফিরে এসে রিপোর্ট পেশ করে। হযরত ইউশা' ও কালিব ছাড়া প্রতিনিধি দলের অন্যান্যের রিপোর্ট ছিল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। বনী ইসরাঈলরা তা শুনে চীৎকার করে উঠে এবং তারা ফিলিস্তিন অভিযানে যেতে অস্বীকার করে। তখন আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিলেন যে, এখন হতে চল্লিশ বছর কাল এরা এ অঞ্চলে ঘুরে ফিরবে এবং ইউশা' ও কালিব ছাড়া বর্তমান লোকদের আর কেহ ফিলিস্তিনের চেহারা দেখতে পাবে না। এর পর বনী ইসরাঈলরা ফারান প্রান্তর, শূর প্রান্তর, চীন প্রান্তর-এর মাঝে ইতস্তত দিশাহারা হয়ে ঘুরতে থাকে এবং আমালিকা, উমূরিয়া, আদুমীয়, মাদিয়ানী এবং মুয়াব-এর লোকদের সাথে লড়াই করতে থাকে। চল্লিশ বছর অতিবাহিত হবার উপক্রম হলে আদূম-এর সীমান্তের নিকট 'হূর' পর্বতে হযরত হারুন (আ) ইন্তেকাল করেন। পরে হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলদের নিয়ে মুয়াব অঞ্চলে প্রবেশ করেন ও এ পূর্ণ অঞ্চলটিকে দখল করে নিলেন। এভাবে হাসবুন ও শিত্তীম পর্যন্ত পৌছেন এবং আবারীম পর্বতে হযরত মূসা (আ) প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁর পর তাঁর প্রথম খলীফা ইউশা' পূর্বদিক হতে উর্দূন নদী পার হয়ে ইয়ারুহু (আরীহা) শহর জয় করেন। ইহা ছিল ফিলিস্তিনের প্রথম শহর, যা বনী ইসরাঈলদের দখলে আসে। এরপর অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র ফিলিস্তিন তারা দখল করে।

এ মানচিত্রে উদ্ধৃত 'আয়লা' (প্রাচীন নাম ঈলাত আর বর্তমান নাম আকাবা) সেই ঐতিহাসিক স্থান, যেখানে সম্ভবত শনিবার ওয়ালাদের সূরা আল বাকারা (৮ রুকূ') ও সূরা আল আরাফ-এর (২১ রুকূ') উল্লেখিত সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ ۘ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا
وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ۖ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ
مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ
إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

৫ রুকূ'

আর তাদেরকে আদমের দু' ছেলের সঠিক কাহিনীও শুনিয়ে দাও। তারা দু'জন কুরবানী করলে তাদের একজনের কুরবানী কবুল করা হলো, অন্য জনেরটা কবুল করা হলো না। সে বললো, আমি তোমাকে মেরে ফেলবো। সে জবাব দিল, "আল্লাহ তো মুত্তাকীদের নজরানা কবুল করে থাকেন।[৪৮] তুমি আমাকে মেরে ফেলার জন্য হাত উঠালেও আমি তোমাকে মেরে ফেলার জন্য হাত উঠাবো না।[৪৯] আমি বিশ্ব জাহানের প্রভু আল্লাহকে ভয় করি।

করবে তখনি এদেরকে ফিলিস্তিন জয় করার সুযোগ দেয়া হবে। আল্লাহর এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বনী ইসরাঈলের ফারান মরুভূমি থেকে পূর্ব জর্দানে পৌঁছতে পৌঁছতে ৩৮ বছর লেগে যায়। যেসব লোক যুব বয়সে মিসর থেকে বের হয়েছিল তারা সবাই এ সময়ের মধ্যে মারা যায়। পূর্ব জর্দান জয় করার পর হযরত মূসারও ইন্তিকাল হয়। এরপর হযরত ইউশা ইবনে নূনের খিলাফত আমলে বনী ইসরাঈল ফিলিস্তিন জয় করতে সমর্থ হয়।

৪৭. বর্ণনার ধারাবাহিকতার প্রতি দৃষ্টি রেখে চিন্তা করলে এখানে এ ঘটনার বরাত দেবার উদ্দেশ্য পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। গল্পচ্ছলে একথা বর্ণনা করে বনী ইসরাঈলকে আসলে একথা বুঝানো হচ্ছে যে, মূসার সময় অবাধ্যতা, সত্য থেকে বিচ্যুতি ও কাপুরুষতার কাজ করে তোমরা যে শাস্তি পেয়েছিলে এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক নীতি অবলম্বন করলে তার চেয়ে অনেক বেশী শাস্তি ভোগ করবে।

৪৮. অর্থাৎ তোমার কুরবানী কবুল না হয়ে থাকলে এতে আমার কোন দোষ নেই। বরং তোমার কুরবানী কবুল না হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, তোমার মধ্যে আল্লাহভীতি বা তাকওয়া নেই। কাজেই আমাকে হত্যা না করে বরং তোমার নিজের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টির চিন্তা করা উচিত।

৪৯. এর অর্থ এ নয় যে, তুমি আমাকে হত্যা করতে এলে আমি হাত বেঁধে তোমার সামনে নিহত হবার জন্য তৈরী হয়ে যাবো এবং নিজের প্রতিরক্ষা করবো না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও করো কিন্তু আমি তোমাকে হত্যা করতে চাইবো না। তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য কলা-কৌশল অবলম্বন ও ফন্দি ফিকির করতে

إِنِّىٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلنَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُۥ نَفْسُهُۥ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوَٰرِى سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَـٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَٰرِىَ سَوْءَةَ أَخِى ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّـٰدِمِينَ ﴿٣١﴾

আমি চাই, আমার ও তোমার পাপের ভার তুমি একাই বহন করো।[৫০] এবং তুমি জাহান্নামী হয়ে যাও। জালেমদের জুলুমের এটিই সঠিক প্রতিফল।" অবশেষে তার প্রবৃত্তির কুপ্ররোচনা তার ভাইকে মেরে ফেলা তার জন্য সহজ করে দিল এবং তাকে মেরে ফেলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তরভুক্ত হয়ে গেলো। তারপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন। সে মাটি খুঁড়তে লাগলো, যাতে তাকে দেখিয়ে দেয় তার ভাইয়ের লাশ কিভাবে লুকিয়ে ফেলবে। এ দৃশ্য দেখে সে বললো, হায় আফসোস! আমি এ কাকটির মতোও হতে পারলাম না যাতে নিজের ভাইয়ের লাশটিও লুকাতে পারি।[৫১] এরপর নিজের কৃতকর্মের জন্য সে খুবই অনুতপ্ত হলো।[৫২]

চাও, তা করতে পারো, এ ব্যাপারে তোমার পূর্ণ ইখতিয়ার আছে। কিন্তু তুমি আমাকে হত্যা করার প্রস্তুতি চালাচ্ছো, একথা জানার পরও আমি তার আগেই তোমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করবো না। এখানে এতটুকু কথা অবশ্যি মনে রাখতে হবে, কোন ব্যক্তির নিজেকে অবলীলায় হত্যাকারীর সামনে পেশ করে দেয়া এবং জালেমের আক্রমণ প্রতিহত না করা কোন সওয়াবের কাজ নয়। তবে যদি আমি জেনে থাকি, কোন ব্যক্তি আমাকে হত্যা করার ফিকিরে লেগে আছে এবং এ জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে আর এরপরও আমি তাকে হত্যা করার চিন্তা না করি এবং প্রথম অন্যায় আক্রমণ আমার পক্ষ থেকে না হয়ে বরং তার পক্ষ থেকে হোক, এটাকে অগ্রাধিকার দিই, তাহলে এতে অবশ্যি সওয়াব আছে। এটিই ছিল আদম আলাইহিস সালামের সৎছেলেটির বক্তব্যের অর্থ ও মূল কথা।

৫০. অর্থাৎ আমাদের পরস্পরকে হত্যা করার প্রচেষ্টায় আমাদের দু'জনের গুনাহগার হবার পরিবর্তে আমি বরং ভাল মনে করছি আমাদের উভয়ের গুনাহ তোমার একার ভাগে পড়ুক। তোমার নিজের পক্ষ থেকে হত্যার উদ্যোগের গুনাহ এবং তোমার আক্রমণ থেকে আমার আত্মরক্ষার চেষ্টার কারণে তোমার যা ক্ষতি হয় তার গুণাহও।

৫১. এভাবে মহান আল্লাহ একটি কাকের মাধ্যমে আদমের বিভ্রান্ত ও অসৎ পুত্রটিকে তার মূর্খতা ও অজ্ঞতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। আর একবার যখন সে নিজের মনের

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۫ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ﴿۳۲﴾

এ কারণেই বনী ইসরাঈলের জন্য আমি এ ফরমান লিখে দিয়েছিলাম,[৫৩] "নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন কারণে যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলো সে যেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি কারো জীবন রক্ষা করলো সে যেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জীবন রক্ষা করলো।"[৫৪] কিন্তু তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমার রসূলগণ একের পর এক সুস্পষ্ট হেদায়াত নিয়ে তাদের কাছে এলো, তারপরও তাদের বিপুল সংখ্যক লোক পৃথিবীতে সীমালংঘনকারীই থেকে গেলো।

প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার সুযোগ পেয়েছে তখন তার লজ্জা কেবলমাত্র এতটুকু বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি যে, সে লাশ লুকাবার কৌশল বের করার ব্যাপারে কাকের থেকে পেছনে থেকে গেলো কেন বরং তার মনে এ অনুভূতিও জন্ম নিয়েছে যে, নিজের ভাইকে হত্যা করে সে কত বড়ই না মূর্খতার পরিচয় দিয়েছে। পরবর্তী বাক্য "সে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হলো"—থেকে এ অর্থই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৫২. ইহুদীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর কতিপয় মর্যাদাশালী সাহাবায়ে কেরামকে হত্যা করার জন্য যে চক্রান্ত করেছিল তার ব্যাপারে তাদেরকে সূক্ষ্মভাবে তিরস্কার করাই হচ্ছে এখানে এ ঘটনাটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য। (এ জন্য এ সূরার ৩০ টীকাটি দেখে নিন) দু'টি ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মহান আল্লাহ আরবের এ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে আরব ও বিশ্ববাসীর নেতৃত্ব দানের জন্য কবুল করে নিয়েছিলেন এবং এ পুরাতন আহ্‌লি কিতাবদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন—এর ভিত্তি ছিল একমাত্র এই যে, একদিকে তাকওয়া ছিল এবং অন্যদিকে তাকওয়া ছিল না। কিন্তু যাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল তারা নিজেদের প্রত্যাখ্যাত হবার কারণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা এবং যেসব দোষ ও অপরাধের কারণে তারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল সেগুলো সংশোধন ও দূর করতে উদ্বুদ্ধ হবার পরিবর্তে আদমের বিভ্রান্ত পুত্রটি যেমন মূর্খতার গর্তে নিমজ্জিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি তারাও এমনসব লোককে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল যাদেরকে আল্লাহ কবুল করে নিয়েছিলেন। অথচ একথা সুস্পষ্ট ছিল, এ ধরনের মূর্খতাপ্রসূত কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা কখনো আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হতে

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়,[৫৫] তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলিবিদ্ধ করা হবে বা তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে। অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে।[৫৬] দুনিয়ায় তাদের জন্য এ অপমান ও লাঞ্ছনা নির্ধারিত রয়েছে আর আখেরাতে রয়েছে তাদের জন্য এর চাইতেও বড় শাস্তি। তবে যারা তোমাদের হাতে ধরা পড়ার আগেই তাওবা করে তাদের জন্য নয়। তোমাদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।[৫৭]

পারতো না। বরং এসব কার্যকলাপ তাদেরকে আল্লাহর নিকট আরো বেশী অপ্রিয় করে তুলেছিল এবং তারা আরো বেশী প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

৫৩. অর্থাৎ যেহেতু আদমের এ জালেম সন্তানটি যেসব অসৎগুণের প্রকাশ ঘটিয়েছিল বনী ইসরাঈলের মধ্যেও সেইসব গুণের নিদর্শন পাওয়া যেতো, তাই মহান আল্লাহ তাদেরকে নরহত্যা থেকে বিরত থাকার ওপর ভীষণভাবে জোর দিয়েছিলেন এবং তাঁর ফরমানে একথা লিখে দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, বর্তমান প্রচলিত বাইবেলে আল্লাহর ফরমানের এ মূল্যবান শব্দাবলীর ঠাঁই নেই। তবে তালমূদে এ বিষয়বস্তুটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি ইসরাঈলের একটি প্রাণকে হত্যা করলো আল্লাহর কিতাবের দৃষ্টিতে সে যেন সারা দুনিয়ার মানুষকে হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি ইসরাঈলের একটি প্রাণ রক্ষা করলো আল্লাহর কিতাবের দৃষ্টিতে সে যেন সারা দুনিয়ার মানুষকে রক্ষা করলো।" এভাবে তালমূদে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, হত্যা মামলায় বনী ইসরাঈলের বিচারপতিরা সাক্ষীদেরকে সম্বোধন করে বলতেন ঃ "যে ব্যক্তি একজন মানুষকে হত্যা করে সে এমনভাবে জবাবদিহি করার যোগ্য যেন সে সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হত্যা করেছে।"

৫৪. এর অর্থ হচ্ছে, দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে অন্য মানুষের প্রাণের প্রতি মর্যাদাবোধ যদি জাগ্রত থাকে এবং তাদের প্রত্যেকে অন্যের জীবনের স্থায়িত্বে ও সংরক্ষণে সাহায্যকারী হবার মনোভাব পোষণ করে তা হলেই কেবল মানব জাতির অস্তিত্ব নিশ্চিত

ও নিরাপদ হতে পারে। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে সে কেবলমাত্র ঐ এক ব্যক্তির ওপর জুলুম করে না বরং সে একথাও প্রমাণ করে যে, তার অন্তরে মানুষের জীবনের প্রতি মর্যাদাবোধ ও সহানুভূতির কোন স্থান নেই। কাজেই সে সমগ্র মানবতার শত্রু। কারণ তার মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্টের অস্তিত্ব বিরাজমান যা প্রতিটি মানুষের মধ্যে পাওয়া গেলে সারা দুনিয়া থেকে মানব জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষের জীবন রক্ষায় সাহায্য করে সে আসলে মানবতার সাহায্যকারী ও সমর্থক। কারণ তার মধ্যে এমন গুণ পাওয়া যায়, যার ওপর মানবতার অস্তিত্ব নির্ভরশীল।

৫৫. পৃথিবী বলতে এখানে পৃথিবীর সেই অংশ ও অঞ্চল বুঝাচ্ছে যেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা কায়েম করার দায়িত্ব ইসলামী সরকার গ্রহণ করেছে। আর আল্লাহ ও রসূলের সাথে লড়াই করার অর্থ হচ্ছে, ইসলামী সরকার দেশে যে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন করেছে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা। পৃথিবীতে একটি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই আল্লাহর ইচ্ছা এবং এ জন্য তিনি নিজের রসূল পাঠিয়েছিলেন। সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে পৃথিবীতে অবস্থানকারী মানুষ, পশু, বৃক্ষ ইত্যাদি সমস্ত সৃষ্টি শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে, মানবতা তার প্রকৃতির কাংখিত পূর্ণতায় পৌঁছতে সক্ষম হবে এবং পৃথিবীর সমুদয় উপায় উপকরণ এমনভাবে ব্যবহৃত হবে যার ফলে সেগুলো মানবতার ধ্বংস ও বিলুপ্তির নয় বরং তার উন্নতির সহায়ক হবে। এ ধরনের ব্যবস্থা কোন ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর তাকে নষ্ট করার প্রচেষ্টা চালানো, তা ক্ষুদ্র পরিসরে হত্যা, লুণ্ঠন, রাহাজানি, ডাকাতি ইত্যাদির পর্যায়ে চালানো হোক অথবা আরো বড় আকারে, এ সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যবস্থাকে উৎখাত করে তার জায়গায় কোন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেই চালানো হোক না কেন, তা আসলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবেই বিবেচিত হবে। এটা ঠিক তেমনি যেমন ভারতীয় দণ্ডবিধিতে কোন ব্যক্তির ভারতে বৃটিশ সরকারের ক্ষমতা উচ্ছেদের প্রচেষ্টাকে "সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" (Waging war against the king) করার অপরাধে অভিযুক্ত গণ্য করা হয়েছে—সে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোন একজন মামুলি সিপাইয়ের বিরুদ্ধে কিছু করলেও এবং সম্রাট তার নাগালের বহু দূরে অবস্থান করলেও তার অপরাধের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না।

৫৬. এ বিভিন্ন ধরনের শাস্তির কথা এখানে সংক্ষেপে বলে দেয়া হয়েছে, যাতে করে কাযী বা সমকালীন ইসলামী শাসক নিজের ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রত্যেক অপরাধীকে তার অপরাধের ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারেন। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা প্রকাশ করা যে, ইসলামী হুকুমাতের আওতায় বাস করে কোন ব্যক্তির ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা চালানো নিকৃষ্ট ধরনের অপরাধ এবং এ জন্য তাকে উল্লেখিত চরম শাস্তিগুলোর মধ্য থেকে কোন শাস্তি দেয়া যেতে পারে।

৫৭. অর্থাৎ যদি তারা বিপর্যয় সৃষ্টির প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়, সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন ও তাকে ছিন্নভিন্ন করার অপচেষ্টা পরিহার করে এবং তাদের পরবর্তী কর্মনীতি একথা প্রমাণ করে যে, তারা শান্তিপ্রিয়, আইনের অনুগত ও সদাচারী হয়ে গেছে আর তারপরই যদি তাদের আগের অপরাধের কথা জানা যায়, তাহলে ওপরে বর্ণিত শাস্তিগুলোর মধ্য থেকে কোন শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে না। তবে যদি তারা মানুষের

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿৩৫﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا
وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿৩৬﴾ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ
مِنْهَا ۡ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿৩৭﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا
جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿৩৮﴾

৬ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর দরবারে নৈকট্যলাভের উপায় অনুসন্ধান করো[৫৮] এবং তাঁর পথে প্রচেষ্টা ও সাধনা করো,[৫৯] সম্ভবত তোমরা সফলকাম হতে পারবে। ভালভাবে জেনে নাও, যারা কুফরীর নীতি অবলম্বন করেছে সারা দুনিয়ার ধন-দৌলত যদি তাদের অধিকারে থাকে এবং এর সাথে আরো সমপরিমাণও যুক্ত হয়। আর তারা যদি কিয়ামতের দিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য সেগুলো মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চায়, তাহলেও তাদের কাছ থেকে তা গৃহীত হবে না। তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবেই। তারা জাহান্নামের আগুন থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে। কিন্তু তা তারা পারবে না। তাদেরকে স্থায়ী শাস্তি দেয়া হবে।

চোর—পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, উভয়ের হাত কেটে দাও।[৬০] এটা তাদের কর্মফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আল্লাহর শক্তি সবার ওপর বিজয়ী এবং তিনি জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।

অধিকারের ওপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করে থাকে, তাহলে তার দায়িত্ব থেকে তাদেরকে মুক্ত করা যাবে না। যেমন তারা কোন ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল অথবা কারোর সম্পদ অন্যায়ভাবে হস্তগত করেছিল বা অন্য কোন অপরাধ করেছিল, এ অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে ঐ বিশেষ অপরাধ সংক্রান্ত ফৌজদারী মামলা চালানো হবে। কিন্তু বিদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা বা আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা সম্পর্কিত কোন মামলা তাদের বিরুদ্ধে চালানো হবে না।

৫৮. অর্থাৎ এমন প্রত্যেকটি উপায় অনুসন্ধান করতে থাকো যার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে পৌছতে পারো।

৫৯. মূলে (جَاهِدُوا) "জাহিদু" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে নিছক 'প্রচেষ্টা ও সাধনা' শব্দ দু'টির মাধ্যমে এর অর্থের সবটুকু প্রকাশ হয় না। আর (مُجَاهِدَه) 'মুজাহাদা' শব্দটির মধ্যে মুকাবিলার অর্থ পাওয়া যায়। এর সঠিক অর্থ হচ্ছে ঃ যেসব শক্তি আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে, যারা তোমাদের আল্লাহর মর্জি অনুসারে চলতে বাধা দেয় এবং তাঁর পথ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে, যারা তোমাদের পুরোপুরি আল্লাহর বান্দা হিসেবে জীবন যাপন করতে দেয় না এবং নিজের বা আল্লাহর ছাড়া আর কারোর বান্দা হবার জন্য তোমাদের বাধ্য করে, তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের সম্ভাব্য সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাও। এ প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ওপর তোমাদের সাফল্য এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ নির্ভর করছে।

এভাবে এ আয়াতটি মুমিন বান্দাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে চতুর্মুখী ও সর্বাত্মক লড়াই করার নির্দেশ দেয়। একদিকে আছে অভিশপ্ত ইবলীস এবং তার শয়তানী সেনাদল। অন্যদিকে আছে মানুষের নিজের নফ্স ও তার বিদ্রোহী প্রবৃত্তি। তৃতীয় দিকে আছে এমন এক আল্লাহ বিমুখ মানব গোষ্ঠী যাদের সাথে মানুষ সব ধরনের সামাজিক, তামাদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক সূত্রে বাঁধা। চতুর্থ দিকে আছে এমন ভ্রান্ত ধর্মীয় তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যার ভিত্তিভূমি গড়ে উঠেছে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ওপর এবং তা সত্যের আনুগত্য করার পরিবর্তে মিথ্যার আনুগত্য করতে মানুষকে বাধ্য করে। এদের সবার কৌশল বিভিন্ন কিন্তু সবার চেষ্টা একমুখী। এরা সবাই মানুষকে আল্লাহর পরিবর্তে নিজের অনুগত করতে চায়। বিপরীত পক্ষে, মানুষের পুরোপুরি আল্লাহর অনুগত হওয়া এবং ভিতর থেকে বাইর পর্যন্ত একমাত্র আল্লাহর নির্ভেজাল বান্দায় পরিণত হয়ে যাওয়ার ওপরই তার উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের মর্যাদায় উন্নীত হওয়া নির্ভর করে। কাজেই এ সমস্ত প্রতিবন্ধক ও সংঘর্ষশীল শক্তির বিরুদ্ধে একই সাথে সংগ্রামমুখর হয়ে, সবসময় ও সব অবস্থায় তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থেকে এবং এ সমস্ত প্রতিবন্ধককে বিধ্বস্ত ও পর্যুদস্ত করে আল্লাহর পথে অগ্রসর না হলে নিজের অভীষ্ট লক্ষেপৌছানো তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

৬০. দু'হাত নয় বরং এক হাত। আর সমগ্র উম্মত এ ব্যাপারেও একমত যে, প্রথমবার চুরি করলে ডান হাত কাটতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ لا قطع على خائن "খেয়ানতকারীর হাত কাটা হবে না," এ থেকে জানা যায়, খেয়ানত বা আত্মসাৎ ইত্যাদি চুরির পর্যায়ভুক্ত নয়। বরং চুরি বলতে এমন কাজ বুঝায় যার মাধ্যমে মানুষ একজনের ধন সম্পদ তার নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ থেকে বের করে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সাথে এরূপ নির্দেশও দিয়েছেন যে, একটি ঢালের মূল্যের চেয়ে কম পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একটি ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম, ইবনে উমরের বর্ণনা অনুযায়ী তার মূল্য ছিল তিন দিরহাম, আনাস ইবনে মালিকের বর্ণনা অনুয়ায়ী পাঁচ দিরহাম এবং হযরত আয়েশার বর্ণনা অনুযায়ী ছিল অর্ধ দিনার। সাহাবীদের এ মতবিরোধের কারণে চুরির সর্বনিম্ন নিসাব অর্থাৎ কমপক্ষে কি পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটা হবে এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٩﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٠﴾

তবে যে ব্যক্তি জুলুম করার পর তাওবা করবে এবং নিজের সংশোধন করে নেবে, আল্লাহর অনুগ্রহের দৃষ্টি আবার তার দিকে ফিরে আসবে।[৬১] আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তুমি কি জানো না, আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশ রাজ্যের মালিক? তিনি যাকে চান শাস্তি দেন এবং যাকে চান ক্ষমা করে দেন, তিনি সব জিনিসের ওপর ইখতিয়ার রাখেন।

দিয়েছে। ইমাম আবু হানীফার মতে এর সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদের মতে এক–চতুর্থাংশ দীনার। (সে যুগের দিরহামে থাকতো ৩ মাসা ১ $\frac{১}{৫}$ রতি পরিমাণ রূপা এবং এক–চতুর্থাংশ দীনার হতো ৩ দিরহামের সমান।)

আবার এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলো চুরি করলে হাত কাটার শাস্তি দেয়া যাবে না। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ لا قطع فى ثمرة ولاكثر (অর্থাৎ ফল ও সবজী চুরি করলে হাত কাটা যাবে না) لا قطع فى طعام (অর্থাৎ খাদ্যবস্তু চুরি করলে হাত কাটা যাবে না)। হযরত আয়েশা (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ

لم يكن قطع السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشئ التافه –

"তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তু চুরির অপরাধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে হাত কাটা হতো না।"

হযরত আলী ও হযরত উসমানের ফায়সালা ছিল لا قطع فى الطير (অর্থাৎ পাখি চুরি করলে হাত কাটা যাবে না) এবং সাহাবীগণের মধ্য থেকে কেউ এ ব্যাপারে মতবিরোধ প্রকাশ করেননি। তাছাড়া হযরত উমর ও আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুমা বাইতুলমাল থেকে কেউ কোন বস্তু চুরি করলে তার হাত কাটেননি। এ ব্যাপারেও কোথাও সাহাবায়ে কেরামের কোন মতবিরোধের উল্লেখ নেই। এসব মৌল উৎসের ভিত্তিতে ফিকাহর বিভিন্ন ইমাম কিছু নির্দিষ্ট বস্তু চুরি করার অপরাধে হাত কাটার দণ্ড না দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। ইমাম আবু হানীফার মতে শাক–সবজি, ফল, গোশত রান্না করা খাবার, যে শস্য এখনো স্তূপীকৃত করা হয়নি এবং খেলার সরঞ্জাম ও বাদ্যযন্ত্র চুরি করলে হাত কাটার শাস্তি দেয়া হবে না। এ ছাড়াও তিনি বনে বিচরণকারী পশু ও বাইতুল–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ
قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ ۛ سَمَّٰعُونَ
لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ
مَوَاضِعِهِۦ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟ ۚ
وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ
لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ ۖ وَلَهُمْ فِى
ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾

হে রসূল! কুফরীর পথে যারা দ্রুত পদচারণার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে তারা যেন তোমার মর্মপীড়ার কারণ না হয়,[৬২] যদিও তারা এমন সব লোকের অন্তরভুক্ত হয় যারা মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান আনেনি অথবা তারা এমন সব লোকের অন্তরভুক্ত হয় যারা ইহুদী হয়ে গেছে, যাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তারা মিথ্যা ভাষণ শোনার জন্য কান পেতে বসে থাকে[৬৩] এবং যারা কখনো তোমার কাছে আসেনি তাদের জন্য আড়ি পেতে থাকে,[৬৪] আল্লাহর কিতাবের শব্দাবলীর সঠিক স্থান নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও যারা সেগুলোকে তাদের আসল অর্থ থেকে বিকৃত করে[৬৫] এবং লোকদের বলে, যদি তোমাদের এ হুকুম দেয়া হয় তাহলে মেনে নাও অন্যথায় মেনো না।[৬৬] যাকে আল্লাহ নিজেই ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেন, তাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাবার জন্য তোমরা কিছুই করতে পারো না।[৬৭] এসব লোকের অন্তরকে আল্লাহ পবিত্র করতে চাননি।[৬৮] এদের জন্য দুনিয়াতে আছে লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে কঠিন শাস্তি।

মালের জিনিস চুরি করলে তাতে হাত কাটার শাস্তি নেই বলে ঘোষণা করেছেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য ইমামগণও কোন কোন জিনিস চুরির ক্ষেত্রে এ শাস্তি কার্যকর নয় বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, এ চুরিগুলোর অপরাধে আদতে কোন শাস্তিই দেয়া হবে না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, এ অপরাধগুলোর কারণে হাত কাটা হবে না।

৬১. এর অর্থ এ নয় যে, তার হাত কাটা হবে না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, হাত কাটার পর যে ব্যক্তি তাওবা করবে এবং নিজেকে চুরি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত রেখে আল্লাহর

সৎ বান্দায় পরিণত হয়ে যাবে সে আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা পাবে। এ অবস্থায় তার গায়ে যে গুনাহের কলংক লেগেছিল আল্লাহ তা ধুয়ে দেবেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি হাত কেটে যাবার পরও যদি নিজেকে অসৎ সংকল্প মুক্ত না করে এবং আগের দুষ্কৃতির মনোভাব লালন করতে থাকে, যার ভিত্তিতে সে চুরি করেছিল এবং তাকে হাত কাটার শাস্তি দেয়া হয়েছিল, তাহলে এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, হাত তার দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু তার অন্তরে চুরির মনোভাব এখনো অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। তাই হাত কাটার আগে সে যেমন আল্লাহর গযবের অধিকারী ছিল হাত কাটার পরেও ঠিক তেমনিই থেকে যাবে। তাই কুরআন মজীদ চোরকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার এবং নিজের সংশোধন করার নির্দেশ দেয়। কারণ হাত কাটা হয়েছে সামাজিক ও তামাদ্দুনিক ব্যবস্থাপনাকে বিশৃংখলামুক্ত করার জন্য। এ শাস্তির কারণে আত্মা ও মন পবিত্র ও কলুষতা মুক্ত হতে পারে না। আত্মা ও মন পবিত্র হতে পারে একমাত্র তাওবা ও আল্লাহর প্রতি সমর্পিত প্রাণ হবার মাধ্যমে। হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে ঃ তাঁর হুকুম মোতাবিক এক চোরের হাত কাটার পর তিনি তাকে নিজের কাছে ডেকে আনেন। তাকে বলেন, বলো– قل استغفر الله واتوب اليه (আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাঁর কাছে তাওবা করছি।) সে তাঁর নির্দেশ অনুসারে ঐ বাক্যটি বলার পর তিনি তার জন্য দোয়া করেন ঃ اللهم تب عليه (হে আল্লাহ! তাকে মাফ করো)।

৬২. অর্থাৎ যারা জাহেলিয়াতের অবস্থা অপরিবর্তিত রাখার এবং ইসলামের এ সংস্কারমূলক দাওয়াত যাতে ঐ সমস্ত বিকৃতি ও গলদ দূর করতে সক্ষম না হয় সে জন্য নিজেদের সকল প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মতৎপরতা নিয়োজিত করে। তারা সমস্ত নৈতিক বাঁধনমুক্ত হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে সব রকমের নিকৃষ্টতম চক্রান্ত চালাচ্ছিল। তারা জেনে বুঝে সত্যকে বেমালুম হজম করে যাচ্ছিল। অত্যন্ত নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা ও দুঃসাহসের সাথে ধোঁকা, প্রতারণা, জালিয়াতি ও মিথ্যার অস্ত্র ব্যবহার করে এমন এক পবিত্র ও নিষ্কলুষ ব্যক্তির কার্যক্রমকে পরাস্ত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল যিনি একান্ত নিস্বার্থভাবে পরোপকার ও নিছক কল্যাণাকাংখার ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের এবং তাদের নিজেদের মংগলের জন্য দিনরাত মেহনত করে যাচ্ছিলেন। তাদের এ তৎপরতা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে অত্যন্ত মর্মজ্বালা অনুভব করতেন। তাঁর এ মর্মজ্বালা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। যখন কোন পবিত্র ও নিষ্কলুষ ব্যক্তি নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী লোকদের মুখোমুখি হন এবং তারা নিছক নিজেদের মূর্খতা, সংকীর্ণমনতা ও স্বার্থান্ধতার কারণে তাঁর কল্যাণকর ও শুভাকাংখামূলক প্রচেষ্টাবলীর পথ রোধ করার জন্য নিকৃষ্ট ধরনের চালবাজী ও কূটকৌশল অবলম্বন করতে থাকে তখন স্বাভাবিকভাবেই তিনি মনে ব্যাথা পান। কাজেই এখানে আল্লাহর বক্তব্যের উদ্দেশ্য এ নয় যে, তাদের ঐসব কর্মতৎপরতার কারণে রসূলের মনে স্বাভাবিকভাবে যে ব্যাথা ও মর্মবেদনার সৃষ্টি হয় তা না হওয়া উচিত বরং আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, তাঁর মন খারাপ করার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি যেন মনোবল না হারিয়ে ফেলেন এবং সবরের সাথে আল্লাহর বান্দাদের সংস্কার ও সংশোধনের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। আর এসব লোকের ব্যাপারে বলা যায় যে, এরা যে ধরনের নিকৃষ্ট নৈতিক গুণাবলী নিজেদের মধ্যে লালন করেছে তাতে তাদের পক্ষ থেকে এ ধরনের ব্যবহারই আশা করা যেতে পারে এবং এ ব্যাপারে তাদের কোন ব্যবহারই অপ্রত্যাশিত নয়।

৬৩. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এরা যেহেতু প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়ে গেছে তাই সত্যের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই। এরা মিথ্যাই পছন্দ করে এবং মনোযোগ সহকারে মিথ্যাই শুনে থাকে। কাজেই এতেই এদের মনের তৃষ্ণা মেটে। আর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, এরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের মজলিসে এসে বসে মিথ্যাচারের প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য। এখানে এসে এরা যা কিছু দেখে ও শোনে সেগুলোকে বিপরীত অর্থে প্রয়োগ করে অথবা নিজেদের পক্ষ থেকে মিথ্যার মিশ্রণ দিয়ে সেগুলোর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের দুর্নাম রটাবার জন্য লোকদের মধ্যে ছড়াতে থাকে।

৬৪. এরও দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, এরা গোয়েন্দা হয়ে আসে। এরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের মজলিসে ঘোরাফেরা করে। কোন গোপন কথা কানে পড়লে তা নিয়ে মুসলমানদের শত্রুদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এরা মিথ্যা দোষারোপ ও নিন্দা করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করে বেড়ায় এবং যেসব লোক সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি তাদের মধ্যে ভুল ধারণা এবং নবী ও ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার কাজে লিপ্ত হয়।

৬৫. অর্থাৎ তাওরাতের যেসব বিধান তাদের মনমাফিক নয়, সেগুলোর মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে রদবদল করে এবং শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে সেখান থেকে নিজেদের ইচ্ছামাফিক বিধান তৈরী করে।

৬৬. অর্থাৎ মূর্খ জনগণকে বলে, আমরা যে বিধান শুনাচ্ছি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও যদি এই একই বিধান তোমাদের শোনায় তাহলেই তা গ্রহণ করো, অন্যথায় প্রত্যাখ্যান করো।

৬৭. আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করার অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহ কোন খারাপ প্রবণতা লালিত হতে দেখেন তার সামনে একের পর এক এমন সব সুযোগ সৃষ্টি করে দেন যার ফলে সে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। সে ব্যক্তি যদি এখনো অসৎকর্মের প্রতি পুরোপুরি ঝুঁকে না পড়ে থাকে তাহলে এ পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমে সে নিজেকে সামলে নেয়। তার মধ্যে অসৎপ্রবৃত্তির মোকাবিলা করার জন্য সৎ–প্রবৃত্তির যে শক্তিগুলো থাকে সেগুলো তীব্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু যদি সে অসৎ–কর্মের প্রতি পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ে থাকে এবং তার সৎপ্রবণতা তার অসৎপ্রবণতার কাছে পরাজিত হয়ে থাকে তাহলে এ ধরনের প্রত্যেকটি পরীক্ষার সময় সে আরো বেশী অসৎপ্রবণতা ও অসৎকর্মের ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে থাকবে। এটিই হচ্ছে আল্লাহর সেই ফিত্‌না বা পরীক্ষা যার হাত থেকে কোন বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন মানুষকে বাঁচানোর ক্ষমতা তার কোন কল্যাণাকাংখীর নেই। আর এ ফিতনার মধ্যে কেবল ব্যক্তিরাই নয় জাতিরাও নিক্ষিপ্ত হয়।

৬৮. কারণ তারা নিজেরাই পবিত্র হতে চায়নি। যে নিজে পবিত্র হতে চায় এবং এ জন্য প্রচেষ্টা ও সাধনা করে তাকে পবিত্রতা থেকে বঞ্চিত করা আল্লাহর নীতি নয়। যে নিজে পবিত্র হতে চায় না আল্লাহ তাকে পবিত্র করতে চান না।

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٤٢﴾ وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٣﴾

এরা মিথ্যা শ্রবণকারী ও হারাম আহারকারী।[৬৯] কাজেই এরা যদি তোমাদের কাছে (নিজেদের মামলা নিয়ে) আসে তাহলে তোমরা চাইলে তাদের মীমাংসা করে দিতে অথবা অস্বীকার করে দিতে পারো। অস্বীকার করে দিলে এরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর মীমাংসা করে দিলে যথার্থ ইনসাফ সহকারে মীমাংসা করো। কারণ আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।[৭০] আর এরা তোমাকে কিভাবে বিচারক মানছে যখন এদের কাছে তাওরাত রয়ে গেছে, যাতে আল্লাহর হুকুম লিখিত আছে আর তারপরও এরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে?[৭১] আসলে এরা ঈমানই রাখে না।

৬৯. এখানে বিশেষ করে তাদের সে সব মুফতী ও বিচারপতিদের দিকে ইংগিত করা হয়েছে, যারা মিথ্যা সাক্ষ্য নিয়ে ও মিথ্যা বিবরণ শুনে এমন সব লোকদের পক্ষে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি বিরোধী ফায়সালা করতো যাদের কাছ থেকে তারা ঘুষ নিতো অথবা যাদের সাথে তাদের অবৈধ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকতো।

৭০. ইহুদীরা তখনো পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়মিত প্রজা হিসেবে গণ্য হয়নি। বরং সন্ধি ও চুক্তির ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে তাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এ চুক্তিগুলোর প্রেক্ষিতে ইহুদীরা তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহে স্বাধীনতা ভোগ করতো এবং তাদের মামলার ফায়সালা তাদের আইন অনুযায়ীই তাদের নিজেদের বিচারপতিরাই করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা তাঁর নিযুক্ত বিচারপতিদের কাছে নিজেদের মামলা-মোকদ্দমা আনার ব্যাপারে আইনের দিক দিয়ে তারা বাধ্য ছিল না। কিন্তু যেসব ব্যাপারে তারা নিজেদের ধর্মীয় আইন অনুযায়ী ফায়সালা করতে চাইতো না সেসব ব্যাপারে ফায়সালা করার জন্য তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসতো। তারা আশা করতো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়াতে হয়তো তাদের জন্য অন্য কোন বিধান আছে এবং এভাবে নিজেদের ধর্মীয় আইনের আনুগত্য করা থেকে তারা নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে।

এখানে বিশেষ করে যে মামলাটির দিকে ইশারা করা হয়েছে সেটি ছিল খয়বরের সম্রান্ত ইহুদী পরিবার সংক্রান্ত। এ পরিবারগুলোর এক মহিলার সাথে এক পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক পাওয়া গিয়েছিল। তাওরাতের বিধান অনুসারে তাদের শাস্তি ছিল 'রজম' অর্থাৎ উভয়কে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা। (দ্বিতীয় বিবরণী পুস্তক ২২ঃ২৩-২৪) কিন্তু ইহুদীরা এ শাস্তি প্রয়োগ করতে চাচ্ছিল না। তাই তারা পারস্পরিক পরামর্শক্রমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শালিস মানার সিদ্ধান্ত করলো এবং একথাও স্থির করলো যে, যদি তিনি রজম ছাড়া অন্য কোন হুকুম দেন তাহলে তা মেনে নেয়া হবে আর যদি রজমেরই হুকুম দেন তাহলে তা মানা হবে না। কাজেই রসূলের সামনে মামলা পেশ করা হলো। তিনি রজমের হুকুম দিলেন। তারা এ হুকুম মানতে অস্বীকার করলো। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের ধর্মে এর শাস্তির ব্যাপারে কি বিধান আছে? তারা জবাব দিল ঃ বেত্রাঘাত করা এবং মুখে কালি মাখিয়ে গাধার পিঠে চড়িয়ে প্রদক্ষিণ করানো। তিনি তাদের আলেমদেরকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীর ব্যাপারে তাওরাতে কি এ বিধানই আছে? তারা আবার সেই মিথ্যা জবাব দিলেন। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে একজন নীরব থাকলেন। তার নাম ছিল ইবনে সূরিয়া। ইহুদীদের বর্ণনা অনুযায়ী সে সময় তাওরাতের তার চেয়ে বড় আলেম আর দ্বিতীয় কেউ ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ আমি তোমাকে সেই আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যিনি তোমাদের বাঁচিয়েছিলেন ফেরাউনের কবল থেকে এবং তুর পাহাড়ে তোমাদের শরীয়াত দান করেছিলেন, সত্যিই কি তাওরাতে ব্যভিচারের জন্য এ শাস্তির বিধান আছে? ইবনে সূরিয়া জবাব দিলেন ঃ "আপনি আমাকে এ ধরনের কঠিন কসম না দিলে আমি বলতাম না। প্রকৃতপক্ষে রজমই ব্যভিচারের শাস্তি। কিন্তু আমাদের এখানে যখন ব্যভিচার বেড়ে যেতে লাগলো তখন আমাদের শাসকরা এ রীতি অবলম্বন করলো যে, কোন বড় লোক ব্যভিচার করলে তাকে ছেড়ে দিতো এবং গরীবরা এ দুষ্কর্ম করলে তাদেরকে রজম করতো। তারপর এতে যখন জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো তখন আমরা তাওরাতের আইনের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীকে বেত্রাঘাত করার এবং তাদের মুখে কালি দিয়ে উল্টো মুখে গাধার পিঠে চড়াবার শাস্তির বিধান দিলাম।" এরপর ইহুদীদের আর কিছু বলার অবকাশ রইলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলা হলো।

৭১. এ আয়াতে আল্লাহ ইহুদীদের দুর্নীতির মুখোস পুরোপুরি উন্মোচন করে দিয়েছেন। এ "ধর্মীয় লোকেরা" সারা আরবে এরূপ প্রচারণার জাল বিস্তার করে রেখেছিল যে, ঐ সমাজে দীনদারী ও "কিতাবী-জ্ঞানের" ব্যাপারে তাদের কোন জুড়ি নেই। এদের অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌছেছিল যে, যে কিতাবকে তারা নিজেরা আল্লাহর কিতাব বলে মানতো এবং তারা যার প্রতি ঈমান রাখে বলে দাবী করতো, তার বিধান পরিহার করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিজেদের মামলা নিয়ে এসেছিল। অথচ তাঁকে নবী বলে মেনে নিতেও তারা কঠোরভাবে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। এ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এ ইহুদীরা আসলে কোন জিনিসের ওপরই যথার্থ ঈমান রাখতো না। আসলে তাদের ঈমান ছিল নিজেদের নফ্‌স ও প্রবৃত্তির ওপর। আল্লাহর কিতাব বলে তারা

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

৭ রুকূ'

আমি তাওরাত নাযিল করেছি। তাতে ছিল পথ নির্দেশ ও আলো। সমস্ত নবী, যারা মুসলিম ছিল, সে অনুযায়ী এ ইহুদী হয়ে যাওয়া লোকদের[৭২] যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালা করতো। আর এভাবে রব্বানী ও আহবারও[৭৩] (এরি ওপর তাদের ফায়সালার ভিত্তি স্থাপন করতো)। কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাব সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এবং তারা ছিল এর ওপর সাক্ষী। কাজেই (হে ইহুদী গোষ্ঠী!) তোমরা মানুষকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো এবং সামান্য তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে আমার আয়াত বিক্রি করা পরিহার করো। আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারাই কাফের।

তাওরাতে আমি ইহুদীদের জন্য এ বিধান লিখে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং সব রকমের যখমের জন্য সমপর্যায়ের বদলা।[৭৪] তারপর যে ব্যক্তি ঐ শাস্তি সাদকা করে দেবে তা তার জন্য কাফ্ফারায় পরিণত হবে।[৭৫] আর যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই জালেম।

যাকে মানে তার নির্দেশ তাদের নফ্স ও প্রবৃত্তির কাছে অপছন্দনীয় বলেই তারা তাকে মানতে অস্বীকার করে। আর (নাউযুবিল্লাহ) যাকে তারা মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার বলে

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۖ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٧﴾

তারপর ঐ নবীদের পরে মারয়ামপুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি। তাওরাতের মধ্য থেকে যা কিছু তার সামনে ছিল সে তার সত্যতা প্রমাণকারী ছিল। আর তাকে ইনজীল দিয়েছি। তাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো এবং তাও তাওরাতের মধ্য থেকে যা কিছু সে সময় বর্তমান ছিল তার সত্যতা প্রমাণকারী ছিল[৭৬] আর তা ছিল আল্লাহভীরুদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ। আমার নির্দেশ ছিল, ইনজীলে আল্লাহ যে আইন নাযিল করেছেন ইনজীল অনুসারীরা যেন সে মোতাবিক ফায়সালা করে। আর যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই ফাসেক।[৭৭]

প্রচার করে বেড়ায় সেখান থেকে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী কোন ফায়সালা লাভ করা যায় কিনা কেবলমাত্র এ আশায় তার কাছে ধর্ণা দেয়।

৭২. এখানে প্রসংগক্রমে এ সত্যটিও প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে যে, সকল নবীই ছিলেন মুসলিম। অন্যদিকে এ ইহুদীরা ইসলাম থেকে সরে এসে সাম্প্রদায়িক দলাদলিতে লিপ্ত হয়ে কেবলমাত্র "ইহুদী" হিসেবেই থেকে গিয়েছিল।

৭৩. রব্বানী মানে আলেম এবং আহবার মানে ফকীহ।

৭৪. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য তাওরাতের যাত্রাপুস্তক ২১ঃ২৩–২৫ দেখুন।

৭৫. অর্থাৎ যে ব্যক্তি সাদকার নিয়েতে কিসাস মাফ করে দেবে তার জন্য এ নেকীটি তার অনেক গোনাহর কাফ্ফারায় পরিণত হবে। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীটি এ অর্থেই উক্ত হয়েছে ঃ

من جرح فى جسده جراحة فتصدق بها كفر عنه ذنوبه بمثل ما تصدق به –

"যার শরীরে কোন আঘাত করা হয়েছে এবং সে তা মাফ করে দিয়েছে, এ ক্ষেত্রে যে পর্যায়ের ক্ষমা হবে ঠিক একই পর্যায়ের গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"

৭৬. অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম কোন নতুন ধর্ম নিয়ে আসেননি। বরং ইতিপূর্বেকার বিভিন্ন পয়গম্বরের দীনই ছিল তাঁর দীন এবং মানুষকে তিনি এ দীনেরই দাওয়াত দিতেন। তাওরাতের আসল শিক্ষাবলীর যে অংশ তাঁর যুগে সংরক্ষিত ছিল তাকে তিনি নিজেও মানতেন এবং ইনজীলও তার সত্যতা প্রমাণ করতো (মথি ৫ঃ১৭–১৮ দেখুন)। কুরআন বারবার একথাটি ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় যত নবী এসেছেন তাদের একজনও পূর্ববর্তী নবীদের প্রতিবাদ করার এবং তাদের কার্যাবলীকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে নিজের নতুন ধর্ম প্রবর্তন করার জন্য আসেননি। বরং প্রত্যেক নবী তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের সত্যতার সাক্ষ্য দিতেন এবং পূর্ববর্তী নবীগণ নিজেদের পবিত্র উত্তরাধিকার হিসেবে যেসব কাজ রেখে যেতেন সেগুলোর পরিবৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনের জন্য আসতেন। অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোর প্রতিবাদ করার জন্য আল্লাহ কখনো নিজের কোন কিতাব পাঠাননি। বরং তাঁর প্রত্যেকটি কিতাব ইতিপূর্বে প্রেরিত সমস্ত কিতাবের সমর্থক ও তার সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে উপস্থিত হয়েছে।

৭৭. যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তাদের সম্পর্কে আল্লাহ এখানে তিনটি বিধান দিয়েছেন। এক, তারা কাফের। দুই, তারা জালেম। তিন, তারা ফাসেক। এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম ও তার নাযিল করা আইন ত্যাগ করে নিজের বা অন্য মানুষের মনগড়া আইনের ভিত্তিতে ফায়সালা করে সে আসলে বড় ধরনের অপরাধ করে। প্রথমত তার এ কাজটি আল্লাহর হুকুম অস্বীকার করার শামিল। কাজেই এটি কুফরী। দ্বিতীয়ত তার এ কাজটি ইনসাফ ও ভারসাম্যনীতির বিরোধী। কারণ, আল্লাহ যথার্থ ইনসাফ ও ভারসাম্যনীতি অনুযায়ীই হুকুম দিয়েছিলেন। কাজেই আল্লাহর হুকুম থেকে সরে এসে যখন সে ফায়সালা করলো তখন সে আসলে জুলুম করলো। তৃতীয়ত বান্দা হওয়া সত্ত্বেও যখনই সে নিজের প্রভুর আইন অমান্য করে নিজের বা অন্যের মনগড়া আইন প্রবর্তন করলো তখনই সে আসলে বন্দেগী ও আনুগত্যের গণ্ডীর বাইরে পা রাখলো। আর এটি অবাধ্যতা বা ফাসেকী। এ কুফরী, জুলুম ও ফাসেকী তার নিজের ধরন ও প্রকৃতির দিক দিয়ে অনিবার্যভাবেই পুরোপুরি আল্লাহর হুকুম অমান্যেরই বাস্তব রূপ। যেখানে আল্লাহর হুকুম অমান্য করা হবে সেখানে এ তিনটি বিষয় থাকবে না, এটা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তবে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার যেমন পর্যায়ভেদ আছে তেমনি এ তিনটি বিষয়েরও পর্যায়ভেদ আছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমকে ভুল এবং নিজের বা অন্য কোন মানুষের হুকুমকে সঠিক মনে করে আল্লাহর হুকুম বিরোধী ফায়সালা করে সে পুরোপুরি কাফের, জালেম ও ফাসেক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমকে সত্য বলে বিশ্বাস করে কিন্তু কার্যত তার বিরুদ্ধে ফায়সালা করে সে ইসলামী মিল্লাত বহির্ভূত না হলেও নিজের ঈমানকে কুফরী, জুলুম ও ফাসেকীর সাথে মিশিয়ে ফেলছে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে সে সকল ব্যাপারেই কাফের, ফাসেক ও জালেম। আর যে ব্যক্তি কিছু ব্যাপারে অনুগত এবং কিছু ব্যাপারে অবাধ্য তার জীবনে ঈমান ও ইসলাম এবং কুফরী, জুলুম ও ফাসেকীর মিশ্রণ ঠিক তেমনি হারে অবস্থান করছে যেহারে সে আনুগত্য ও অবাধ্যতাকে এক সাথে মিশিয়ে রেখেছে। কোন কোন তাফসীরকার এ আয়াতগুলোকে আহ্‌লি কিতাবদের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত বলে গণ্য করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আল্লাহর কালামের শব্দের মধ্যে

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ؕ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَاۤ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٨﴾

তারপর হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি, যা সত্য নিয়ে এসেছে এবং আল কিতাবের মধ্য থেকে তার সামনে যা কিছু বর্তমান আছে তার সত্যতা প্রমাণকারী[৭৮] ও তার সংরক্ষক।[৭৯] কাজেই তুমি আল্লাহর নাযিল করা আইনি অনুযায়ী লোকদের বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালা করো এবং যে সত্য তোমার কাছে এসেছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের খেয়াল–খুশীর অনুসরণ করো না। —তোমাদের[৮০] প্রত্যেকের জন্য একটি শরীয়াত ও একটি কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে রেখেছি। আল্লাহ চাইলে তোমাদের সবাইকে একই উম্মতের অন্তরভুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তার মধ্যে তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য এমনটি করেছেন। কাজেই সৎকাজে একে অপরের চাইতে অগ্রবর্তী হবার চেষ্টা করো। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে। তারপর তিনি সেই প্রকৃত সত্যটি তোমাদের জানিয়ে দেবেন যে ব্যাপারে তোমরা মতবিরোধ করে আসছিলে।[৮১]

এ ধরনের ব্যাখ্যা করার কোন অবকাশ নেই। হযরত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্যই এ ধরনের ব্যাখ্যার সঠিক ও সর্বোত্তম জবাব। তাঁকে একজন বলেছিল, এ আয়াত তিনটি তো বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। সে বুঝাতে চাচ্ছিল যে, ইহুদীদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিল করা হুকুমের বিরুদ্ধে ফায়সালা করে সে–ই কাফের, জালেম ও ফাসেক। একথা শুনে হযরত হুযাইফা বলে ওঠেন ঃ

نعم الاخوة لكم بنو اسرائيل ان كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة كلا والله لتسلكن طريقهم قدر الشراك –

"এ বনী ইসরাঈল গোষ্ঠী তোমাদের কেমন চমৎকার ভাই, তিতোগুলো সব তাদের জন্য আর মিঠাগুলো সব তোমাদের জন্য! কখ্খনো নয়, আল্লাহর কসম তাদেরই পথে তোমরা কদম মিলিয়ে চলবে।"

৭৮. এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ বক্তব্যটিকে যদিও এভাবে বলা যেতো যে, "আগের কিতাবগুলোর মধ্য থেকে যা কিছু তার প্রকৃত ও সঠিক অবস্থায় বর্তমান আছে কুরআন তার সত্যতা প্রমাণ করে।" কিন্তু আল্লাহ এখানে "আগের কিতাবগুলোর" পরিবর্তে "আল কিতাব" শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ থেকে এ রহস্য উদঘাটিত হয় যে, কুরআন এবং বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন ভাষায় আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কিতাবগুলো নাযিল হয়েছে সবই মূলত একটি কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। তাদের রচয়িতাও একজন। তাদের মূল বক্তব্য, উদ্দেশ্য-লক্ষ্যও একই। তাদের শিক্ষাও একই। তাদের মাধ্যমে মানব জাতিকে একই জ্ঞান দান করা হয়েছে। এ কিতাবগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকলে তা আছে কেবল মাত্র ইবারাত অর্থাৎ বাক্য সংগঠন ও বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। কাজেই প্রকৃত সত্য কেবল এতটুকুই নয় যে, এ কিতাবগুলো পরস্পরের বিরোধী নয় বরং সমর্থক এবং পরস্পরের প্রতিবাদকারী নয় বরং সত্যতা প্রমাণকারী। বরং প্রকৃত সত্য এর চাইতেও অনেক বেশী। অর্থাৎ এরা সবাই একই "আল কিতাবের" বিভিন্ন সংস্করণ মাত্র।

৭৯. মূলে "মুহাইমিন" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আরবীতে হাইমানা, ইউহাইমিনু, হাইমানাতান (هيمن - يهيمن - هيمنة) মানে হচ্ছে দেখাশুনা, সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সাক্ষ দান, আমানতদারী, সহায়তা দান ও সমর্থন করা। যেমন বলা হয় هيمن الرجل الشيئ অর্থাৎ লোকটি অমুক জিনিসটি হেফাজত ও সংরক্ষণ করেছে। আরো বলা হয় ঃ هيمن الطائر على فراخه অর্থাৎ পাখিটি নিজের বাচ্চাকে নিজের ডানার মধ্যে নিয়ে সংরক্ষিত করে ফেলেছে। হযরত উমর (রা) একবার লোকদের বলেন ঃ انى داع فهيمنوا অর্থাৎ আমি দোয়া করি, তোমরা সমর্থনে আ-মীন বলো। অর্থাৎ কুরআনকে আল-কিতাব বলার পর "মুহাইমিন" বলার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোতে যেসব সত্য শিক্ষা ছিল কুরআন তার সবগুলোই নিজের মধ্যে সংরক্ষিত করে নিয়েছে। সে সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণকারী এই হিসেবে যে, এখন তাদের এ সত্য শিক্ষাগুলোর কোন অংশের নষ্ট হবার আর কোন সম্ভাবনাই নেই। সে সেগুলোর সমর্থক এ অর্থে যে, ঐ কিতাবগুলোতে আল্লাহর কালাম যে অবস্থায় আছে কুরআন তার সত্যতা প্রমাণ করে। সে সেগুলোর ওপর সাক্ষদানকারী এ অর্থে যে, ঐ কিতাবগুলোতে আল্লাহর কালাম ও মানুষের বাণীর মধ্যে যে মিশ্রণ ঘটে গেছে কুরআনের সাক্ষের মাধ্যমে তাকে আবার ছেঁটে আলাদা করা যেতে পারে। সেগুলোর মধ্যে যেগুলো কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং তার অনুরূপ সেগুলো আল্লাহর কালাম আর যেগুলো কুরআন বিরোধী সেগুলো মানুষের বাণী।

৮০. এটি একটি প্রসংগ কথা। একটি প্রশ্নের বিশ্লেষণই এর উদ্দেশ্য। ওপরের ধারাবাহিক ভাষণ শোনার পর শ্রোতার মনে এ প্রশ্নটি সংশয় ও জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। প্রশ্নটি হচ্ছে, সকল নবী ও সকল কিতাব যখন একই ধর্মের দিকে আহবান জানিয়েছে এবং তারা সবাই পরস্পরের সত্যতা প্রমাণ করে ও পরস্পরের সহযোগী তখন

শরীয়াতের বিস্তারিত বিধানের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য কেন? ইবাদাত–বন্দেগীর বাহ্যিক অবয়ব ও আনুষ্ঠানিকতা, হালাল–হারামের বিধি–নিষেধ এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আইন–কানুনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিভিন্ন নবী ও আসমানী কিতাবসমূহের শরীয়াতগুলোর মধ্যে কমবেশী পার্থক্য দেখা যায় কেন?

৮১. এটি হচ্ছে উপরোল্লিখিত প্রশ্নটির একটি পরিপূর্ণ জবাব। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ নিছক শরীয়াতের বিভিন্নতা দেখে এ শরীয়াতগুলো বিভিন্ন মূল ও বিভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে বলে মনে করা ভুল হবে। আসলে মহান আল্লাহ বিভিন্ন জাতির জন্য বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন অবস্থায় বিধি বিধান নির্ধারণ করে থাকেন।

দুই ঃ নিসন্দেহে প্রথম থেকেই সমগ্র মানব জাতির জন্য একটি বিধান নির্ধারিত করে সবাইকে এক উম্মতে পরিণত করা যেতো। কিন্তু বিভিন্ন নবীর শরীয়াতের মধ্যে আল্লাহ যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন তার পেছনে বিভিন্ন কারণের মধ্যে একটি বড় কারণ এই ছিল যে, এভাবে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করতে চাচ্ছিলেন। যারা প্রকৃত দীন, তার প্রাণসত্তা ও তাৎপর্য অনুধাবন করে, দীনের মধ্যে এ বিধানগুলোর যথার্থ মর্যাদা জানে এবং কোন প্রকার বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয় না তারা সত্যকে চিনে ফেলবে এবং গ্রহণ করে নেবে, যেভাবেই তা আসুক না কেন। তারা আল্লাহ প্রেরিত আগের বিধানের জায়গায় পরবর্তী বিধান মেনে নেবার ব্যাপারে কোন প্রকার ইতস্তত করবে না। পক্ষান্তরে যারা দীনের মূল প্রাণশক্তি থেকে দূরে অবস্থান করে, দীনের বিধান ও খুটিনাটি নিয়ম–কানুনকেই আসল দীন মনে করে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত জিনিসের গায়ে নিজেরাই তকমা এঁটে দিয়ে সে ব্যাপারে স্থবিরতা ও বিদ্বেষে নিমজ্জিত হয়, তারা পরবর্তীকালে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রত্যেকটি আয়াত প্রত্যাখ্যান করতে থাকে। এ দুই ধরনের লোককে পৃথক করার জন্য এ ধরনের পরীক্ষা অপরিহার্য ছিল। তাই মহান আল্লাহ বিভিন্ন শরীয়াতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

তিন ঃ সমস্ত শরীয়াতের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে নেকী ও কল্যাণ অর্জন করা। যে সময় আল্লাহ যে হুকুম দেন তা পালন করার মাধ্যমেই এগুলো অর্জিত হতে পারে। কাজেই যারা আসল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখে তাদের জন্য শরীয়াতের বিভিন্নতা ও পথের পার্থক্য নিয়ে বিরোধ করার পরিবর্তে আল্লাহর কাছে গৃহীত পথের মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই হচ্ছে সঠিক কর্মপদ্ধতি।

চার ঃ মানুষেরা নিজেদের স্থবিরতা, বিদ্বেষ, হঠকারিতা ও মানসিক অস্থিরতার কারণে নিজেরাই যে সমস্ত বিরোধ সৃষ্টি করেছে, কোন বিতর্কসভায় বা যুদ্ধের ময়দানে সেগুলোর চূড়ান্ত ফায়সালা হবে না। সেগুলোর চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন আল্লাহ নিজেই, যেদিন প্রকৃত সত্যকে সকল প্রকার আবরণমুক্ত করে দেয়া হবে। সেদিন লোকেরা দেখবে, যেসব বিরোধের মধ্যে তারা নিজেদের সমগ্র জীবনকাল অতিবাহিত করে দুনিয়া থেকে চলে এসেছে তার মধ্যে "সত্য" কতটুকু ছিল এবং "মিথ্যার" মিশ্রণ কতটুকু।

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿٤٩﴾ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٥٠﴾

—কাজেই[৮২] হে মুহাম্মাদ! তুমি আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী তাদের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালা করো এবং তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করো না। সাবধান হয়ে যাও, এরা যেন তোমাকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করে সেই হেদায়াত থেকে সামান্যতমও বিচ্যুত করতে না পারে, যা আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন। যদি এরা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রাখো, আল্লাহ এদের কোন কোন গোনাহর কারণে এদেরকে বিপদে ফেলার সিদ্ধান্তই করে ফেলেছেন। আর যথার্থই এদের অধিকাংশ ফাসেক। (যদি এরা আল্লাহর আইন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়) তাহলে কি এরা আবার সেই জাহেলিয়াতের[৮৩] ফায়সালা চায়? অথচ যারা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহর চাইতে ভাল ফায়সালাকারী আর কেউ নেই।

৮২. ওপরে যে ধারাবাহিক ভাষণ চলছিল এখান থেকে আবার তা শুরু হচ্ছে।

৮৩. জাহেলিয়াত শব্দটি ইসলামের বিপরীত শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইসলাম হচ্ছে পুরোপুরি জ্ঞানের পথ। কারণ ইসলামের পথ দেখিয়েছেন আল্লাহ নিজেই। আর আল্লাহ সমস্ত বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। অপরদিকে ইসলাম থেকে ভিন্নধর্মী যে কোন পথই জাহেলিয়াতের পথ। আরবের ইসলাম পূর্ব যুগকে জাহেলিয়াতের যুগ বলার কারণ হচ্ছে এই যে, সে যুগে জ্ঞান ছাড়াই নিছক ধারণা, কল্পনা, আন্দাজ, অনুমান বা মানসিক কামনা বাসনার ভিত্তিতে মানুষেরা নিজেদের জন্য জীবনের পথ তৈরী করে নিয়েছিল। যেখানেই যে যুগেই মানুষেরা এ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করবে তাকে অবশ্যি জাহেলিয়াতের কর্মপদ্ধতি বলা হবে। মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যা কিছু পড়ানো হয় তা নিছক আংশিক জ্ঞান। মানুষকে পথ দেখাবার জন্য এ জ্ঞান কোনক্রমেই যথেষ্ট নয়। কাজেই আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানকে বাদ দিয়ে এ আংশিক জ্ঞানের মাধ্যমে আন্দাজ, অনুমান, কল্পনা ও লালসা–কামনার মিশ্রণে যে জীবন বিধান তৈরী করা হয়েছে তাও ঠিক প্রাচীন জাহেলী পদ্ধতির মতো জাহেলিয়াতের সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ
يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ
أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿٥٢﴾
وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ
إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿٥٣﴾

৮ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তাদেরকে বন্ধু হিসেবে পরিগণিত করে তাহলে সেও তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। অব্যশ্যি আল্লাহ জালেমদেরকে নিজের পথনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত রাখেন।

তুমি দেখতে পাচ্ছো, যাদের অন্তরে মোনাফেকীর রোগ আছে তারা তাদের মধ্যেই তৎপর থাকে। তারা বলে, "আমাদের ভয় হয়, আমরা কোন বিপদের কবলে না পড়ে যাই।"[৮৪] *কিন্তু অচিরেই আল্লাহ যখন তোমাদের চূড়ান্ত বিজয় দান করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে অন্য কোন কথা প্রকাশ করবেন*[৮৫] *তখন তারা নিজেদের অন্তরে লুকিয়ে রাখা এ মোনাফেকীর জন্য লজ্জিত হবে। আর সে সময় ঈমানদাররা বলবে, "এরা কি সে সব লোক যারা আল্লাহর নামে শক্ত কসম খেয়ে আমরা তোমাদের সাথে আছি বলে আশ্বাস দিতো?"—এদের সমস্ত কর্মকাণ্ড নষ্ট হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত এরা ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে।*[৮৬]

৮৪. তখনো পর্যন্ত আরবে কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্বের কোন মীমাংসা হয়নি। যদিও নিজের অনুসারীদের কর্মতৎপরতা, সাধনা ও আত্মত্যাগের কারণে ইসলাম একটি শক্তিতে পরিণত হয়েছিল তবুও বিরুদ্ধ শক্তিগুলোও ছিল প্রবল পরাক্রান্ত। ইসলামের বিজয়ের সম্ভাবনা যেমন ছিল তেমনি কুফরের বিজয়ের সম্ভাবনাও ছিল। তাই মুসলমানদের মধ্যে যেসব মোনাফেক বিদ্যমান ছিল তারা ইসলামী দলের মধ্যে থেকেও ইহুদী ও খৃষ্টানদের

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ يُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ ﴿٥٦﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি দীন থেকে ফিরে যায় (তাহলে ফিরে যাক), আল্লাহ এমনিতর আরো বহু লোক সৃষ্টি করে দেবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারা আল্লাহকে ভালবাসবে, যারা মুমিনদের ব্যাপারে কোমল ও কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর হবে,[৮৭] যারা আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা ও সাধনা করে যাবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না।[৮৮] এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে চান তাকে দান করেন। আল্লাহ ব্যাপক উপায় উপকরণের অধিকারী এবং তিনি সবকিছু জানেন।

আসলে তোমাদের বন্ধু হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং সেই ঈমানদাররা যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহর সামনে বিনত হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে, তাঁর রসূলকে ও মুমিনদেরকে নিজের বন্ধু রূপে গ্রহণ করে তার জেনে রাখা দরকার, আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে।

সাথেও সম্পর্ক রাখতে চাইতো। তারা ভাবতো, ইসলাম ও কুফরের এ দ্বন্দ্বে যদি ইসলামের পরাজয় ঘটে যায় তাহলে তাদের জন্য যেন কোন একটা আশ্রয় স্থল অবশিষ্ট থাকে। এ ছাড়াও সে সময় আরবে খৃস্টান ও ইহুদীদের অর্থবল ছিল সবচেয়ে বেশী। মহাজনী ব্যবসায়ের বেশীর ভাগ ছিল তাদের হাতে। আরবের সবচেয়ে উর্বর ও শস্যশ্যামল ভূখণ্ড ছিল তাদের অধিকারে। তাদের সুদখোরীর জাল চারদিকে ছড়িয়ে ছিল। কাজেই অর্থনৈতিক কারণেও এ মোনাফেকরা তাদের সাথে নিজেদের আগের সম্পর্ক অটুট রাখতে চাইতো। তাদের ধারণা ছিল, ইসলাম ও কুফরের এ সংঘর্ষে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়ে

আমরা যদি ইসলামের সাথে বর্তমানে বিরোধে ও যুদ্ধে লিপ্ত সম্প্রদায়গুলোর সাথে নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করি, তাহলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক দিয়েই এটা হবে আমাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক।

৮৫. অর্থাৎ চূড়ান্ত বিজয়ের চাইতে কম পর্যায়ের এমন কোন জিনিস যার মাধ্যমে লোকদের মনে বিশ্বাস জন্মে যে, জয় পরাজয়ের চূড়ান্ত ফায়সালা ইসলামের পক্ষেই হবে।

৮৬. অর্থাৎ ইসলামের বিধান মেনে চলতে গিয়ে তারা যা কিছু করলো ঃ নামায পড়লো, রোযা রাখলো, যাকাত দিল, জিহাদে শরীক হলো, ইসলামী আইনের আনুগত্য করলো—এসব কিছুই এ জন্য নষ্ট হয়ে গেলো যে, ইসলামের ব্যাপারে তাদের মনে আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা ছিল না এবং তারা সবার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে একমাত্র তারই অনুগত বান্দায় পরিণত হয়ে যায়নি। বরং নিজেদের পার্থিব স্বার্থের কারণে তারা আল্লাহ ও তাঁর বিদ্রোহীদের মধ্যে নিজেদেরকে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে রেখেছিল।

৮৭. 'মুমিনদের ব্যাপারে কোমল' হবার মানে হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তি ঈমানদারদের মোকাবিলায় কখনো শক্তি প্রয়োগ করবে না। তার বুদ্ধি, মেধা, যোগ্যতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, অর্থ-সম্পদ, শারীরিক ক্ষমতা কোনটিই মুসলমানদেরকে দাবিয়ে রাখার, কষ্ট দেবার বা ক্ষতি করার জন্য ব্যবহার করবে না। মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে তাকে সবসময় একজন দয়ার্দ্র হৃদয়, কোমল স্বভাবের, দরদী ও ধৈর্যশীল মানুষ হিসেবেই দেখতে পায়।

'কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর' হবার মানে হচ্ছে, নিজের মজবুত ঈমান, নিস্বার্থ ও একনিষ্ঠ দীনদারী, অনমনীয় নীতিবাদিতা, চারিত্রিক শক্তি ও ঈমানী দূরদৃষ্টির কারণে একজন মুমিন ইসলাম বিরোধীদের মোকাবিলায় পাহাড়ের মতো অটল হবে। নিজের স্থান থেকে তাকে এক চুলও নড়ানো যাবে না। ইসলাম বিরোধীরা কখনো তাকে নমনীয়, দোদুল্যমান এবং অক্লেশে গলধঃকরণ করার মতো খাদ্য মনে করতে পারবে না। যখনই তারা তার মুখোমুখি হয় তখনই টের পেয়ে যায় যে, এ আল্লাহর বান্দা মরে যেতে পারে কিন্তু কখনো কোন মূল্যে বিক্রি হতে পারে না এবং কোন চাপের সামনে নতি স্বীকারও করতে পারে না।

৮৮. অর্থাৎ আল্লাহর দীনের অনুসরণ করার ব্যাপারে তাঁর বিধানসমূহ কার্যকর করার ব্যাপারে এবং এ দীনের দৃষ্টিতে যা সত্য তাকে সত্য এবং যা মিথ্যা তাকে মিথ্যা বলার ব্যাপারে সে আপোষহীন ও নির্ভীক। কারোর বিরোধিতা, নিন্দা, তিরস্কার, আপত্তি ও বিদ্রূপবানের সে পরোয়া করবে না। সাধারণ জনমত যদি ইসলামের প্রতিকূল হয় এবং ইসলামের পথে চলার অর্থ যদি সারা দুনিয়ার সামনে নিজেকে অপাংক্তেয় বানানো হয়ে থাকে তাহলেও সে সাচ্চাদিলে যে পথকে সত্য মনে করেছে সে পথেই চলতে থাকবে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ۝ قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

৯ রুকূ’

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে যেসব লোক তোমাদের দীনকে বিদ্রূপ ও হাসি–তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছে তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। যখন তোমরা নামাযের জন্য ডাক দাও তখন তারা এর প্রতি বিদ্রূপবান নিক্ষেপ করে এবং এ নিয়ে টিটকারী ও তামাশা করে।[৮৯] এর কারণ হচ্ছে তাদের জ্ঞান নেই।[৯০] তাদেরকে বলে দাও, "হে আহলি কিতাব! তোমরা আমাদের প্রতি তোমাদের ক্রোধের একমাত্র কারণ তো এই যে, আমরা আল্লাহর ওপর এবং দীনের সে শিক্ষার ওপর ঈমান এনেছি যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং আমাদের আগেও নাযিল হয়েছিল। আর তোমাদের বেশীরভাগ লোকইতো অবাধ্য।"

৮৯. অর্থাৎ আযানের আওয়াজ শুনে তা নকল করতে থাকে। ঠাট্টা–তামাশা ও বিদ্রূপ করার জন্য তার শব্দ বদল ও বিকৃত করে এবং তা নিয়ে টিটকারী দেয় ও ভেংচি কাটে।

৯০. অর্থাৎ তাদের এ কাজগুলো নিছক মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার ফল। যদি তারা মূর্খতা ও অজ্ঞতায় নিমজ্জিত না হতো তাহলে মুসলমানদের সাথে ধর্মীয় বিরোধ রাখা সত্ত্বেও এ ধরনের ন্যক্কারজনক কাজ তারা করতে পারতো না। আল্লাহর ইবাদাতের জন্য আহবান জানানো হলে তা নিয়ে ঠাট্টা–বিদ্রূপ করাকে কোন বিবেকবান ব্যক্তি পছন্দ করতে পারেন না।

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۚ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۚ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾ وَتَرٰى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾

তাহলে বলো, আমি কি তাদেরকে চিহ্নিত করবো। যাদের পরিণাম আল্লাহর কাছে এ ফাসেকদের চাইতেও খারাপ? বস্তুত যাদের ওপর আল্লাহ লানত বর্ষণ করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত, যাদের মধ্য থেকে কতককে বানর ও শুয়োর বানানো হয়েছে এবং যারা তাগুতের বন্দেগী করেছে, তারা আরো নিকৃষ্ট এবং তারা সাওয়া–উস–সাবীল–(সরল সঠিক পথ) থেকে বিচ্যুত হয়ে অনেক দূরে সরে গেছে।[৯১] যখন তারা তোমাদের কাছে আসে, তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। অথচ তারা কুফর নিয়ে এসেছিল, কুফর নিয়েই ফিরে গেছে এবং আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন তারা তাদের মনের মধ্যে কি জিনিস লুকিয়ে রেখেছে। তুমি দেখতে পাচ্ছো, এদের বেশীর ভাগ লোক গোনাহ, জুলুম ও সীমালংঘনের কাজে তৎপর এবং এরা হারাম খায়। এরা অত্যন্ত খারাপ কাজ করে যাচ্ছে।

৯১. এখানে স্বয়ং ইহুদীদের দিকে সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়েছে। তাদের ইতিহাস বলছে, বারবার আল্লাহর গযব ও লানতের শিকার হয়েছে। শনিবারের আইন ভাঙার কারণে তাদের কওমের বহু লোকের চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে। এমনকি তারা অধপতনের এমন নিম্নতম পর্যায়ে নেমে গেছে যে, তাদেরকে তাগুত তথা আল্লাহর বিদ্রোহী শক্তির দাসত্ব পর্যন্ত করতে হয়েছে। সার কথা হচ্ছে এই যে, তোমাদের নির্লজ্জতা ও অপরাধমূলক কার্যক্রমের কি কোন শেষ আছে? তোমরা নিজেরা ফাসেকী, শরীয়াত বিরোধী কার্যকলাপ ও চরম নৈতিক অধপতনের মধ্যে নিমজ্জিত আছো আর যদি অন্য কোন দল আল্লাহর ওপর ঈমান এনে সাচ্চা দীনদারীর পথ অবলম্বন করে তাহলে তোমরা তার বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে যাও।

لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿٦٣﴾ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ؕ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ؕ وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ كُلَّمَاۤ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٤﴾

এদের উলামা ও মাশায়েখগণ কেন এদেরকে পাপ কথা বলতে ও হারাম খেতে বাধা দেয় না? অবশ্যি এরা যা করে যাচ্ছে তা অত্যন্ত জঘন্য কার্যক্রম।

ইহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত বাঁধা,[৯২] আসলে তো বাঁধা হয়েছে ওদেরই হাত[৯৩] এবং তারা যে বাজে কথা বলছে সে জন্য তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে।[৯৪] —আল্লাহর হাত তো দরাজ, যেভাবে চান তিনি খরচ করে যান।

আসলে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার ওপর যে কালাম নাযিল করা হয়েছে তা উল্টো তাদের অধিকাংশের বিদ্রোহ ও বাতিলের পূজা বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৯৫] আর (এ অপরাধে) আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করে দিয়েছি। যতবারই তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালায় ততবারই আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কখনোই পছন্দ করেন না।

৯২. আরবী প্রবাদ অনুযায়ী কারোর হাত বাঁধা থাকার অর্থ হচ্ছে সে কৃপণ। দান–খয়রাত করার ব্যাপারে তার হাত নিষ্ক্রীয়। কাজেই ইহুদীদের একথার অর্থ এ নয় যে, সত্যিই আল্লাহর হাত বাঁধা রয়েছে। বরং এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ কৃপণ। যেহেতু শত শত বছর থেকে ইহুদী জাতি ঘোর লাঞ্ছনা–বঞ্চনা ও পতিত দশায় নিমজ্জিত ছিল, তাদের অতীতের গৌরব ও কৃতিত্ব নিছক পুরাতন কাহিনীতে পরিণত হয়েছিল এবং সে গৌরবের যুগ ফিরিয়ে আনার আর কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছিল না, তাই সাধারণত নিজেদের অব্যাহত জাতীয় দুর্যোগ ও দৈন্যদশার জন্য আক্ষেপ ও হাহুতাশ করতে গিয়ে ঐ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ
وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ
وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ۭ
مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۭ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَاۗءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٦﴾

যদি (বিদ্রোহের পরিবর্তে) এ আহলি কিতাব গোষ্ঠী ঈমান আনতো এবং আল্লাহ ভীতির পথ অবলম্বন করতো, তাহলে আমি তাদের থেকে তাদের দুষ্কৃতিগুলো মোচন করে দিতাম এবং তাদেরকে পৌঁছিয়ে দিতাম নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে। হায়, যদি তারা তাওরাত, ইনজিল ও অন্যান্য কিতাবগুলো প্রতিষ্ঠিত করতো, যা তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তাহলে তাদের জন্য রিযিক ওপর থেকেও বর্ষিত হতো এবং নীচে থেকেও উত্থিত হতো।[৯৬] তাদের মধ্যে কিছু লোক সত্যপন্থী হলেও অধিকাংশই অত্যন্ত খারাপ কাজে লিপ্ত।

অজ্ঞ ও নাদান লোকেরা (নাউযুবিল্লাহ) "আল্লাহ তো কৃপণ হয়ে গেছেন, তার ধনাগারের মুখ বন্ধ এবং আমাদের দেবার জন্য তাঁর কাছে আপদ–বিপদ ছাড়া আর কিছুই নেই"—এ বেহুদা কথা বলে বেড়াতো। কেবল যে ইহুদীরাই একথা বলতো, তা নয় বরং অন্যান্য জাতির মূর্খ ও অজ্ঞ গোষ্ঠীরও এ একই অবস্থা ছিল। তাদের ওপর কোন কঠিন সময় এলে তারা আল্লাহর কাছে নত হওয়ার পরিবর্তে অত্যন্ত ক্রোধের সাথে এ ধরনের বেআদবীমূলক কথা বলতো।

৯৩. অর্থাৎ এরা নিজেরাই কৃপণতায় নিমজ্জিত। নিজেদের কৃপণতা ও সংকীর্ণমনতার জন্য তারা সারা দুনিয়ায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

৯৪. অর্থাৎ এ ধরনের গোস্তাখী ও বিদ্রূপাত্মক কথা বলে এরা যদি মনে করে থাকে যে, আল্লাহ এদের প্রতি করুণাশীল হবেন এবং এদের ওপর তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করতে থাকবেন, তাহলে এদের জেনে রাখা দরকার, এটা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। বরং এদের এ কথাগুলোর ফলে এরা আল্লাহর অনুগ্রহের দৃষ্টি থেকে আরো বেশী বঞ্চিত হয়েছে এবং তাঁর করুণা ও রহমত থেকে আরো দূরে সরে গেছে।

৯৫. অর্থাৎ এ কালাম শুনে তারা কোন ভাল ও সুফলদায়ক শিক্ষা গ্রহণ এবং নিজেদের ভুল ও বিভ্রান্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে সতর্ক হয়ে তার ক্ষতিপূরণ করার ও নিজেদের অধপতিত অবস্থার কারণ জেনে তার সংশোধন করার দিকে নজর দেবার পরিবর্তে উল্টো তাদের ওপর এর এরূপ প্রভাব পড়েছে যে, জিদের বশবর্তী হয়ে তারা

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿٦٧﴾ قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَـٰنًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿٦٨﴾

১০ রুকূ'

হে রসূল! তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা মানুষের কাছে পৌঁছাও। যদি তুমি এমনটি না করো তাহলে তোমার দ্বারা তার রিসালাতের হক আদায় হবে না। মানুষের অনিষ্টকারিতা থেকে তোমাকে আল্লাহ রক্ষা করবেন। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, তিনি কখনো কাফেরদেরকে (তোমার মোকাবিলায়) সফলতার পথ দেখাবেন না। পরিষ্কার বলে দাও, "হে আহ্‌লি কিতাব! তোমরা কখনোই কোন মূল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে না। যতক্ষণ না তোমরা তাওরাত, ইন্‌জীল ও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নাযিল করা অন্যান্য কিতাবগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করবে।"[৯৭]

তোমার ওপর এই যে ফরমান নাযিল করা হয়েছে এটা অবশ্যি তাদের অনেকের গোয়ার্তুমী ও অবিশ্বাস আরো বাড়িয়ে দেবে।[৯৮] *কিন্তু অস্বীকারকারীদের অবস্থার জন্য কোন দুঃখ করো না।*

সত্যের বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছে। সৎকর্ম ও আত্মশুদ্ধির বিস্মৃত শিক্ষার কথা শুনে তাদের নিজেদের সত্য পথে ফিরে আসা তো দূরের কথা, উল্টো তারা এ শিক্ষাকে স্মরণ করিয়ে দেবার আহবান যাতে অন্যেরাও শুনতে না পারে এ জন্য তাকে দাবিয়ে দেবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৯৬. বাইবেলের লেবীয় পুস্তক (২৬ অনুচ্ছেদ) ও দ্বিতীয় বিবরণে (২৮ অনুচ্ছেদ) হযরত মূসা আলাইহিস সালামের একটি ভাষণ উদ্বৃত হয়েছে। এ ভাষণে তিনি বিস্তারিতভাবে বনী ইসরাঈল জাতিকে একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা পুরোপুরি ও যথাযথভাবে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে চললে আল্লাহর রহমত ও বরকত কিভাবে তোমাদের ওপর

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ
رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا
وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ
تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ
بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾

(নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো এখানে কারোর ইজারাদারী নেই।) মুসলমান হোক বা ইহুদী; সাবী হোক বা খৃস্টান যে–ই আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে নিসন্দেহে তার কোন ভয় বা মর্ম বেদনার কারণ নেই।[৯৯]

বনী ইসরাঈলের থেকে পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে অনেক রসূল পাঠিয়েছিলাম কিন্তু যখনই তাদের কাছে কোন রসূল তাদের প্রবৃত্তির কামনা–বাসনা বিরোধী কিছু নিয়ে হাযির হয়েছেন তখনই কাউকে তারা মিথ্যুক বলেছে এবং কাউকে হত্যা করেছে আর এতে কোন ফিত্‌না সৃষ্টি হবে না ভেবে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গেছে। তারপর আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। এতে তাদের অনেকেই আরো বেশী অন্ধ ও বধির হয়ে চলেছে। আল্লাহ তাদের এসব কাজ পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছেন।

বর্ষিত হবে এবং আল্লাহর কিতাবকে পেছনে ফেলে দিয়ে তাঁর নাফরমানী করতে থাকলে কিভাবে বালা–মুসিবত আপদ–বিপদ ও ধ্বংস চতুরদিক থেকে তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। হযরত মূসার ভাষণটি কুরআনের এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটির চমৎকার ব্যাখ্যা।

৯৭. তাওরাত ও ইনজীলকে প্রতিষ্ঠিত করার মানে হচ্ছে, সততা ও নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করা এবং তাদেরকে নিজের জীবন বিধানে পরিণত করা। এ প্রসংগে একথাটি ভালভাবে হৃদয়ংগম করে নিতে হবে যে, বাইবেলের পবিত্র পুস্তক সমষ্টিতে এক ধরনের বাণী আছে, যেগুলো ইহুদী ও খৃস্টান লেখকরা নিজেরাই রচনা করে লিখে দিয়েছেন আর এক ধরনের বাণী সেখানে আছে, যেগুলো আল্লাহর বাণী বা হযরত ঈসা

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾

নিসন্দেহে তারা কুফরী করেছে যারা বলেছে, মারয়াম পুত্র মসীহ্ই আল্লাহ। অথচ মসীহ্ বলেছিল, "হে বনী ইসরাঈল! আল্লাহর বন্দেগী করো, যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব! যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেছে তার ওপর আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আবাস জাহান্নাম। আর এ ধরনের জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

আলাইহিস সালাম ও অন্যান্য পয়গম্বরের বাণী হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে এবং যেগুলোতে একথা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ একথা বলেছেন বা অমুক নবী একথা বলেছেন। বাইবেলের এ বচনগুলোর মধ্য থেকে প্রথম ধরনের বচনগুলোকে আলাদা করে যদি কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র দ্বিতীয় ধরনের বাণীগুলোর মধ্যে অনুসন্ধান চালান, তাহলে তিনি সহজেই দেখতে পাবেন সেগুলোর শিক্ষা ও কুরআনের শিক্ষার মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। অনুবাদক, অনুলেখক ও ব্যাখ্যাতাগণের হস্তক্ষেপ এবং কোথাও কোথাও ঐশী বর্ণনাকারীদের ভুলের কারণে এ দ্বিতীয় ধরনের বাণীগুলোও পুরোপুরি অবিকৃত নেই তবুও প্রত্যেক ব্যক্তি নিসন্দেহে একথা অনুভব করবেন যে, কুরআন যে নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে চলেছে এগুলোর মধ্যেও ঠিক সেই একই নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। কুরআন যে আকীদা বিশ্বাসের কথা উপস্থাপন করেছে এখানেও সেই একই আকীদা বিশ্বাস উপস্থাপিত হয়েছে। কুরআন যে জীবন পদ্ধতির দিকে পথনির্দেশ করেছে এখানেও সেই একই জীবন পদ্ধতির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই ইহুদী ও খৃষ্টানরা যদি তাদের ধর্মগ্রন্থে আল্লাহ ও নবীদের পক্ষ থেকে উদ্ধৃত প্রকৃত শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতো তাহলে নিসন্দেহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবকালে তাদেরকে একটি ন্যায়বাদী ও সত্যপন্থী দল হিসেবে পাওয়া যেতো। এ ক্ষেত্রে তারা কুরআনের মধ্যে সেই একই আলো দেখতে পেতো, যা পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর মধ্যে পাওয়া যেতো। এ অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার জন্য তাদের ধর্ম পরিবর্তন করার আদতে কোন প্রশ্নই দেখা দিতো না। বরং যে পথে তারা চলে আসছিল সে পথের ধারাবাহিক পরিণতি হিসেবেই তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী হয়ে সামনে অগ্রসর হতে পারতো।

৯৮. অর্থাৎ একথা শোনার পর তারা স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করার ও যথার্থ সত্য হৃদয়ংগম করার পরিবর্তে একগুঁয়েমী ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে আরো বেশী কঠোরভাবে বিরোধিতা শুরু করে দেবে।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۗ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾ اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧٤﴾ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ۗ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ۗ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٧٥﴾

নিসন্দেহে তারা কুফরী করেছে যারা বলেছে, আল্লাহ তিন জনের মধ্যে একজন। অথচ এক ইলাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই যদি তারা নিজেদের এই সব কথা থেকে বিরত না হয়, তাহলে তাদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি দেয়া হবে। তবে কি তারা আল্লাহর কাছে তাওবা করবে না এবং তাঁর কাছে মাফ চাইবে না? আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

মারয়াম পুত্র মসীহ্ তো একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই ছিল না? তার পূর্বেও আরো অনেক রসূল অতিক্রান্ত হয়েছিল। তার মা ছিল একজন সত্যনিষ্ঠ মহিলা। তারা দু'জনই খাবার খেতো। দেখো কিভাবে তাদের সামনে সত্যের নিদর্শনগুলো সুস্পষ্ট করি। তারপর দেখো তারা কিভাবে উল্টো দিকে ফিরে যাচ্ছে।[১০০]

৯৯. সূরা আল বাকারার ৮ রুকূ'র ৮০ টীকা দেখুন।

১০০. এখানে মাত্র কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে ঈসার 'আল্লাহ' হওয়া সম্পর্কিত খৃষ্টীয় আকীদার এমন সুস্পষ্ট প্রতিবাদ করা হয়েছে যে, এর চাইতে ভাল ও দ্ব্যর্থহীনভাবে আর কোন প্রতিবাদ করা সম্ভবপর নয়। হযরত ঈসা মসীহ্ সম্পর্কে যদি কেউ জানতে চায় যে, তিনি আসলে কি ছিলেন তাহলে এ আলামতগুলো থেকে সম্পূর্ণ সন্দেহাতীতভাবে সে জানতে পারবে যে, তিনি নিছক একজন মানুষ ছিলেন। মোট কথা, যার জন্ম এক মহিলার গর্ভে, যার একটি বংশ তালিকা আছে, যিনি মানবিক দেহের অধিকারী ছিলেন, যিনি এমন সব সীমারেখা ও নিয়ম-কানুনের চার দেয়ালে আবদ্ধ এবং এমন সব গুণাবলী সমন্বিত, যা একমাত্র মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট। যিনি ঘুমাতেন, খেতেন, ঠাণ্ডা-গরম অনুভব

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ۚ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٧٦ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ۝٧٧

তাদেরকে বলো, তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর ইবাদাত করছো, যা তোমাদের না ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা রাখে না উপকারের? অথচ একমাত্র আল্লাহই তো সবার সবকিছু শোনেন ও জানেন। বলে দাও, হে আহলি কিতাব! নিজেদের দীনের ব্যাপারে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না এবং তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করো না যারা তোমাদের পূর্বে নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং আরো অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে আর 'সাওয়া-উস-সাবীল' থেকে বিচ্যুত হয়েছে।[১০১]

করতেন, এমনকি যাঁকে শয়তানের মাধ্যমে পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তাঁর সম্পর্কে কোন বিবেকবান ব্যক্তি একথা কল্পনাই করতে পারেন না যে, তিনি নিজে আল্লাহ বা আল্লাহর কাজে তাঁর সাথে শরীক ও তাঁর সমকক্ষ। তাছাড়া খৃস্টানরা নিজেদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতে হযরত মসীহ আলাইহিস সালামের জীবনকে সুস্পষ্টভাবে একটি মানুষের জীবন হিসেবে পেয়েছে। এরপরও তারা তাঁকে আল্লাহর গুণাবলী সমন্বিত পূজনীয় সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জোর দিয়ে যাচ্ছে। এটাকে মানব মনের বিভ্রান্তি ও গোমরাহী প্রীতির এক অদ্ভুত প্রবণতা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? আসলে যে ঈসা মসীহ্ আলাইহিস সালামের আবির্ভাব বাস্তবে ঘটেছিল সে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ঈসা মসীহ্কে তারা মানে না। বরং তারা নিজেদের মনোজগতে ঈসার এক উদ্ভট কাল্পনিক ভাবমূর্তি নির্মাণ করে তাকেই আল্লাহর স্থানে বসিয়ে দিয়েছে।

১০১. যেসব গোমরাহ জাতি থেকে খৃস্টানরা ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও বাতিল পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল এখানে তাদের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। বিশেষ করে এখানে গ্রীক দার্শনিকদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। তাদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে খৃস্টানরা সেই সিরাতে মুস্তাকীম—সরল সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল, যেদিকে প্রথমত তাদেরকে পরিচালিত করা হয়েছিল। হযরত ঈসার প্রথম দিকের অনুসারীরা যে আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করতেন তা বেশীর ভাগ তাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানলব্ধ সত্য ছিল এবং তাদের নেতা ও পথপ্রদর্শক তাদেরকে সেগুলো শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের খৃস্টানরা একদিকে ঈসার প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনের প্রশ্নে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে

এবং অন্যদিকে প্রতিবেশী জাতিসমূহের অলীক ধ্যান–ধারণা ও দর্শনে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের আকীদা–বিশ্বাসের বানোয়াট দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে। এভাবে তারা একটি সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম তৈরী করে ফেলে। এ নতুন ধর্মের সাথে হযরত ঈসার আসল শিক্ষাবলীর দূরতম কোন সম্পর্কও ছিল না। এ ব্যাপারে একজন খৃষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ রেভারেণ্ড চার্লস এণ্ডারসন স্কটের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার চতুর্দশ সংস্করণে "ঈসা মসীহ" (JESUS CHRIST) শিরোনামে তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাতে তিনি লিখছেন ঃ

"প্রথম তিনটি ইনজীলে (মথি, মার্ক ও লুক) এমন কোন জিনিস নেই যা থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, এ তিনটি ইনজীলের লেখকরা ঈসাকে মানুষ ছাড়া অন্য কিছু মনে করতেন। তাদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন একজন মানুষ। এমন একজন মানুষ যিনি বিশেষভাবে আল্লাহর আত্মা থেকে সঞ্জীবিত হয়েছিলেন এবং আল্লাহর সাথে এমন একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রাখতেন যে জন্য তাঁকে যদি আল্লাহর পুত্র বলা হয় তাহলে তা ন্যায়সংগত হবে। মথি নিজে তাঁর উল্লেখ করেছেন কাঠ মিস্ত্রীর পুত্র হিসেবে। এক জায়গায় তিনি বলছেন, পিতর তাঁকে "মসীহ্" মেনে নেবার পর 'তাঁকে আলাদা একদিকে ডেকে নিয়ে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন।' (মথি ১৬, ২২) লুক–এ আমরা দেখছি ক্রুশবিদ্ধ হবার ঘটনার পর হযরত ঈসার দু'জন শাগরিদ ইম্মায়ু নামক গ্রামের দিকে যাবার সময় নিম্নোক্তভাবে এর উল্লেখ করেছেন, "তিনি আল্লাহর ও সকল লোকের সাক্ষাতে কাজে ও কথায় পরাক্রমী নবী ছিলেন।" (লুক ২৪, ১৯) একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যদিও মার্কের রচনার পূর্বেই খৃষ্টানদের মধ্যে ঈসার জন্য 'প্রভু' (Lord) শব্দটির ব্যবহার সাধারণভাবে প্রচলিত হয়ে পড়েছিল তবুও মার্কের ইনজীলে ঈসাকে কোথাও এ শব্দের মাধ্যমে স্মরণ করা হয়নি এবং মথির ইনজিলেও নয়। অন্যদিকে এ দুটি পুস্তকে এ শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে আল্লাহর জন্য। ঈসার বিপদের ঘটনা যেভাবে বর্ণনা করা দরকার ঠিক তেমনি জোরে শোরে, তিনটি ইনজীলেই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মার্কের 'মুক্তিপণ' সম্বলিত বাণী (মার্ক ১০, ৪৫) ও শেষ উপদেশের সময়ের কয়েকটি শব্দ বাদ দিলে এ ইনজিলগুলোর কোথাও এ ঘটনার এমন অর্থ গ্রহণ করা হয়নি যা পরবর্তীকালে গ্রহণ করা হয়েছে। এমন কি ঈসার মৃত্যুর সাথে মানুষের পাপ মোচনের কোন সম্পর্ক ছিল, এ মর্মে কোথাও সামান্যতম ইংগিতও করা হয়নি।"

পরবর্তী পর্যায়ে তিনি আরো লিখেছেন ঃ

"ইনজীলগুলোর বিভিন্ন বাক্য থেকে একথা প্রমাণ হয় যে, ঈসা নিজেকে একজন নবী হিসেবে পেশ করতেন। যেমন, 'আমাকে আজ, কাল ও পরশু অবশ্যি নিজের পথে চলতে হবে। কারণ জেরুশালেমের বাইরে কোন নবী মারা যাবে—এমনটি হতে পারে না।' (লুক ১৩, ৩৩)–তিনি অধিকাংশ সময় নিজেকে 'আদম সন্তান' বলে উল্লেখ করেছেন।...... ঈসা কোথাও নিজেকে আল্লাহর পুত্র বলেননি। তার সমকালীন অন্য কেউ যখন তার সম্পর্কে এ শব্দটি ব্যবহার করেন তখন সম্ভবত তার মর্মার্থ এটাই হয় যে, তিনি তাকে 'মসীহ্' মনে করেন তবে তিনি নিজেকে ব্যাপক অর্থে 'পুত্র' বলে

উল্লেখ করেছেন।........এ ছাড়া আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক বর্ণনা করার জন্যও তিনি 'পিতা' শব্দটিকেও এ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করেছেন। ....আল্লাহর সাথে কেবল তাঁর একার এ সম্পর্ক আছে বলে তিনি মনে করতেন না। বরং প্রাথমিক যুগে অন্যান্য মানুষেরও আল্লাহর সাথে এ ধরনের বিশেষ গভীর সম্পর্ক ছিল এবং এ ব্যাপারে তিনি তাদেরকে নিজের সাথী মনে করতেন। তবে পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতা এবং মানবিক প্রকৃতির গভীর অধ্যয়ন তাঁকে একথা বুঝতে বাধ্য করে যে, এ ব্যাপারে তিনি একা।"

প্রবন্ধকার সামনে অগ্রসর হয়ে আরো লিখেছেন ঃ

"পুনৃতেকুসৃতের ঈদের সময় পিতরের এ কথাগুলো—'একজন মানুষ যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ছিলেন'—ঈসাকে এমনভাবে পেশ করে যেমন তাঁর সমকালীনরা তাঁকে জানতো ও বুঝতো। ..... ইনজীলগুলো থেকে আমরা জানতে পারি, শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত ঈসা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভের পর্যায় অতিক্রম করেন। তাঁর ক্ষুধা ও পিপাসা লাগতো। তিনি ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হতেন এবং ঘুমিয়ে পড়তেন। তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হতে পারতেন এবং তার ভালমন্দ জিজ্ঞেস করার মুখাপেক্ষী হতেন। তিনি দুঃখ সয়েছেন এবং মরে গেছেন। তিনি কেবল সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা হবার দাবীই করেননি বরং সুস্পষ্ট ভাষায় এগুলো অস্বীকার করেছেন।...... আসলে যদি দাবী করা হয় যে, তিনি সর্বত্র উপস্থিত ও সর্বদ্রষ্টা, তাহলে ইনজীল থেকে আমরা যে ধারণা পাই এটা হবে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। বরং তাঁর পরীক্ষার ঘটনা এবং গিতাসৃমনী ও খোপড়ী নামক স্থানে যা কিছু ঘটেছিল সেগুলোকে সম্পূর্ণ অবাস্তব বলে ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত এ দাবীর সাথে সেগুলোর কোন একটিরও কোন সামঞ্জস্য দেখানো যেতে পারে না। একথা অবশ্যি মানতে হবে, মসীহ্ যখন এ সমস্ত অবস্থার চড়াই উতরাই অতিক্রম করেছেন তখন তিনি মানবিক জ্ঞানের সাধারণ সীমাবদ্ধতার অধিকারী ছিলেন। এ সীমাবদ্ধতার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম থেকে থাকলে তা কেবল এতটুকু হতে পারে যা নবী সুলভ অন্তর্দৃষ্টি ও আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহাতীত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া মসীহ্‌কে সর্বশক্তিমান মনে করার অবকাশ ইনজীলে আরো কম। ইনজীলের কোথাও এতটুকু ইংগিত পাওয়া যাবে না যে, ঈসা আল্লাহর মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেই স্বাধীনভাবে সমস্ত কাজ করতেন। বরং উল্টো তাঁর বারবার দোয়া চাওয়ার অভ্যাস থেকে এবং এ বিপদটির হাত থেকে দোয়া ছাড়া আর কোন উপায়ে রেহাই পাওয়া যাবে না"—এ ধরনের বাক্য থেকে একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করে নেয়া হয় যে, তাঁর সত্তা আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। যদিও খৃষ্টীয় গীর্জাসমূহ যখন থেকে ঈসাকে 'ইলাহ' ও 'আল্লাহ' মনে করতে শুরু করেছে, তার পূর্বে ইনজীল গ্রন্থসমূহ সংকলন ও লিপিবদ্ধ করার কাজ সম্পূর্ণ হতে পারেনি, তবুও এ প্রমাণ পত্রগুলোতে একদিকে ঈসা যে যথার্থই একজন মানুষ, তার সাক্ষ্য সংরক্ষিত রয়ে গেছে এবং অন্যদিকে এগুলোর মধ্যে ঈসা নিজেকে আল্লাহ মনে করতেন, এমন কেন সাক্ষ প্রমাণ নেই। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়টি ইনজীলগুলোর ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ।"

অতপর এ প্রবন্ধকার আরো লিখেছেন ঃ

"আসমানে উঠিয়ে নেবার ঘটনার সময় এ উঠিয়ে নেবার মাধ্যমে ঈসাকে পূর্ণ ক্ষমতা সহকারে প্রকাশ্যে 'আল্লাহর পুত্রের' মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে, একথা সেন্টপলই ঘোষণা করেছিলেন। এ 'আল্লাহর পুত্র' শব্দটির মধ্যে নিশ্চিতভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে পুত্র হবার একটি ইংগিত নিহিত রয়েছে এবং সেন্টপল অন্য এক জায়গায় ঈসাকে 'আল্লাহর নিজের পুত্র' বলে সেই ইংগিতটিকে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। মসীহের জন্য 'বিধাতা বা প্রভু' বা ঈশ্বর শব্দটির আসল ধর্মীয় অর্থে ব্যবহার প্রথমে কে করেছিলেন, প্রথম খৃষ্টীয় দলটি, না সেন্টপল, এ বিষয়ের মীমাংসা করা এখন আর সম্ভবপর নয়। সম্ভবত প্রথমোক্ত দলটিই এর উদ্ভাবক। কিন্তু নিসন্দেহে সেন্টপলই এ সম্বোধনটির সর্বপ্রথম পূর্ণ অর্থে ব্যবহার শুরু করেন। তারপর 'ঈসা মসীহ' সম্পর্কে তিনি এমন অনেক চিন্তাধারা ও পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করেন যেগুলো প্রাচীন পবিত্র গ্রন্থাদিতে একমাত্র 'ঈশ্বর ইহওয়া' (আল্লাহ তাআলা'র) জন্য বলা হয়েছে। এভাবে নিজের বক্তব্যকে তিনি আরো বেশী সুস্পষ্ট করে তোলেন। এ সংগে মসীহ্কে তিনি আল্লাহর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সমপর্যায়ভুক্ত করেন এবং ব্যাপক ও সাধারণ অর্থে তাঁকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করেন। তবুও বিভিন্ন দিক থেকে আল্লাহর সমপর্যায়ভুক্ত করে দেবার পরও সেন্টপল তাঁকে চূড়ান্তভাবে আল্লাহ বলতে বিরত থাকেন।"

ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার আর একজন প্রবন্ধকার রেভারেণ্ড জর্জ উইলিয়ম ফক্স তাঁর 'খৃষ্টবাদ' (Christianity) শীর্ষক প্রবন্ধে খৃষ্টীয় গীর্জার মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে লিখছেন ঃ

"ত্রিত্ববাদী বিশ্বাসের চিন্তাগত কাঠামো গ্রীক দেশীয়। এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে ইহুদী শিক্ষা। এদিক দিয়ে বিচার করলে এটি আমাদের জন্য একটি অদ্ভুত ধরনের যৌগিক। ধর্মীয় চিন্তাধারা বাইবেল থেকে উৎসারিত কিন্তু তা ঢেলে সাজানো হয়েছে এক অপরিচিত দর্শনের আকারে। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার পরিভাষা ইহুদী সূত্রে লাভ করা হয়েছে। শেষ পরিভাষাটি যীশু (ঈসা) নিজে খুব কমই কখনো কখনো ব্যবহার করেছিলেন। আর পল নিজেও এটিকে যেভাবে ব্যবহার করেছেন তাতে এর অর্থ সম্পূর্ণ অস্পষ্ট ছিল। তবুও ইহুদী সাহিত্যে এ শব্দটি ব্যক্তিত্বের রূপ গ্রহণ করার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কাজেই এ বিশ্বাসটির মৌল উপাদান ইহুদীবাদ থেকে গৃহীত (যদিও এ যৌগিকের অন্তরভুক্ত হবার আগেই এটি গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল) এবং বিষয়টি নির্ভেজাল গ্রীকদেশীয়। যে প্রশ্নটির ভিত্তিতে এ বিশ্বাস গড়ে ওঠে সেটি কোন নৈতিক বা ধর্মীয় প্রশ্ন ছিল না। বরং সেটি ছিল আগাগোড়া একটি দার্শনিক প্রশ্ন। অর্থাৎ এ তিনটি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা সত্তার মধ্যে সম্পর্কের স্বরূপ কি? গীর্জা এ প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছে তা নিকিয়া কাউন্সিলে নির্ধারিত আকীদার মধ্যে সংযুক্ত হয়েছে। সেটি দেখার পর পরিষ্কার জানা যায়, ওটা পুরোপুরি গ্রীক চিন্তারই সমষ্টি।

এ প্রসংগে ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় 'চার্চের ইতিহাস' (Church History) শিরোনামে লিখিত অন্য একটি নিবন্ধের নিম্নোক্ত বক্তব্যটিও উল্লেখযোগ্য ঃ

"খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক শেষ হবার আগে মসীহ্কে সাধারণভাবে 'বাণী'র দৈহিক প্রকাশ হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছিল। তবুও অধিকাংশ খৃস্টান মসীহর 'ইলাহ' হওয়ার স্বীকৃতি দেয়নি। চতুর্থ শতকে এ বিষয়টির ওপর তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে গীর্জার ভিত্ নড়ে উঠেছিল। অবশেষে ৩২৫ খৃষ্টাব্দে নিকিয়া কাউন্সিল মসীহ্কে সরকারীভাবে যথারীতি ইলাহ বা ঈশ্বর হিসেবে ঘোষণা করে। সে সাথে এটিকে খৃষ্টীয় আকীদা বলেও গণ্য করে এবং সুনির্দিষ্ট শব্দাবলী সমন্বয়ে সেটি রচনা করে। এরপরও কিছুকাল পর্যন্ত বিতর্ক চলতে থাকে। কিন্তু শেষ বিজয় হয় নিকিয়া কাউন্সিলের সিদ্ধান্তেরই। পূর্বে ও পশ্চিমে এ সিদ্ধান্তকে যেভাবে মেনে নেয়া হয় তাতে যেন একথা স্বীকৃতি লাভ করে যে, নির্ভুল আকীদা সম্পন্ন খৃস্টান হতে হলে তাকে অবশ্যি এর ওপর ঈমান আনতে হবে। পুত্রকে 'ইলাহ' বলে মেনে নেবার সাথে সাথে 'পবিত্র আত্মাকে'ও ইলাহ বলে মেনে নেয়া হয়। তাকে ধর্মান্তর গ্রহণের মন্ত্র এবং প্রচলিত ঐতিহ্যসমূহের মধ্যে পিতা ও পুত্রের সাথে এক সারিতে জায়গা দেয়া হয়। এভাবে নিকিয়ায় মসীহর যে ধারণা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তার ফলে ত্রিত্ববাদ খৃষ্ট ধর্মের অবিচ্ছিন্ন অংগ গণ্য হয়েছে।

তারপর "পুত্রের 'ইলাহ' হবার তত্ত্বটি ঈসার ব্যক্তিসত্তায় রূপায়িত হয়েছিল"—এ দাবী আর একটি সমস্যার সৃষ্টি করে। চতুর্থ শতক এবং তার পরেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে। বিষয়টি ছিল, ঈসার ব্যক্তিত্বে ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্বের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল? ৪৫১ খৃষ্টাব্দে ক্যালসিডন কাউন্সিলে এর যে মীমাংসা হয়েছিল তা ছিল এই যে, ঈসার ব্যক্তি সত্তায় দু'টি পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতি একত্র হয়েছে। একটি ঐশ্বরিক প্রকৃতি এবং অন্যটি মানবিক প্রকৃতি। উভয়টি একত্রে সংযুক্ত হবার পরও কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছাড়াই প্রত্যেকের পৃথক বৈশিষ্ট অপরিবর্তিত রয়েছে। ৬৮০ খৃস্টাব্দে কনষ্ট্যান্টিনোপলে অনুষ্ঠিত তৃতীয় কাউন্সিলে এর ওপর কেবল মাত্র এতটুকু বৃদ্ধি করা হয় যে, এ দু'টি প্রকৃতি নিজ নিজ পৃথক ইচ্ছারও অধিকারী। অর্থাৎ ঈসা একই সংগে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছার ধারক।....... এ অন্তরবর্তীকালে পশ্চিমী চার্চ 'গুনাহ' ও 'অনুগ্রহ' বিষয় দুটির প্রতিও বিশেষ নজর দেয়। 'নাজাত' বা 'মুক্তি'র ব্যাপারে আল্লাহর ভূমিকা কি এবং বান্দার ভূমিকা কি—এ প্রশ্নটি নিয়ে সেখানে দীর্ঘকাল আলোচনা চলতে থাকে। অবশেষে ৫২৯ খৃস্টাব্দে উরিন্জের দ্বিতীয় কাউন্সিলে ...... এ মতবাদ গ্রহণ করা হয় যে, আদমের পৃথিবীতে নেমে আসার কারণে প্রত্যেকটি মানুষ এমন এক অবস্থার শিকার হয়েছে যার ফলে সে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করে নব জীবন ধারণ না করা পর্যন্ত নাজাত বা মুক্তির দিকে এক পাও অগ্রসর হতে পারে না। আর এ নব জীবন শুরু করার পরও যতক্ষণ না আল্লাহর অনুগ্রহ সার্বক্ষণিকভাবে তার সহায়ক থাকে ততক্ষণ সে সততা ও নেকীর অবস্থার মধ্যে টিকে থাকতে পারে না। আল্লাহর অনুগ্রহের এ সার্বক্ষণিক সাহায্য সে একমাত্র ক্যাথলিক চার্চের মাধ্যমেই লাভ করতে পারে।"

খৃষ্টীয় আলেমগণের এসব বর্ণনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, প্রথম দিকে যে জিনিসটি খৃষ্টীয় সমাজকে গোমরাহ করেছিল সেটি ছিল ভক্তি ও ভালবাসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি। এ বাড়াবাড়ির কারণে ঈসা আলাইহিস সালামের জন্য 'ঈশ্বর বা ইলাহ 'আল্লাহর

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى
ابْنِ مَرْيَمَ ۭ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٧٨﴾ كَانُوْا لَا يَتَنَا
هَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ۭ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٩﴾ تَرٰى كَثِيْرًا
مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ
اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿٨٠﴾

১১ রুকূ'

বনী ইসরাঈল জাতির মধ্য থেকে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের ওপর দাউদ ও মারয়াম পুত্র ঈসার মুখ দিয়ে অভিসম্পাত করা হয়েছে। কারণ তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং বাড়াবাড়ি করতে শুরু করেছিল। তারা পরস্পরকে খারাপ কাজ করা থেকে বিরত রাখা পরিহার করেছিল,[১০২] তাদের গৃহীত সেই কর্মপদ্ধতি বড়ই জঘন্য ছিল। আজ তুমি তাদের মধ্যে এমন অনেক লোক দেখছো যারা (ঈমানদারদের মোকাবিলায়) কাফেরদের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করে। নিসন্দেহে তাদের প্রবৃত্তি তাদেরকে যে পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। সে পরিণতি হলো, আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং তারা চিরন্তন শাস্তি ভোগ করবে।

পুত্র' শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়। আল্লাহর গুণাবলী তাঁর সাথে সংযুক্ত করা হয় এবং তথাকথিত কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত সংক্রান্ত আকীদা উদ্ভাবন করা হয়। অথচ হযরত ঈসার শিক্ষাবলীতে এসব বিষয়ের কোন সামান্যতম অবকাশও ছিল না। তারপর খৃস্টবাদীদের গায়ে যখন দর্শনের বাতাস লাগলো তখন তারা এ প্রাথমিক গোমরাহী অনুধাবন করে তার খপ্পর থেকে বাঁচার চেষ্টা না করে উলটো নিজেদের পূর্ববর্তী নেতৃবৃন্দের ভুলগুলোকেই মেনে চলার জন্য সেগুলোর ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলো এবং ঈসা আলাইহিস সালামের আসল শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ না করে নিছক দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রের সহায়তায় আকীদার পর আকীদা উদ্ভাবন করে চললো। খৃস্টবাদীদের এ গোমরাহীর বিরুদ্ধেই কুরআনের এ আয়াতগুলোতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

১০২. প্রত্যেক জাতির বিকৃতি শুরু হয় কয়েক ব্যক্তি থেকে। জাতির সামগ্রিক বিবেক জাগ্রত থাকলে সাধারণ জনমত ঐ বিপথগামী লোকদেরকে দমিয়ে রাখে এবং জাতি সামগ্রিকভাবে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু জাতি যদি ঐ ব্যক্তিগুলোর ব্যাপারে উপেক্ষা–অবহেলা ও উদাসীনতার নীতি অবলম্বন করে এবং দুষ্কৃতকারীদের তিরস্কার ও নিন্দা করার পরিবর্তে তাদেরকে সমাজে খারাপ কাজ করার জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়,

وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ
اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨١﴾ لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ
عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ
اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ۭ ذٰلِكَ
بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٨٢﴾

যদি এ লোকেরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ, নবী এবং নবীর ওপর যা নাযিল হয়েছিল তা মেনে নিতো তাহলে কখনো (ঈমানদারদের মোকাবিলায়) কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতো না।[১০৩] কিন্তু তাদের অধিকাংশ আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ করেছে।

ঈমানদারদের সাথে শত্রুতার ক্ষেত্রে তুমি ইহুদী ও মুশরিকদের পাবে সবচেয়ে বেশী উগ্র। আর ঈমানদারদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে নিকটতম পাবে তাদেরকে যারা বলেছিল আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। এর কারণ হচ্ছে, তাদের মধ্যে ইবাদাতকারী আলেম, সংসার বিরাগী দরবেশ পাওয়া যায়, আর তাদের মধ্যে আত্মগরিমা নেই।

তাহলে যে বিকৃতি প্রথমে কয়েক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা ধীরে ধীরে সমগ্র জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বনী ইসরাঈল জাতির বিকৃতি এভাবেই হয়েছে।

হযরত দাউদ ও হযরত ঈসা বনী ইসরাঈলের ওপর যে অভিসম্পাত বা লানত করেছেন তা জানার জন্য দেখুন যবূর (গীত সংহিতা ১০ ও ৫০ এবং মথি ২৩।)

১০৩. এর অর্থ হচ্ছে, যারা আল্লাহ, নবী ও আসমানী কিতাবকে মেনে নেয় তারা স্বাভাবিকভাবে মুশরিকদের মোকাবিলায় এমন লোকদের প্রতি বেশী সহানুভূতিশীল হয়, যাদের সাথে ধর্মের ব্যাপারে বিরোধ থাকলেও তারা তাদেরই মতো আল্লাহ ও আল্লাহ প্রেরিত অহির ধারাবাহিকতা ও রিসালাতকে মানে। কিন্তু এ ইহুদীরা এক অদ্ভুত ধরনের আহ্লি কিতাব। তাওহীদ ও শিরকের যুদ্ধে এরা প্রকাশ্যে মুশরিকদের সাথে সহযোগিতা করছে। নবুওয়াতের স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির লড়াইয়ে এদের সহানুভূতি রয়েছে নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের প্রতি। এরপরও এরা লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে এ দাবী করে বেড়াচ্ছে যে, তারা নবী ও কিতাব মানে।

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ
مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ
الشَّاهِدِينَ ﴿৮৩﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ
يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿৮৪﴾ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿৮৫﴾
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿৮৬﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿৮৭﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿৮৮﴾

যখন তারা এ কালাম শোনে, যা রসূলের ওপর নাযিল হয়েছে, তোমরা দেখতে পাও, সত্যকে চিনতে পারার কারণে তাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। তারা বলে ওঠে, "হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, সাক্ষদাতাদের মধ্যে আমাদের নাম লিখে নাও।" আর তারা আরো বলে, "আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান কেন আনবো না এবং যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে তাকে কেন মেনে নেবো না—যখন আমরা এ ইচ্ছা পোষণ করে থাকি যে, আমাদের রব যেন আমাদের সৎ ও সত্যনিষ্ঠ লোকদের অন্তরভুক্ত করেন। তাদের এ উক্তির কারণে আল্লাহ তাদেরকে এমনসব জান্নাত দান করেছেন যার নিম্নদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হয় এবং তারা সেখানে থাকবে চিরকালের জন্য। সৎ-কর্মনীতি অবলম্বনকারীদের জন্য এ প্রতিদান। আর যারা আমার আয়াত মানতে অস্বীকার করেছে ও সেগুলোকে মিথ্যা বলেছে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

১২ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব পবিত্র জিনিস হালাল করেছেন সেগুলো হারাম করে নিয়ো না।[১০৪] আর সীমালংঘন করো না।[১০৫] সীমা-লংঘনকারীদেরকে আল্লাহ ভীষণভাবে অপছন্দ করেন। আল্লাহ তোমাদের যে হালাল ও পবিত্র রিযিক দিয়েছেন তা থেকে পানাহার করো এবং সে আল্লাহর নাফরমানী থেকে দূরে থাকো যার ওপর তোমরা ঈমান এনেছো।

১০৪. এ আয়াতে দু'টি কথা বলা হয়েছে। এক, তোমরা নিজেরাই কোন জিনিস হালাল ও হারাম গণ্য করার অধিকারী হয়ে বসো না। আল্লাহ যেটি হালাল করেছেন সেটি হালাল এবং আল্লাহ যেটি হারাম করেছেন সেটি হারাম। নিজেদের ক্ষমতা বলে তোমরা নিজেরা যদি কোন হালালকে হারাম করে ফেলো তাহলে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে তোমরা নফসের ও প্রবৃত্তির আইনের অনুগত গণ্য হবে। দুই, খৃষ্টীয় সন্যাসী, হিন্দু যোগী, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ইশরাকী তাসাউফ পন্থীদের মতো বৈরাগ্য, সংসার বিমুখতা ও দুনিয়ার বৈধ স্বাদ আস্বাদন পরিহার করার পদ্ধতি অবলম্বন করো না। ধর্মীয় মানসিকতার অধিকারী সৎস্বভাব সম্পন্ন লোকদের মধ্যে সাধারণভাবে এ প্রবণতা দেখা গেছে যে, শরীর ও প্রবৃত্তির অধিকার আদায় ও চাহিদা পূরণ করাকে তারা আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় মনে করে থাকেন। তাদের ধারণা, নিজেকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করা, নিজের প্রবৃত্তিকে পার্থিব ভোগ ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা এবং দুনিয়ার জীবন যাপনের বিভিন্ন উপায়–উপকরণের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা মূলত একটি মহৎ কাজ এবং এ ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যেতে পারে না। সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যেও কেউ কেউ এ মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলেন, কোন কোন সাহাবী অংগীকার করেছেন ঃ তারা সর্বক্ষণ রোযা রাখবেন, রাতে বিছানায় ঘুমাবেন না বরং সারা রাত জেগে ইবাদাত করবেন, গোশ্‌ত, তেল, চর্বি, ঘি ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না, নারীদের সাথে সম্পর্ক রাখবেন না। একথা শুনে তিনি একটি ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন ঃ "আমাকে এ ধরনের কাজ করার হুকুম দেয়া হয়নি। তোমাদের প্রবৃত্তিরও তোমাদের ওপর অধিকার আছে। রোযা রাখো আবার পানাহারও করো। রাতে জেগে ইবাদাত করো আবার নিদ্রাও যাও। আমাকে দেখো। আমি ঘুমাই আবার রাত জেগে ইবাদাতও করি। রোযা রাখি আবার কখনো রাখিও না। গোশতও খাই আবার ঘিও খাই। কাজেই যে ব্যক্তি আমার রীতিনীতি পছন্দ করে না সে আমার অন্তরভুক্ত নয়।" তারপর আবার বললেন ঃ "লোকদের কি হয়ে গেছে, তারা নারী, ভাল খাবার, সুগন্ধি, নিদ্রা ও দুনিয়ার স্বার্দ আনন্দ নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছে? আমি তোমাদের পাদ্রী ও সংসারত্যাগী হয়ে যাবার শিক্ষা দেইনি। আমি যে দীনের প্রচলন করেছি তাতে নারী ও গোশ্‌ত থেকে দূরে থাকার কোন অবকাশ নেই এবং সেখানে সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্যবাদী জীবন যাপনেরও কোন সুযোগ নেই আত্মসংযমের জন্য আমার এখানে আছে রোযা। সংসারত্যাগী জীবনের সমস্ত ফায়দা এখানে লাভ করা হয় জিহাদের মাধ্যমে। আল্লাহর বন্দেগী করো। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। হজ্জ ও উমরাহ করো। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও ও রমযানের রোযা রাখো। তোমাদের আগে যারা ধ্বংস হয়েছে তারা এ জন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তারা নিজেদের ওপর কঠোরতা আরোপ করেছিল। আর যখন তারা নিজেরা নিজেদের ওপর কঠোরতা আরোপ করলো তখন আল্লাহও তাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করলেন। তোমরা গীর্জায় ও খানকাহে যাদেরকে দেখছো এরা হচ্ছে তাদেরই অবশিষ্ট উত্তরসূরী।"

এ প্রসঙ্গে কোন কোন রেওয়ায়াত থেকে এতদূরও জানা যায় যে, একজন সাহাবীর ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলেন, তিনি দীর্ঘদিন থেকে নিজের স্ত্রী সান্নিধ্যে যাচ্ছেন না এবং রাত দিন ইবাদাতে মশগুল থাকছেন। তিনি তাকে ডেকে হুকুম দিলেন, এখনি তোমার স্ত্রীর কাছে যাও। সাহাবী জবাব দিলেন, আমি রোযা

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ؕ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۸۹﴾

তোমরা যে সমস্ত অর্থহীন কসম খেয়ে ফেলো। সে সবের জন্য আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করেন না। কিন্তু তোমরা জেনে বুঝে যেসব কসম খাও সেগুলোর ওপর তিনি অবশ্যি তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। (এ ধরনের কসম ভেঙে ফেলার) কাফ্‌ফারা হচ্ছে, দশ জন মিসকিনকে এমন মধ্যম পর্যায়ের আহার দান করো যা তোমরা নিজেদের সন্তানদের খেতে দাও অথবা তাদেরকে কাপড় পরাও বা একটি গোলামকে মুক্ত করে দাও। আর যে ব্যক্তি এর সামর্থ রাখে না সে যেন তিন দিন রোযা রাখে। এ হচ্ছে তোমাদের কসমের কাফ্‌ফারা যখন তোমরা কসম খেয়ে তা ভেঙে ফেলো।[১০৬] তোমাদের কসমসমূহ সংরক্ষণ করো।[১০৭] এভাবে আল্লাহ নিজের বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট করেন, হয়তো তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

রেখেছি। জবাব দিলেন, রোযা ভেঙ্গে ফেলো এবং স্ত্রীর কাছে যাও। হযরত উমরের আমলে জনৈকা মহিলা অভিযোগ করলেন, আমার স্বামী সারাদিন রোযা রাখেন, রাতে ইবাদাত করেন এবং আমার সাথে কোন সম্পর্ক রাখেন না। হযরত উমর (রা) তার মামলার নিষ্পত্তির জন্য প্রখ্যাত তাবেঈ বুযর্গ কা'ব ইবনে সাওরুল আযদিকে নিযুক্ত করলেন। তিনি ফায়সালা দিলেন, এ মহিলার স্বামী তিন রাত ইচ্ছামতো ইবাদাত করতে পারেন কিন্তু চতুর্থ রাতে অবশ্যি তার স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

১০৫. সীমালংঘন করার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। হালালকে হারাম করা এবং আল্লাহর নির্ধারিত পাক–পবিত্র জিনিসগুলো থেকে এমনভাবে দূরে সরে থাকা যেন সেগুলো নাপাক, এটাও এক ধরনের বাড়াবাড়ি। তারপর পাক পবিত্র জিনিসগুলো অযথা ও অপ্রয়োজনে ব্যয় করা, অপচয় ও অপব্যয় করা এবং প্রয়োজনের তুলনায় বেশী ও প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করাও এক ধরনের বাড়াবাড়ি। আবার হালালের সীমা পেরিয়ে হারামের সীমানায় প্রবেশ করাও বাড়াবাড়ি। এ তিনটি কাজই আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়।

১০৬. যেহেতু কোন কোন লোক হালাল জিনিসগুলো নিজেদের ওপর হারাম করে নেবার কসম খেয়েছিল তাই এ প্রসংগে আল্লাহ এ কসমের বিধানও বর্ণনা করে দিয়েছেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

হে ঈমানদারগণ! এ মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শরসমূহ[১০৮] এ সমস্তই হচ্ছে ঘৃণ্য শয়তানী কার্যকলাপ। এগুলো থেকে দূরে থাকো, আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে।[১০৯]

সে বিধান হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ যদি কোন ব্যক্তির মুখ থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে কসম শব্দ বের হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তা পূর্ণ করার তেমন কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এ ধরনের কসমের জন্য পাকড়াও করা হবে না। আর যদি কেউ জেনে বুঝে কসম খেয়ে থাকে........ সে যেন তা ভেঙে ফেলে এবং এ জন্য কাফ্ফারা আদায় করে। কারণ যে ব্যক্তি কোন গুনাহের কাজ করার কসম খেয়ে বসে তার নিজের কসম পূর্ণ করা উচিত নয়। (দেখুন, সূরা বাকারা, টীকা ২৪৩, ২৪৪। এ ছাড়া কাফ্ফারার ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আন নিসা, টীকা ১২৫)

১০৭. কসম সংরক্ষণ করার কয়েকটি অর্থ হয়। এক, কসমকে সঠিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে। আজেবাজে অর্থহীন কথায় ও গুনাহের কাজে কসম খাওয়া যাবে না। দুই, কোন বিষয় কসম খেলে সেটা মনে রাখতে হবে, নিজের গাফলতির কারণে তা ভুলে গিয়ে তার বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না। তিন, কোন সঠিক বিষয়ে জেনে বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে কসম খেলে তা অবশ্যি পূর্ণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধাচরণ করা হলে অবশ্যি কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

১০৮. মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শরের ব্যাখ্যার জন্য সূরা মায়েদার ১২ ও ১৪ টীকা দেখুন। এ প্রসংগে জুয়ার ব্যাখ্যাও ১৪ টীকায় পাওয়া যাবে। যদিও ভাগ্য নির্ণায়ক শর (আযলাম) স্বভাবতই এক ধরনের জুয়া তবুও তাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যটি হচ্ছে, আরবী ভাষায় 'আযলাম' বলা হয় এমন ধরনের ফাল গ্রহণ ও শর নিক্ষেপ করাকে যার সাথে মুশরিকী আকীদা–বিশ্বাস ও কুসংস্কার জড়িত থাকে। আর 'মাইসির' (জুয়া) শব্দটি এমন সব খেলা ও কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যেখানে আকস্মিক ঘটনাকে অর্থোপার্জন, ভাগ্য পরীক্ষা এবং অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী বন্টনের মাধ্যমে পরিণত করা হয়।

১০৯. এ আয়াতে চারটি জিনিস চূড়ান্তভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এক, মদ। দুই, জুয়া। তিন, এমন সব জায়গা যেগুলোকে আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইবাদাত করার অথবা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য কুরবানী করার ও নজরানা দেবার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। চার, ভাগ্য নির্ণায়ক শর। শেষের তিনটির ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। মদ সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান নীচে দেয়া হলো ঃ

মদ হারাম হওয়া প্রসংগে ইতিপূর্বে আরো দু'টি নির্দেশ এসেছিল। সে দু'টি আলোচিত হয়েছে সূরা বাকারার ২১৯ আয়াতে এবং সূরা আন নিসার ৪৩ আয়াতে। এরপর এ তৃতীয় নির্দেশটি আসার আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক ভাষণে লোকদেরকে

সতর্ক করে দিয়ে বলেন ঃ মহান আল্লাহ মদ অত্যন্ত অপছন্দ করেন। মদ চিরতরে হারাম হয়ে যাবার নির্দেশ জারি হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। কাজেই যাদের কাছে মদ আছে তাদের তা বিক্রি করে দেয়া উচিত। এর কিছুদিন পর এ আয়াত নাযিল হয়। এবার তিনি ঘোষণা করেন, এখন যাদের কাছে মদ আছে তারা তা পান করতে পারবে না এবং বিক্রিও করতে পারবে না বরং তা নষ্ট করে দিতে হবে। কাজেই তখনই মদীনার সমস্ত গলিতে মদ ঢেলে দেয়া হয়। অনেকে জিজ্ঞেস করেন, এগুলো ফেলে না দিয়ে আমরা ইহুদীদেরকে তোহ্ফা হিসেবে দিই না কেন? জবাবে নবী করীম (স) বলেন, "যিনি একে হারাম করেছেন তিনি একে তোহফা হিসেবে দিতেও নিষেধ করেছেন।" কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেন, আমরা মদকে সিরকায় পরিবর্তিত করে দিই না কেন? তিনি এটিও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং নির্দেশ দেন ঃ "না, ওগুলো ঢেলে দাও।" এক ব্যক্তি অত্যন্ত জোর দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, ওষুধ হিসেবে ব্যবহারের নিশ্চয়ই অনুমতি আছে? জবাব দেন ঃ "না, এটা ওষুধ নয় বরং রোগ।" আর একজন আরয করেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমরা এমন এক এলাকার অধিবাসী যেখানে শীত অত্যন্ত বেশী এবং আমাদের পরিশ্রমও অনেক বেশী করতে হয়। আমরা মদের সাহায্যে ক্লান্তি ও শীতের মোকাবিলা করি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা যা পান করো তা কি নেশা সৃষ্টি করে? লোকটি ইতিবাচক জবাব দেন। তখন তিনি বলেন, তাহলে তা থেকে দূরে থাকো। লোকটি তবুও বলেন, কিন্তু এটা তো আমাদের এলাকার লোকেরা মানবে না। জবাব দেন, "তারা না মানলে তাদের সাথে যুদ্ধ করো।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

لَعَنَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيْهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ -

"আল্লাহ লানত বর্ষণ করেছেন (১) মদের ওপর, (২) মদ পানকারীর ওপর, (৩) মদ পরিবেশনকারীর ওপর, (৪) মদ বিক্রেতার ওপর, (৫) মদ ক্রয়কারীর ওপর, (৬) মদ উৎপাদন ও শোধনকারীর ওপর, (৭) মদ উৎপাদন ও শোধনের ব্যবস্থাপকের ওপর, (৮) মদ বহনকারীর ওপর এবং (৯) মদ যার কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তার ওপর।"

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন দস্তরখানে আহার করতে নিষেধ করেছেন যেখানে মদ পান করা হচ্ছে। প্রথম দিকে তিনি যেসব পাত্রে মদ তৈরী ও পান করা হতো সেগুলোর ব্যবহারও নিষিদ্ধ করে দেন। পরে মদ হারাম হবার হুকুমটি পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তিনি পাত্রগুলো ব্যবহার করার অনুমতি দেন।

'খাম্‌র' শব্দটি আরবীতে মূলত আংগুর থেকে তৈরী মদের জন্য ব্যবহৃত হতো পরোক্ষ অর্থে গম, যব, কিসমিস, খেজুর ও মধু থেকে উৎপাদিত মদকেও খামর বলা হতো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ নির্দেশকে নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেকটি

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطٰنُ أَنْ يُّوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُونَ ۝ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلٰى رَسُولِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِينُ ۝ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّأَحْسَنُوا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা–বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। তাহলে তোমরা কি এসব থেকে বিরত থাকবে? আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা মেনে চলো এবং (নিষিদ্ধ কাজ থেকে) বিরত থাকো। কিন্তু যদি তোমরা আদেশ অমান্য করো, তাহলে জেনে রাখো, আমার রসূলের প্রতি শুধুমাত্র সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ পৌছিয়ে দেবারই দায়িত্ব ছিল।

যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করছে, তারা পূর্বে যা কিছু পানাহার করেছিল সে জন্য তাদেরকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না, তবে এ জন্য শর্ত হচ্ছে, তাদেরকে অবশ্যি ভবিষ্যতে যেসব জিনিস হারাম করা হয়েছে সেগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে, ঈমানের ওপর অবিচল থাকতে হবে এবং ভাল কাজ করতে হবে তারপর যে যে জিনিস থেকে বিরত রাখা হয় তা থেকে তাদের বিরত থাকতে হবে এবং আল্লাহর যেসব হুকুম নাযিল হয় সেগুলো মেনে চলতে হবে। অতপর আল্লাহভীতি সহকারে সদাচরণ অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহ সদাচারীদের ভালবাসেন।

জিনিসের ওপর ব্যাপ্ত করে দিয়েছেন। তিনি হাদীসে স্পষ্ট বলেছেন ঃ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "প্রত্যেকটি নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস মদ এবং প্রত্যেকটি নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হারাম।" তিনি আরো বলেছেন ঃ

كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ "যে কোন পানীয় নেশা সৃষ্টি করলে তা হারাম।।"

يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ۗ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ۗ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

১৩ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ এমন শিকারের মাধ্যমে তোমাদের কঠিন পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করবেন যা হবে একেবারে তোমাদের হাত ও বর্শার নাগালের মধ্যে, তোমাদের মধ্য থেকে কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে, তা দেখার জন্য। কাজেই এ সতর্কবাণীর পর যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করলো তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। হে ঈমানদারগণ। ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করো না।[১১০] আর তোমাদের কেউ যদি জেনে বুঝে এমনটি করে বসে, তাহলে যে প্রাণীটি সে মেরেছে গৃহপালিত প্রাণীর মধ্য থেকে তারই সমপর্যায়ের একটি প্রাণী তাকে নযরানা দিতে হবে, যার ফায়সালা করবে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি। আর এ নযরানা কাবা ঘরে পৌঁছাতে হবে। অথবা এ গুনাহের কাফ্‌ফারা হিসেবে কয়েক জন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে হবে। অথবা সে অনুপাতে রোযা রাখতে হবে,[১১১] যাতে সে নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। পূর্বে যা কিছু হয়ে গেছে সেসব আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু এখন যদি কেউ সে কাজের পুনরাবৃত্তি করে তাহলে আল্লাহ তার বদলা নেবেন। আল্লাহ সবার ওপর বিজয়ী এবং তিনি বদ্‌লা নেবার ক্ষমতা রাখেন।

তিনি আরো বলেন ঃ وَاَنَا اَنْهٰى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ "আর আমি প্রত্যেকটি নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করছি।"

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জুমার খুতবায় মদের সংজ্ঞা এভাবে দেন : اَلْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ "মদ বলতে এমন সব জিনিসকে বুঝায় যা বুদ্ধিকে বিকৃত করে ফেলে।"

এ ছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মূলনীতি বর্ণনা করেছেন : مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ "যে জিনিসের বেশী পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে তার সামান্য পরিমাণও হারাম।" তিনি আরো বলেছেন :

مَا اَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَمِلْأُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ

"যে জিনিসের বড় এক পাত্র পরিমাণ পান করলে নেশা হয় তার ক্ষুদ্র পরিমাণ পান করাও হারাম।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মদ পানকারীর জন্য বিশেষ কোন শাস্তি নির্ধারিত ছিল না। যে ব্যক্তিকে এ অপরাধে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হতো তাকে কিল, থাপ্পড়, জুতা, লাথি, গিঁট বাঁধা প্যাকানো কাপড় ও খেজুরের ছড়া দিয়ে পিটানো হতো। রসূলের আমলে এ অপরাধে বড় জোর চল্লিশ ঘা মারা হতো। হযরত আবু বকরের (রা) আমলে ৪০ ঘা বেত্রাঘাত করা হতো। হযরত উমরের (রা) আমলেও শুরুতে ৪০ ঘা বেত মারা হতো। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন লোকেরা এ অপরাধ অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকছে না তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শক্রমে এ অপরাধের দণ্ড হিসেবে ৮০টি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন। ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানীফা এবং একটি বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম শাফেঈও এ শাস্তিকেই মদ পানের দণ্ড হিসেবে গণ্য করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং অন্য একটি বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম শাফেঈ ৪০ বেত্রাঘাতকেই এর শাস্তি হিসেবে মেনে নিয়েছেন। হযরত আলীও (রা) এটিই পছন্দ করেছেন।

শরীয়াতের দৃষ্টিতে মদের প্রতি নিষেধাজ্ঞার এ বিধানটিকে শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠিত করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্যের অন্তরভুক্ত। হযরত উমরের শাসনামলে বনী সাকীফের রুয়াইশিদ নামক এক ব্যক্তির একটি দোকান পুড়িয়ে দেয়া হয়। কারণ সে লুকিয়ে লুকিয়ে মদ বিক্রি করতো। আর একবার হযরত উমরের হুকুমে পুরো একটি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়। কারণ সেই গ্রামে গোপনে মদ উৎপাদন ও চোলাই করা হতো এবং মদ বেচাকেনার কারবারও সেখানে চলতো।

১১০. ইহরাম বাঁধা অবস্থায় নিজে শিকার করা বা অন্যকে শিকারে সাহায্য করা উভয়টিই নিষিদ্ধ। এ ছাড়াও ইহরাম বাঁধা (মুহরিম) ব্যক্তির জন্য কোন শিকার করে আনা হলে তাও তার জন্য খাওয়া জায়েয নয়। তবে কোন ব্যক্তি নিজে যদি নিজের জন্য শিকার করে থাকে এবং সেখান থেকে মুহরিমকে তোহফা হিসেবে কিছু দিয়ে দেয় তাহলে তা খাওয়ায় কোন ক্ষতি নেই। হিংস্র পশু এ বিধানের আওতার বাইরে। সাপ, বিচ্ছু, পাগলা কুকুর এবং মানুষের ক্ষতি করে এমন সব পশু ইহরাম অবস্থায় মারা যেতে পারে।

১১১. কোন্ ধরনের পশু হত্যা করলে কতজন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে বা ক'টি রোযা রাখতে হবে, এর ফায়সালাও করবেন দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি।

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾

তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং তা খাওয়া হালাল করে দেয়া হয়েছে।[১১২] যেখানে তোমরা অবস্থান করবে সেখানে তা খেতে পারো এবং কাফেলার জন্য পাথেয় হিসেবে নিয়ে যেতেও পার। তবে যতক্ষণ তোমরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় থাকো ততক্ষণ তোমাদের জন্য স্থলভাগের শিকার হারাম করে দেয়া হয়েছে। কাজেই আল্লাহর নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকো। তোমাদের সবাইকে ঘেরাও করে তাঁর সামনে হাযির করা হবে।

আল্লাহ পবিত্র কাবা ঘরকে মানুষের জন্য (সমাজ জীবন) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিণত করেছেন আর হারাম মাস, কুরবানীর পশু ও গলায় মালা পরা পশুগুলোকেও (এ কাজে সহায়ক বানিয়ে দিয়েছেন)[১১৩] যাতে তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত অবস্থা জানেন এবং তিনি সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন।[১১৪]

১১২. যেহেতু সামুদ্রিক সফরে অনেক সময় পাথেয় শেষ হয়ে যায় এবং আহার সংগ্রহের জন্য জলজ প্রাণী শিকার করা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না, তাই সামুদ্রিক শিকার হালাল করা হয়েছে।

১১৩. আরবে কাবা ঘরের মর্যাদা কেবলমাত্র একটি ইবাদাতগৃহ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল না বরং নিজের কেন্দ্রীয় অবস্থান ও পবিত্রতম ভাবমূর্তির কারণে এরই ওপর সারা দেশের অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক জীবনধারায় নির্ভরশীল ছিল। হজ্জ ও উমরাহর জন্য সারাদেশ কাবা ঘরের দিকে ধাবিত হতো। হজ্জ উপলক্ষে এ সম্মিলনের কারণে বিশৃংখল ও বিক্ষিপ্ত আরবদের মধ্যে একটি ঐক্য সূত্র সৃষ্টি হতো। বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রের লোকেরা নিজদের মধ্যে তামাদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতো। কাব্য সম্মেলন ও কবিতা প্রতিযোগিতার ফলে তাদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হতো। বাণিজ্যিক লেনদেনের ফলে সারাদেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূর্ণ হতো। হারাম মাসগুলোর কারণে আরবরা বছরের এক-তৃতীয়াংশ সময় লাভ করতো শান্তি ও নিরাপত্তার

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٨﴾ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٩٩﴾ قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٠﴾

জেনে রাখো, আল্লাহ শাস্তি দানের ব্যাপারে যেমন কঠোর তেমনি তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়ও। রসূলের ওপর কেবলমাত্র বাণী পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্বই অর্পিত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সমস্ত অবস্থাই আল্লাহ জানেন। হে নবী! এদেরকে বলে দাও, পবিত্র ও অপবিত্র সমান নয়, অপবিত্রের আধিক্য তোমাদের যতই চমৎকৃত করুক না কেন।[১১৫] কাজেই হে বুদ্ধিমানেরা! আল্লাহর নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকো আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।

জন্য। এ সময় তাদের কাফেলা দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অবাধে চলাফেরা করতো। কুরবানীর পশু ও বিচিত্র বর্ণের ঝলমলে মালা জড়ানো পশু দলের উপস্থিতিও তাদের এ চলাফেরায় বিরাট সাহায্য যোগাতো। কারণ মানত ও নযরানার আলামত হিসেবে যেসব পশুর গলায় ঝলমলে মালা শোভা পেতো তাদের দেখে ভক্তিতে আরবদের মাথা নত হয়ে আসতো। এ সময় কোন লুটেরা আরব গোত্র তাদের ওপর আক্রমণ চালাবার দুঃসাহস করতো না।

১১৪. অর্থাৎ এ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তা করলে তোমরা নিজেরাই তোমাদের দেশের অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক জীবনে এর একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়ে যাবে যে, আল্লাহ তাঁর নিজের সৃষ্টির কল্যাণ ও প্রয়োজন সম্পর্কে কত গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং নিজের এক একটি বিধানের সাহায্যে তিনি মানব জীবনের বিভিন্ন বিভাগকে কত ব্যাপকভাবে উপকৃত করছেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে অশান্তি ও অরাজকতার মধ্য দিয়ে যে শত শত বছর অতিবাহিত হয়েছে, সে সময় তোমরা নিজেরাই নিজেদের স্বার্থ ও প্রয়োজন সম্পর্কে অবগত ছিলে না। তখন তোমরা নিজেদের ধ্বংস সাধনের নেশায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের প্রয়োজন জানতেন। তিনি শুধুমাত্র কাবাঘরকে তোমাদের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে তোমাদের জন্য এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন যার ফলে তোমাদের জাতীয় জীবন সুরক্ষিত হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য অসংখ্য বিষয় বাদ দিয়ে যদি শুধুমাত্র এ একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করো তাহলে তোমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাবে যে, আল্লাহ তোমাদের যে বিধান দিয়েছেন তার আনুগত্য করার মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এর মধ্যে তোমাদের জন্য এমন সব কল্যাণ রয়েছে যেগুলো উপলব্ধি করার ক্ষমতা তোমাদের নেই এবং নিজেদের হাজারো চেষ্টা সাধনা দ্বারাও সেগুলোকে বাস্তবে রূপায়িত করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ۗ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾ مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۗ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১৪ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! এমন কথা জিজ্ঞেস করো না যা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দেয়া হলে তোমাদের খারাপ লাগবে।[১১৬] তবে কুরআন নাযিলের সময় যদি তোমরা সেসব বিষয়ে জিজ্ঞেস করো তাহলে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে। এ পর্যন্ত তোমরা যা কিছু করেছো, আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন। তিনি ক্ষমাশীল ও সহনশীল। তোমাদের পূর্বে একটি দল এ ধরনের প্রশ্ন করেছিল। তারপর সেসব কথার জন্যই তারা কুফরীতে লিপ্ত হয়েছিল।[১১৭]

আল্লাহ কোন 'বাহীরা', 'সায়েবা', 'অসীলা' বা হাম নির্ধারণ করেননি[১১৮] কিন্তু এ কাফেররা আল্লাহর ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে এবং তাদের অধিকাংশই জ্ঞানহীন (কারণ তারা এ ধরনের কাল্পনিক বিষয় মেনে নিচ্ছে)।

১১৫. এ আয়াতটি মূল্যবোধ ও মূল্যমানের এমন একটি মানদণ্ড পেশ করে, যা স্থূলদর্শী মানুষের মানদণ্ড থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। স্থূলদর্শীর দৃষ্টিতে পাঁচ টাকার তুলনায় একশ টাকার দাম অবশ্যি অনেক বেশী। কারণ একদিকে পাঁচ টাকা আর একদিকে একশ টাকা। কিন্তু এ আয়াতটি বলছে, যদি আল্লাহর নাফরমানী করে একশ টাকা লাভ করা হয় তাহলে তা নাপাক ও অপবিত্র। অন্যদিকে আল্লাহর হুকুম পালনের আওতায় যদি পাঁচ টাকা লাভ করা হয় তাহলে তা পাক ও পবিত্র। আর অপবিত্রের পরিমাণ যত বেশীই হোক না কেন তা কোন দিন পবিত্রের সমান হতে পারবে না। আবর্জনার একটি স্তূপের তুলনায় এক ফোঁটা আতরের মূল্য ও মর্যাদা অনেক বেশী। এক পুকুর ভর্তি পেশাবের চাইতে সামান্য পরিমাণের পাক পবিত্র পানির মূল্য বেশী। কাজেই একজন যথার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তির অবশ্যি হালাল জিনিস নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত, আপাত দৃষ্টিতে তার পরিমাণ যতই সামান্য হোক না কেন এবং হারামের দিকে কোন অবস্থাতেই হাত বাড়ানো উচিত নয়, বাহ্যত তা যতই বিপুল পরিমাণ ও যতই আড়ম্বরপূর্ণ হোক না কেন।

১১৬. কোন কোন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অদ্ভুত ধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন করতো এ প্রশ্নগুলোর সাথে দীনের কোন প্রয়োজন জড়িত থাকতো না এবং দুনিয়ার কোন প্রয়োজনের সাথেও এর সম্পর্ক থাকতো না। যেমন একবার এক ব্যক্তি প্রকাশ্য জন–সমাবেশে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "আমার আসল পিতা কে?" এমনিভাবে অনেক লোক শরীয়াতের বিধানের ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করতো এবং এভাবে অনর্থক জিজ্ঞাসাবাদ করে এমন সব বিষয় নির্ধারণ করতে চাইতো যা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ও সংগত কারণেই শরীয়াতের বিধানদাতা নিজেই অনির্ধারিত রেখে দিয়েছেন। যেমন কুরআনে সংক্ষেপে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, হজ্জ তোমাদের ওপর ফরয করা হয়েছে। এক ব্যক্তি এ নির্দেশ শোনার সাথে সাথেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, "এ কি প্রত্যেক বছরে ফরয করা হয়েছে? তিনি এর কোন জবাব দিলেন না? ঐ ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করলো। তিনি এবারও চুপ করে রইলেন। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন ঃ "তোমার প্রতি আফসোস, আমার মুখ থেকে হাঁ শব্দ বের হয়ে গেলে তোমাদের জন্য প্রতি বছর হজ্জ করা ফরয হয়ে যাবে। তখন তোমরাই তা মেনে চলতে পারবে না, ফলে নাফরমানি করতে থাকবে।" এ ধরনের সমস্ত অর্থহীন ও অবান্তর প্রশ্ন করা থেকে এ আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও লোকদেরকে বেশী বেশী প্রশ্ন করতে ও অনর্থক প্রত্যেকটি ব্যাপারের গভীরে প্রবেশ করে ঘাটাঘাটি করতে নিষেধ করতেন। এ প্রসংগে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَئٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ اَجْلِ مَسْأَلَتِهِ –

"মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে বড় অপরাধী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে এমন একটি জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন করলো যা লোকদের জন্য হারাম ছিল না, অথচ নিছক তার প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাবাদের কারণে সে জিনিসটি হারাম গণ্য করা হলো।"

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا

"আল্লাহ তোমাদের ওপর কিছু কাজ ফরয করে দিয়েছেন, সেগুলো ত্যাগ করো না। কিছু জিনিস হারাম করে দিয়েছেন, সেগুলোর ধারে কাছে ঘেঁষো না। কিছু সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেগুলো লংঘন করো না। আবার কিছু জিনিসের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন কিন্তু তা ভুলে যাননি, কাজেই সেগুলোর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ো না।"

এ হাদীস দু'টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের সন্ধান দেয়া হয়েছে। শরীয়াতের বিধানদাতা যেসব বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন এবং যেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেননি

অথবা যে বিধানগুলো সংক্ষেপে দিয়েছেন এবং যেগুলোর পরিমাণ, সংখ্যা বা অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করেননি, সেগুলো সংক্ষেপে বা অবিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার কারণ এ নয় যে, বিধানদাতা সেগুলো বর্ণনা করতে ভুলে গিয়েছেন এবং বিস্তারিত বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল কিন্তু তা করেননি বরং এর আসল কারণ হচ্ছে এই যে, বিধানদাতা এ বিষয়গুলোর বিস্তারিত রূপ সংকুচিত ও সীমাবদ্ধ করতে চান না এবং এ বিধানগুলোর মধ্যে মানুষের জন্য প্রশস্ততা ও ব্যাপকতা রাখতে চান। এখন যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে অযথা প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপন করে তার বিস্তারিত রূপ, নির্দিষ্ট বিষয়াবলী ও সীমাবদ্ধতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে এবং বিধানদাতার বক্তব্য থেকে যদি বিষয়গুলো কোনক্রমে প্রকাশিত না হয়, তাহলে আন্দাজ–অনুমান করে কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে কোন না কোন প্রকারে সংক্ষিপ্ত বিষয়কে বিস্তারিত, ব্যাপককে সীমাবদ্ধ এবং অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্ট করেই ক্ষান্ত হয়, তবে সে আসলে মুসলমানদের বিরাট বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। কারণ অতিপ্রাকৃতিক বিষয়সমূহ যত বেশী বিস্তারিত আকারে সামনে আসবে ইমানদারদের জন্য জটিলতা তত বেশী বেড়ে যাবে। আর আল্লাহর নির্দেশ ও বিধানের সাথে যত বেশী শর্ত জড়িত হবে এবং এগুলোকে যত বেশী সীমাবদ্ধ করে দেয়া হবে আনুগত্যকারীদের জন্য নির্দেশ অমান্য করার সম্ভাবনা তত বেশী দেখা দেবে।

১১৭. অর্থাৎ প্রথমে তারা নিজেরাই আকীদা বিশ্বাস ও বিধি বিধানের অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এবং এক একটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে নিজেদের জন্য বিস্তারিত অবয়ব ও শর্তাবলীর একটি জাল তৈরী করে। তারপর নিজেরাই সেই জালে জড়িত হয়ে আকীদাগত গোমরাহী ও নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। একটি দল বলতে এখানে ইহুদীদের কথা বুঝানো হয়েছে। কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সতর্ক বাণী সত্ত্বেও মুসলমানরা তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলার ব্যাপারে যে কোন প্রকার প্রচেষ্টা চালাতে কসূর করেনি।

১১৮. আমাদের দেশে যেমন গরু, ষাঁড় ও ছাগল আল্লাহর বা ভগবানের নামে অথবা কোন দেবদেবী, ঠাকুর, বা পীর–আউলিয়ার নামে ছেড়ে দেয়া হয়, তাদেরকে ভারবহন বা অন্য কোন কাজে লাগানো হয় না এবং তাদেরকে যবেহ করা বা তাদের সাহায্যে কোন প্রকার ফায়দা হাসিল করা হারাম মনে করা হয়, ঠিক তেমনি জাহেলী যুগে আরববাসীরাও পূণ্য কাজের নিদর্শন হিসেবে বিভিন্ন পশু ছেড়ে দিতো। এ ধরনের ছেড়ে দেয়া পশুদের আলাদা আলাদা নামে আখ্যায়িত করা হতো। যেমন ঃ

বাহীরা ঃ এমন ধরনের উষ্ট্রীকে বলা হতো, যে পাঁচবার শাবক প্রসব করেছে এবং শেষবারের শাবকটি হয়েছে 'নর'। এ উষ্ট্রীর কান চিরে দিয়ে তাকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে ছেড়ে দেয়া হতো। অতপর কেউ কখনো তাকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করতো না। কেউ তার দুধও পান করতো না। কেউ তাকে যবেহও করতো না। এমনকি তার গায়ের পশমও কেউ কাটতো না। সে ইচ্ছেমতো যে কোন ক্ষেতে চরে বেড়াতো, যে কোন চারণভূমিতে ঘাস খেতো এবং যে কোন ঘাটে গিয়ে পানি পান করতো।

সায়েবা ঃ এমন উট বা উষ্ট্রীকে বলা হয়, যাকে কোন মানত পুরো হবার, কোন রোগ থেকে মুক্তি লাভ করার অথবা কোন বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিদর্শন স্বরূপ স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হতো। তাছাড়া সায়েবা এমন উটনীকেও

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ۭ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاۗؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔـا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ۝١٠٤ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۭ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝١٠٥

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো সেই বিধানের দিকে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং এসো রসূলের দিকে, তখন তারা জবাব দেয়, আমাদের বাপ–দাদাকে যে পথে পেয়েছি সে পথই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তারা কি নিজেদের বাপ–দাদারই অনুসরণ করে চলবে, যদিও তারা কিছুই জানতো না এবং সঠিক পথও তাদের জানা ছিল না?

হে ঈমানদারগণ। নিজেদের কথা চিন্তা করো, অন্য কারোর গোমরাহীতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই যদি তোমরা নিজেরা সত্য সঠিক পথে থাকো।[১১৯] *তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে। তখন তোমরা কি করছিলে তা তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন।*

বলা হতো, যে দশবার বাচ্চা প্রসব করেছে এবং প্রত্যেকটি বাচ্চা হয়েছে স্ত্রী জাতীয়। তাকেও স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হতো।

অসীলা ঃ ছাগলের প্রথম বাচ্চাটা 'পাঁঠা' হলে তাকে উপাস্য দেবতাদের নামে যবেহ করে দেয়া হতো। আর যদি প্রথম বাচ্চাটা হতো 'পাঁঠী' তাহলে তাকে নিজের জন্য রেখে দেয়া হতো। কিন্তু একই সঙ্গে যদি পাঁঠা ও পাঁঠী বাচ্চা হতো তাহলে পাঁঠাটিকে যবেহ না করে দেবতাদের নামে ছেড়ে দেয়া হতো এবং তাকে বলা হতো অসীলা।

হাম ঃ কোন উটের পৌত্র যদি সওয়ারী বহন করার যোগ্যতা অর্জন করতো তাহলে বুড়ো উটটিকে স্বাধীন ছেড়ে দেয়া হতো। তাছাড়া কোন উটের ঔরসে দশটি সন্তান জন্ম নেবার পর তাকেও স্বাধীন করে দেয়া হতো।

১১৯. অর্থাৎ অমুক কি করছে, অমুকের আকীদার মধ্যে কি গলদ আছে এবং অমুকের কাজে কোন্ কোন্ ধরনের দোষ–ত্রুটি আছে, সবসময় এসব দেখার পরিবর্তে মানুষের

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের কারোর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় এবং সে অসিয়ত করতে থাকে তখন তার জন্য সাক্ষ নির্ধারণ করার নিয়ম হচ্ছে এই যে, তোমাদের সমাজ থেকে দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ[১২০] ব্যক্তিকে সাক্ষী করতে হবে। অথবা যদি তোমরা সফরের অবস্থায় থাকো এবং সেখানে তোমাদের ওপর মৃত্যু রূপ বিপদ উপস্থিত হয় তাহলে দু'জন অমুসলিমকেই সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করে নেবে।[১২১] তারপর কোন সন্দেহ দেখা দিলে নামাযের পরে উভয় সাক্ষীকে (মসজিদে) অপেক্ষমান রাখবে এবং তারা আল্লাহর কসম খেয়ে বলবে ঃ "আমরা কোন ব্যক্তি স্বার্থের বিনিময়ে সাক্ষ বিক্রি করবো না, সে কোন আত্মীয় হলেও (আমরা তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবো না) এবং আল্লাহর ওয়াস্তের সাক্ষকে আমরা গোপনও করবো না। এমনটি করলে আমরা গুনাহগারদের অন্তরভুক্ত হবো।"

দেখা উচিত, সে নিজে কি করছে। তার নিজের চিন্তাধারার এবং নিজের চরিত্র ও কার্যাবলীর কথা চিন্তা করা উচিত সেগুলো যেন খারাপ ও বরবাদ না হয়ে যায়। কোন ব্যক্তি নিজে যদি আল্লাহর আনুগত্য করতে থাকে, তার ওপর আল্লাহ ও বান্দার যেসব অধিকার আরোপিত হয় সেগুলো আদায় করতে থাকে এবং সততা ও সঠিক পথ অবলম্বন করার দাবী পূর্ণ করে যেতে থাকে এবং এই সংগে সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা তার কর্মসূচীর অপরিহার্য অংশরূপে বিবেচিত হতে থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবে অন্য কোন ব্যক্তির গোমরাহী ও বক্র পথে চলা তার জন্য কোন ক্ষতির কারণ হতে পারে না।

তাই বলে মানুষ কেবলমাত্র নিজের নাজাত ও মুক্তির কথা ভাববে, অন্যের সংশোধন করার কথা ভাববে না, এটা নিশ্চয়ই এ আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এ ভুল ধারণার প্রতিবাদ করে এক ভাষণে বলেন ঃ "হে লোকেরা!

فَاِنْ عُثِرَ عَلٰۤى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّاۤ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَاۤ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَاۤ ۖ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٧﴾ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَاۤ اَوْ يَخَافُوْۤا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٨﴾

কিন্তু যদি একথা জানা যায় যে, তারা দু'জন নিজেদেরকে গোনাহে লিপ্ত করেছে, তাহলে যাদের স্বার্থহানি ঘটেছে তাদের মধ্য থেকে সাক্ষ দেবার ব্যাপারে আরো বেশী যোগ্যতা সম্পন্ন দু'জন লোক তাদের স্থলবর্তী হবে এবং তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে "আমাদের সাক্ষ তাদের সাক্ষের চাইতে আরো বেশী ন্যায়নিষ্ঠ এবং নিজেদের সাক্ষের ব্যাপারে আমরা কোন বাড়াবাড়ি করিনি। এমনটি করলে আমরা জালেমদের অন্তরভুক্ত হবো।" এ পদ্ধতিতে বেশী আশা করা যায়, লোকেরা সঠিক সাক্ষ দেবে অথবা কমপক্ষে এতটুকু ভয় করবে যে, তাদের কসমের পর অন্য কসমের সাহায্যে তাদের বক্তব্য খণ্ডন করা হতে পারে। আল্লাহকে ভয় করো এবং শোনো। আল্লাহ নাফরমানদেরকে তাঁর পথনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত করেন।

তোমরা এ আয়াতটি পড়ে থাকো এবং এর ভুল ব্যাখ্যা করে থাকো। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি, যখন লোকদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যে, তারা অসৎকাজ দেখবে কিন্তু তা পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে না, জালেমকে জুলুম করতে দেখবে কিন্তু তার হাত টেনে ধরবে না তখন অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাঁর আযাব সকলের ওপর চাপিয়ে দেবেন। আল্লাহর কসম! তোমরা লোকদেরকে ভাল কাজ করার হুকুম দাও এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখো, নয়তো আল্লাহ তোমাদের ওপর এমন সব লোককে চাপিয়ে দেবেন যারা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ এবং তারা তোমাদেরকে ভীষণ কষ্ট দেবে। তখন তোমাদের সৎলোকেরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে কিন্তু তা কবুল হবে না।

১২০. অর্থাৎ দীনদার, সত্যনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য।

১২১. এ থেকে জানা যায়, মুসলমানদের ব্যাপারে অমুসলিমদেরকে কেবলমাত্র তখনই সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে যখন কোন মুসলমান সাক্ষী পাওয়া যায় না।

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ۖ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ۖ اِنَّكَ
اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١٠٩﴾ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ
عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۙ تُكَلِّمُ النَّاسَ
فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ
وَالْاِنْجِيْلَ ۚ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا
فَتَكُوْنُ طَيْرًا ۢ بِاِذْنِيْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ۚ

১৫ রুকূ'

যেদিন[১২২] আল্লাহ সমস্ত রসূলকে একত্র করে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের কী জবাব দেয়া হয়েছে?[১২৩] তারা আরয করবে, আমরা কিছুই জানিনা,[১২৪] গোপন সত্যসমূহের জ্ঞান একমাত্র আপনারই আছে। তারপর সে সময়ের কথা চিন্তা করো যখন আল্লাহ বলবেন,[১২৫] "হে মারয়ামের পুত্র ঈসা। আমার সে নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাকে ও তোমার মাকে দিয়েছিলাম। আমি পাক–পবিত্র রূহের মাধ্যমে তোমাকে সাহায্য করেছিলাম। তুমি দোলনায় থেকেও লোকদের সাথে কথা বলেছিলে এবং পরিণত বয়সে পৌঁছেও। আমি তোমাকে কিতাব ও হিকমত এবং তাওরাত ও ইনজীলের শিক্ষা দিয়েছিলাম। তুমি আমার হুকুমে পাখির আকৃতির মাটির পুতুল তৈরী করে তাতে ফুঁক দিতে এবং আমার হুকুমে তা পাখি হয়ে যেতো। তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আমার হুকুমে নিরাময় করে দিতে।

১২২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন।

১২৩. অর্থাৎ দুনিয়াবাসীকে তোমরা যে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলে তারা তার কী জবাব দিয়েছে?

১২৪. অর্থাৎ আমাদের জীবনে আমরা যে সীমাবদ্ধ বাহ্যিক জবাবটুকু পেয়েছি বলে অনুভব করেছি কেবলমাত্র সেটুকুই আমরা জানি। আর আসলে আমাদের দাওয়াতের কোথায় কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং কোন্ আকৃতিতে তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তার সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান একমাত্র আপনার ছাড়া আর কারোর পক্ষে লাভ করা সম্ভবপর নয়।

১২৫. প্রথম প্রশ্নটি সকল রসূলকে সামগ্রিকভাবে করা হবে। তারপর প্রত্যেক রসূলের কাছ থেকে পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষ নেয়া হবে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে একথাটি

وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِإِذْنِىْ ۚ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِىٓ إِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ
إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ إِنْ هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ
مُّبِيْنٌ ﴿١١٠﴾ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيّٖنَ أَنْ اٰمِنُوْا بِىْ وَبِرَسُوْلِىْ ۚ قَالُوْٓا
اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ﴿١١١﴾ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ
هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ أَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ۗ قَالَ اتَّقُوا
اللّٰهَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾

এবং মৃতদেরকে আমার হুকুমে বের করে আনতে।[১২৬] তারপর যখন তুমি সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে বনী ইসরাঈলের কাছে পৌঁছলে এবং তাদের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকারকারী ছিল তারা বললো, এ নিশানীগুলো যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন আমিই তোমাকে তাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম। আর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে ইংগিত করেছিলাম, আমার ও আমার রসূলের প্রতি ঈমান আনো, তারা বলেছিল, আমরা ঈমান আনলাম এবং সক্ষী থাকো আমরা মুসলিম।"[১২৭] — (হাওয়ারীদের[১২৮] প্রসংগে) এ ঘটনাটিও যেন মনে থাকে, যখন হাওয়ারীরা বলেছিল, হে মারয়াম পুত্র ঈসা! আপনার রব কি আমাদের জন্য আকাশ থেকে একটি খাবার পরিপূর্ণ খাঞ্চা নাযিল করতে পারেন? ঈসা বলেছিল, আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।

সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখিত হয়েছে। এ প্রসংগে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে যে প্রশ্ন করা হবে তা এখানে বিশেষভাবে উদ্ধৃত হয়েছে।

১২৬. অর্থাৎ মৃত্যুর অবস্থা থেকে বের করে জীবনের অবস্থায় আনতেন।

১২৭. অর্থাৎ হাওয়ারীদের তোমার প্রতি ঈমান আনাও ছিল আমার অনুগ্রহ ও সুযোগ দানেরই ফল। নয়তো যে জনবসতি তোমার দাওয়াতকে মিথ্যা বলে ঘোষণা দিয়েছিল সেখান থেকে নিজের শক্তির জোরে তোমাকে সত্য বলে স্বীকার করে, এমন একজন লোক বের করে আনার ক্ষমতাও তোমার ছিল না। প্রসংগত এখানে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, হাওয়ারীদের আসল ধর্ম ছিল ইসলাম, খৃস্টবাদ নয়।

১২৮. হাওয়ারীদের কথা আগে বলা হয়েছিল তাই এখানে এ আলোচনা প্রসংগের মধ্যেই হাওয়ারীদের সম্পর্কে আর একটি ঘটনার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ থেকে

قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا
وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا
أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً
مِّنكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٤﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ
فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا
مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾

তারা বলেছিল, আমরা কেবল এতটুকুই চাই যে, আমরা সেই খাঞ্চা থেকে খাবার খাবো, আমাদের মন নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে এবং আমরা জেনে নেবো যে, আপনি যা কিছু বলেছেন তা সবই সত্য এবং আমরা তার সাক্ষী হয়ে যাবো। এ কথায় ঈসা ইবনে মারয়াম দোয়া করেছিল, "হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! আমাদের ওপর আকাশ থেকে একটি খাদ্য ভরা খাঞ্চা নাযিল করো, যা আমাদের জন্য এবং আমাদের আগের–পিছের সবার জন্য আনন্দের উপলক্ষ হিসেবে গণ্য হবে এবং তোমার পক্ষ থেকে হবে একটি নিদর্শন। আমাদের জীবিকা দান করো এবং তুমি সর্বোত্তম জীবিকা দানকারী।" আল্লাহ জবাব দিয়েছিলেন, "আমি তা তোমাদের ওপর নাযিল করবো।[১২৯] কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কুফরী করবে তাকে আমি এমন শাস্তি দেবো, যা দুনিয়ায় আর কাউকে দেইনি।"

একথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যেসব শাগরিদ তাঁর কাছ থেকে সরাসরি দীক্ষা লাভ করেছিলেন তারা হযরত মসীহ্‌কে একজন মানুষ এবং নিছক আল্লাহর একজন বান্দা মনে করতেন। তাদের পরিচালক ও পথপ্রদর্শক যে আল্লাহ বা আল্লাহর সাথে শরীক অথবা আল্লাহর পুত্র–এই ধরনের কোন কথা মনে করা তাদের চিন্তা ও কল্পনার বাইরে ছিল। তাছাড়া হযরত মসীহ নিজেও তাদের সামনে নিজেকে একজন অক্ষম বান্দা হিসেবে পেশ করেছিলেন।

এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে, কিয়ামতের দিনে যে কথাবার্তা হবে সেখানে এ প্রাসংগিক বক্তব্যটির স্থান কোথায়? এর জবাবে বলা যায়, কিয়ামতের দিনে যে কথাবার্তা হবে তার সাথে এ প্রাসংগিক বক্তব্যের সম্পর্ক নেই। বরং এর সম্পর্ক হচ্ছে দুনিয়ায় আগামভাবে যেসব কথাবার্তা হচ্ছে তার সাথে। কিয়ামতের দিনে যেসব কথাবার্তা হবে এখানে তার আলোচনা করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে, বর্তমান জীবনে খৃষ্টানরা যেন তা থেকে

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾

১৬ রুকূ’

(মোটকথা এসব অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে) আল্লাহ যখন বলবেন, "হে মারয়াম পুত্র ঈসা! তুমি কি লোকদের বলেছিলে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করো?"[১৩০] *তখন সে জবাব দেবে, "সুবহানাল্লাহ! যে কথা বলার কোন অধিকার আমার ছিল না সে ধরনের কোন কথা বলা আমার জন্য ছিল অশোভন ও অসংগত। যদি আমি এমন কথা বলতাম তাহলে আপনি নিশ্চয়ই তা জানতে পারতেন, আমার মনে যা আছে আপনি জানেন কিন্তু আপনার মনে যা আছে আমি তা জানি না, আপনি তো সমস্ত গোপন সত্যের জ্ঞান রাখেন। আপনি যা হুকুম দিয়েছিলেন তার বাইরে আমি তাদেরকে আর কিছুই বলিনি। তা হচ্ছে ঃ আল্লাহর বন্দেগী করো যিনি আমারও রব এবং তোমাদেরও। আমি যতক্ষণ তাদের মধ্যে ছিলাম ততক্ষণ আমি ছিলাম তাদের তদারককারী ও সংরক্ষক। যখন আপনি আমাকে ফিরিয়ে নিয়েছেন তখন আপনিই ছিলেন তাদের তত্বাবধায়ক ও সংরক্ষক। আর আপনি তো সমস্ত জিনিসের তত্বাবধায়ক ও সংরক্ষক।*

শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সত্য–সঠিক পথ অবলম্বন করে। কাজেই এ কথাবার্তার মাঝখানে একটি প্রাসংগিক বক্তব্য হিসেবে হাওয়ারীদের ঘটনাটির উল্লেখ মোটেই অবান্তর নয়।

১২৯. খাদ্য সম্ভার পরিপূর্ণ এ খাঞ্চা বাস্তবে নাযিল করা হয়েছিল কিনা, এ ব্যাপারে কুরআন মজীদ নীরব। অন্য কোন নির্ভরযোগ্য উপায়েও এ প্রশ্নটির জবাব পাওয়া যায় না।

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

এখন যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন তাহলে তারা তো আপনার বান্দা আর যদি মাফ করে দেন তাহলে আপনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।" তখন আল্লাহ বলবেন, "এটি এমন একটি দিন যেদিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যতা উপকৃত করে। তাদের জন্য রয়েছে এমন বাগান যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এখানে তারা থাকবে চিরকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।"

পৃথিবী, আকাশসমূহ ও সমগ্র জাতির ওপর রাজত্ব আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত এবং তিনি সবকিছুর ওপর শক্তিশালী।

হয়তো এটা নাযিল হয়েছিল। আবার হয়তো এমনও হতে পারে যে, পরবর্তী পর্যায়ে মারাত্মক ধরনের হুমকিটি শুনে হাওয়ারীগণ নিজেদের আবেদন প্রত্যাহার করেছেন।

১৩০. খৃষ্টানরা আল্লাহর সাথে কেবলমাত্র ঈসা ও রূহুল কুদুস তথা পবিত্র আত্মাকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে ক্ষান্ত হয়নি। এ সংগে তারা ঈসার মাতা হযরত মারয়ামকেও (আ) এক স্বতন্ত্র ইলাহে পরিণত করেছে। হযরত মারয়ামের ইলাহ হবার বা তার দেবত্ব বা অতিমানবিকতা সম্পর্কিত কোন ইংগিতও বাইবেলে নেই। হযরত ঈসার (আ) পরে প্রথম তিনশ বছর পর্যন্ত খৃষ্টবাদী জগত এ ধারণার সাথে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষের দিকে ইসকানদারিয়ার কিছু খৃষ্টান পণ্ডিত হযরত মারয়ামের জন্য সর্বপ্রথম 'উম্মুল্লাহ' বা 'আল্লাহর মাতা' শব্দ ব্যবহার করেন। এরপর ধীরে ধীরে মারয়ামের ইলাহ হবার আকীদা এবং মারয়াম বন্দনা ও মারয়াম পূজার পদ্ধতি খৃষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত হতে থাকে। কিন্তু প্রথম প্রথম চার্চ এটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মেনে নিতে প্রস্তুত হয়নি। বরং মারয়াম পূজারীদেরকে ভ্রান্ত আকীদা সম্পন্ন বলে অভিহিত করতো। তারপর যখন মসীহের একক সত্তার মধ্যে দু'টি স্বতন্ত্র ও পৃথক সত্তার সমাবেশ ঘটেছে এ মর্মে প্রচারিত নাসতূরিয়াসের আকীদা নিয়ে সমগ্র খৃষ্টীয় জগতে বিতর্ক ও আলোচনা–সমালোচনার ঝড় উঠলো। তখন এর মীমাংসা করার জন্য ৪৩১ খৃষ্টাব্দে

আফসোস নগরে একটি কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো। এ কাউন্সিলে সর্বপ্রথম গীর্জার সরকারী ভাষায় হযরত মারয়ামের জন্য 'আল্লাহর মাতা' শব্দ ব্যবহার করা হলো। এর ফলে এতদিন মারয়াম পূজার যে রোগ গীর্জার বাইরে প্রসার লাভ করছিল এখন তা গীর্জার মধ্যেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। এমন কি কুরআন নাযিলের যুগে পৌঁছতে পৌঁছতে হযরত মারয়াম এত বড় দেবীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন যার ফলে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা তিনজনই তার সামনে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিলেন। চার্চের বিভিন্ন স্থানে তাঁর মূর্তি স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। তার সামনে ইবাদাতের সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করা হতো। তার কাছে প্রার্থনা করা হতো। তিনিই ছিলেন ফরিয়াদ শ্রবণকারী, অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণকারী, সংকট থেকে উদ্ধারকারী এবং অসহায়ের সহায় ও পৃষ্ঠপোষক। একজন নিষ্ঠাবান খৃস্ট বিশ্বাসীর জন্য সবচেয়ে বড় ভরসার স্থল ছিল আল্লাহর মাতা'র সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করা। রোম সম্রাট জাষ্টিনিন তাঁর একটি আইনের ভূমিকায় হযরত মারয়ামকে তার রাজত্বের সংরক্ষক ও সাহায্যকারী গণ্য করেছেন। তাঁর প্রখ্যাত সেনাপতি নারসিস যুদ্ধ ক্ষেত্রে হযরত মারয়ামের কাছ থেকে নির্দেশনা চাইতেন। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন রোম সম্রাট হিরাকেল তার পতাকায় আল্লাহর মাতার ছবি এঁকে রেখেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এ ছবির বদৌলতে এ পতাকা কোনদিন ধূলায় লুন্ঠিত হবে না। যদিও পরবর্তী শতাব্দীগুলোয় সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে প্রটেস্ট্যান্ট খৃষ্টানরা মারয়াম পূজার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানায় কিন্তু রোমান ক্যাথলিক গীর্জাগুলো এখনো তাদের আগের পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে।

আল আন'আম

৬

নামকরণ

এ সূরার ১৬ ও ১৭ রুকূ'তে কোন কোন আন'আমের (গৃহপালিত পশু) হারাম হওয়া এবং কোন কোনটির হালাল হওয়া সম্পর্কিত আরববাসীদের কাল্পনিক ও কুসংস্কারমূলক ধারণা বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে এ সূরাকে আল আন'আম নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

ইবনে আব্বাসের বর্ণনা মতে এ সম্পূর্ণ সূরাটি একই সাথে মক্কায় নাযিল হয়েছিল। হযরত মু'আয ইবনে জাবালের চাচাত বোন হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ বলেন, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটনীর পিঠে সওয়ার থাকা অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হতে থাকে। তখন আমি তাঁর উটনীর লাগাম ধরে ছিলাম। বোঝার ভারে উটনীর অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছিল যেন মনে হচ্ছিল এই বুঝি তার হাড়গোড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।" হাদীসে একথাও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যে রাতে এ সূরাটি নাযিল হয় সে রাতেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে লিপিবদ্ধও করান।

এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে সুস্পষ্টভাবে মনে হয়, এ সূরাটি মক্কী যুগের শেষের দিকে নাযিল হয়ে থাকবে। হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদের রেওয়ায়াতটিও একথার সত্যতা প্রমাণ করে। কারণ তিনি ছিলেন আনসারদের অন্তরভুক্ত। হিজরাতের পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। যদি ইসলাম গ্রহণ করার আগে তিনি নিছক ভক্তি–শ্রদ্ধার কারণে মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই হয়ে থাকবেন তাঁর মক্কায় অবস্থানের শেষ বছরে। এর আগে ইয়াসরেববাসীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক এত বেশী ঘনিষ্ঠ হয়নি যার ফলে তাদের একটি মহিলা তার খেদমতে হাযির হয়ে যেতে পারে।

নাযিল হওয়ার উপলক্ষ

সূরাটির নাযিল হওয়ার সময়–কাল নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর আমরা সহজেই এর প্রেক্ষাপটের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি। আল্লাহর রসূল যখন মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেবার কাজ শুরু করেছিলেন তারপর থেকে বারোটি বছর অতীত হয়ে গিয়েছিল। কুরাইশদের প্রতিবন্ধকতা, জুলুম ও নির্যাতন চরমে পৌছে গিয়েছিল। ইসলাম গ্রহণকারীদের একটি অংশ তাদের অত্যাচার নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে দেশ ত্যাগ করেছিল। তারা হাবশায়

(ইথিওপিয়া) অবস্থান করছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্য–সমর্থন করার জন্য আবু তালিব বা হযরত খাদীজা (রা) কেউই বেঁচে ছিলেন না। ফলে সব রকমের পার্থিব সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি কঠোর প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে ইসলাম প্রচার ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। তাঁর ইসলাম প্রচারের প্রভাবে মক্কায় ও চারপাশের গোত্রীয় উপজাতিদের মধ্য থেকে সৎলোকেরা একের পর এক ইসলাম গ্রহণ করে চলেছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমগ্র জাতি ইসলামকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের গোঁয়ার্তুমি অব্যাহত রেখেছিল। কোথাও কোন ব্যক্তি ইসলামের দিকে সামান্যতম ঝোঁক প্রকাশ করলেও তার পেছনে ধাওয়া করা হতো। তাকে তিরস্কার, গালিগালাজ করা হতো। শারীরিক দুর্ভোগ ও অর্থনৈতিক, সামাজিক নিপীড়নে তাকে জর্জরিত করা হতো। এ অন্ধকার বিভীষিকাময় পরিবেশে একমাত্র ইয়াসরেবের দিক থেকে একটি হালকা আশার আলো দেখা দিয়েছিল। সেখানকার আওস ও খাযরাজ গোত্রের প্রভাবশালী লোকেরা এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাই'আত করে গিয়েছিলেন। সেখানে কোন প্রকার আভ্যন্তরীণ বাধা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হয়েই ইসলাম প্রসার লাভ করতে শুরু করেছিল। কিন্তু এ ছোট্ট একটি প্রারম্ভিক বিন্দুর মধ্যে ভবিষ্যতের যে বিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল তা কোন স্থূলদর্শীর দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়া সম্ভবপর ছিল না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হতো, ইসলাম একটি দুর্বল আন্দোলন। এর পেছনে কোন বৈষয়িক ও বস্তুগত শক্তি নেই। এর আহবায়কের পেছনে তার পরিবারের ও বংশের দুর্বল ও ক্ষীণ সাহায্য–সমর্থন ছাড়া আর কিছুই নেই। মুষ্টিমেয় অসহায় ও বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করেছে। যেন মনে হয় নিজেদের জাতির বিশ্বাস, মত ও পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে তারা সমাজ থেকে এমনভাবে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে যেমন গাছের মরা পাতা মাটির ওপর ঝরে পড়ে।

আলোচ্য বিষয়

এহেন পটভূমিতে এ ভাষণটি নাযিল হয়। এ হিসেবে এখানে আলোচ্য বিষয়গুলোকে প্রধান সাতটি শিরোনামে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

এক ঃ শিরককে খণ্ডন করা ও তাওহীদ বিশ্বাসের দিকে আহবান জানানো।

দুই ঃ আখেরাত বিশ্বাসের প্রচার এবং এ দুনিয়ার জীবনটাই সবকিছু এ ভুল চিন্তার অপনোদন।

তিন ঃ জাহেলীয়াতের যে সমস্ত ভ্রান্ত কাল্পনিক বিশ্বাস ও কুসংস্কারে লোকেরা ডুবে ছিল তার প্রতিবাদ করা।

চার ঃ যেসব বড় বড় নৈতিক বিধানের ভিত্তিতে ইসলাম তার সমাজ কাঠামো গড়ে তুলতে চায় সেগুলো শিক্ষা দেয়া।

পাঁচ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত লোকদের বিভিন্ন আপত্তি ও প্রশ্নের জবাব।

ছয় ঃ সুদীর্ঘ প্রচেষ্টা ও সাধনা সত্ত্বেও দাওয়াত ফলপ্রসূ না হবার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম ও সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে যে অস্থিরতা ও হতাশাজনক অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছিল সে জন্য তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়া।

সাত ঃ অস্বীকারকারী ও বিরোধী পক্ষকে তাদের গাফলতি, বিহ্বলতা ও অজ্ঞানতা প্রসূত আত্মহত্যার কারণে উপদেশ দেয়া, ভয় দেখানো ও সতর্ক করা।

কিন্তু এখানে যে ভাষণ দেয়া হয়েছে তাতে এক একটি শিরোনামের আওতায় আলাদা আলাদাভাবে একই জায়গায় পূর্ণাঙ্গরূপে আলোচনা করার রীতি অনুসৃত হয়নি। বরং ভাষণ এগিয়ে চলেছে নদীর স্রোতের মতো মুক্ত অবাধ বেগে আর তার মাঝখানে এ শিরোনামগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ভেসে উঠেছে এবং প্রতিবারেই নতুন নতুন ভংগীতে এর ওপর আলোচনা করা হয়েছে।

মক্কী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়

এখানে পাঠকের সামনে সর্বপ্রথম একটি বিস্তারিত মক্কী সূরা আসছে। তাই এ প্রসংগে মক্কী সূরাগুলোর ঐতিহাসিক পটভূমির একটি পূর্ণাঙ্গ বিশদ আলোচনা করে নেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। এ ধরনের আলোচনার পরে পরবর্তী পর্যায়ে যেসব মক্কী সূরা আসবে এবং তাদের ব্যাখ্যা প্রসংগে আমি যেসব কথা বলবো সেগুলো অনুধাবন করা সহজ হবে।

মাদানী সূরাগুলোর মধ্যে প্রায় সবগুলোর নাযিলের সময়কাল আমাদের জানা আছে অথবা সামান্য চেষ্টা–পরিশ্রম করলে তার সময়–কাল চিহ্নিত করে নেয়া যেতে পারে। এমনকি সেসব সূরার বহু সংখ্যক আয়াতের পর্যন্ত নাযিলের উপলক্ষ ও কারণ নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতে পাওয়া যায়। কিন্তু মক্কী সূরাগুলো সম্পর্কে এতটা বিস্তারিত তথ্য–উপকরণ আমাদের কাছে নেই। খুব কম সংখ্যক সূরা এমন রয়েছে যার নাযিলের সময়কাল ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। কারণ মাদানী যুগের তুলনায় মক্কী যুগের ইতিহাসে খুটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা কম। তাই মক্কী সূরাগুলোর ব্যাপারে আমাদের ঐতিহাসিক সাক্ষ–প্রমাণের পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সূরার বিষয়বস্তু, আলোচ্য বিষয় ও বর্ণনা পদ্ধতি এবং প্রত্যেক সূরার নাযিলের পটভূমি সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট ইশারা–ইংগিতের আকারে যে আভ্যন্তরীণ সাক্ষ–প্রমাণ রয়েছে তার ওপরই নির্ভর করতে হয়। একথা সুস্পষ্ট যে, এ ধরনের সাক্ষ–প্রমাণের সাহায্যে প্রত্যেকটি সূরা ও আয়াত সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অংগুলি নির্দেশ করে একথা বলা যেতে পারে না যে, এটি অমুক তারিখে অমুক বছর বা অমুক উপলক্ষে নাযিল হয়েছে। সর্বাধিক নির্ভুলভাবে বড় জোর এতটুকু বলা যেতে পারে যে, একদিকে আমরা মক্কী সূরাগুলোর ভেতরের সাক্ষ–প্রমাণ এবং অন্যদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের ইতিহাস পাশাপাশি রেখে এবং উভয়ের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে কোন্ সূরা কোন্ পর্যায়ের সাথে সম্পর্কিত ছিল সে সম্পর্কে একটি মত গঠন করতে পারি৷

গবেষণা ও অনুসন্ধানের এ পদ্ধতি অনুসরণ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা ইলামী দাওয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে একে চারটি প্রধান প্রধান ও উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে বিভক্ত দেখতে পাই ঃ

প্রথম পর্যায় ঃ নবুওয়াত প্রাপ্তির সূচনা থেকে শুরু করে নবুওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণা পর্যন্ত প্রায় তিন বছর। এ সময় গোপনে দাওয়াত দেবার কাজ চলে। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়। মক্কার সাধারণ লোকেরা এ সম্পর্কে তখনো কিছুই জানতো না।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ নবুওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণার পর থেকে জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন ও উৎপীড়নের সূচনাকাল পর্যন্ত প্রায় দু' বছর। এ সময় প্রথমে বিরোধিতা শুরু হয়। তারপর তা প্রতিরোধের রূপ নেয়। এরপর ঠাট্টা, বিদ্রূপ, উপহাস, দোষারোপ, গালিগালাজ, মিথ্যা প্রচারণা এবং জোটবদ্ধভাবে বিরোধিতা করার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এমনকি শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের ওপর জুলুম-নির্যাতন শুরু হয়ে যায়। যারা তুলনামূলকভাবে বেশী গরীব, দুর্বল ও আত্মীয় বান্ধবহীন ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে তারাই হয় সর্বাধিক নির্যাতনের শিকার।

তৃতীয় পর্যায় ঃ চরম উৎপীড়নের সূচনা অর্থাৎ নবুওয়াতের ৫ম বছর থেকে নিয়ে আবু তালিব ও হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তিকাল তথা ১০ম বছর পর্যন্ত পাঁচ বছর সময়-কাল পর্যন্ত এ পর্যায়টি বিস্তৃত। এ সময়ে বিরোধিতা চরম আকার ধারণ করতে থাকে। মক্কার কাফেরদের জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক মুসলমান আবিসিনিয়া হিজরত করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও অবশিষ্ট মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কট করা হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সমর্থক ও সংগী-সাথীদের নিয়ে আবু তালিব গিরিবর্তে অবরুদ্ধ হন।

চতুর্থ পর্যায় ঃ নবুওয়াতের দশম বছর থেকে ত্রয়োদশ বছর পর্যন্ত প্রায় তিন বছর। এটি ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদের জন্য সবচেয়ে কঠিন ও বিপজ্জনক সময়। তাঁর জন্য মক্কায় জীবন যাপন করা কঠিন করে দেয়া হয়েছিল। তায়েফে গেলেন। সেখানেও আশ্রয় পেলেন না। হজ্জের সময়ে আরবের প্রতিটি গোত্রকে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ ও তাঁকে সাহায্য করার আবেদন জানালেন। কিন্তু কোথাও সাড়া পেলেন না। এদিকে মক্কাবাসীরা তাঁকে হত্যা করার, বন্দী করার বা নগর থেকে বিতাড়িত করার জন্য সলা-পরামর্শ করেই চলছিল। অবশেষে আল্লাহর অপার অনুগ্রহে আনসারদের হৃদয় দুয়ার ইসলামের জন্য খুলে গেলো। তাদের আহবানে তিনি মদীনায় হিজরত করলেন।

এ সকল পর্যায়ে বিভিন্ন সময় কুরআন মজীদের যে সমস্ত আয়াত নাযিল হয় সেগুলোর প্রত্যেকটি তাদের বিষয়বস্তু ও বর্ণনা রীতির দিক দিয়ে পরস্পর থেকে বিভিন্ন। এক পর্যায়ের আয়াতের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী অন্য পর্যায়ের আয়াতের থেকে ভিন্নধর্মী। এদের বহু স্থানে এমন সব ইশারা-ইংগিত পাওয়া যায়, যা থেকে তাদের পটভূমির অবস্থা ও ঘটনাবলীর ওপর সুস্পষ্ট আলোকপাত হয়। প্রত্যেক পর্যায়ের বৈশিষ্টের প্রভাব সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে নাযিলকৃত বাণীর মধ্যে বিপুলভাবে লক্ষণীয়। এসব আলামতের ওপর নির্ভর করে আমি পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত প্রত্যেকটি মক্কী সূরার ভূমিকায় সেটি মক্কী যুগের কোন্ পর্যায়ে নাযিল হয় তা জানিয়ে দেবো।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِىۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوۡرَ ؕ ثُمَّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُوۡنَ ① هُوَ الَّذِىۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ طِيۡنٍ ثُمَّ قَضٰۤى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنۡدَهٗ ثُمَّ اَنۡتُمۡ تَمۡتَرُوۡنَ ② وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الۡاَرۡضِ ؕ يَعۡلَمُ سِرَّكُمۡ وَجَهۡرَكُمۡ وَيَعۡلَمُ مَا تَكۡسِبُوۡنَ ③ وَمَا تَاۡتِيۡهِمۡ مِّنۡ اٰيَةٍ مِّنۡ اٰيٰتِ رَبِّهِمۡ اِلَّا كَانُوۡا عَنۡهَا مُعۡرِضِيۡنَ ④ فَقَدۡ كَذَّبُوۡا بِالۡحَـقِّ لَمَّا جَآءَهُمۡ ؕ فَسَوۡفَ يَاۡتِيۡهِمۡ اَنۡۢبٰٓؤُا مَا كَانُوۡا بِهٖ يَسۡتَهۡزِءُوۡنَ ⑤

প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উৎপত্তি ঘটিয়েছেন। তবুও সত্যের দাওয়াত অস্বীকারকারীরা অন্যদেরকে তাদের রবের সমকক্ষ দাঁড় করাচ্ছে।[১] তিনিই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।[২] তারপর তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন জীবনের একটি সময়সীমা এবং আর একটি সময়সীমাও আছে, যা তাঁর কাছে স্থিরীকৃত,[৩] কিন্তু তোমরা কেবল সন্দেহেই লিপ্ত রয়েছো।

তিনিই এক আল্লাহ আকাশেও আছেন এবং পৃথিবীতেও, তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব অবস্থাই জানেন এবং ভালো বা মন্দ যা–ই তোমরা উপার্জন করো তাও তিনি ভালোভাবেই অবগত।

মানুষের অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, তাদের রবের নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে এমন কোন নিদর্শন নেই যা তাদের সামনে আসার পর তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। অনুরূপভাবে এখন যে সত্য তাদের কাছে এসেছে তাকেও তারা মিথ্যা বলেছে। ঠিক আছে, এতদিন পর্যন্ত যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে এসেছে শীঘ্রই সে সম্পর্কে কিছু খবর তাদের কাছে পৌঁছুবে।[৪]

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۞

তারা কি দেখেনি তাদের পূর্বে এমনি ধরনের কত মানব গোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি, যারা নিজ নিজ যুগে ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপশালী? পৃথিবীতে তাদেরকে এমন কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকেও দেইনি। তাদের ওপর আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম এবং তাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করেছিলাম। (কিন্তু যখন তারা নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো তখন) অবশেষে তাদের গোনাহের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের জায়গায় পরবর্তী যুগের মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি।

১. মনে রাখতে হবে, এখানে আরবের মুশরিকদের সম্বোধন করে বলা হচ্ছে। আর এ মুশরিকরা একথা স্বীকার করতো যে, আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা। তিনি দিন ও রাতের উদ্ভব ঘটান। সূর্য ও চন্দ্রকে তিনিই অস্তিত্ব দান করেছেন। এ কাজগুলো লাত, উয্যা, হোবল অথবা আর কোন দেবদেবী করেছে–এ ধরনের কোন বিশ্বাস তাদের কেউ পোষণ করতো না। তাই তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে ঃ মূর্খরা! যখন তোমরা নিজেরাই একথা স্বীকার করে থাকো যে, পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা হচ্ছেন আল্লাহ এবং দিন–রাতের আবর্তন তিনিই করান তখন তোমরা আবার অন্যের সামনে সিজদা করো কেন? তাদেরকে নযরানা দাও, তাদের কাছে প্রার্থনা করো এবং নিজেদের অভাব–অভিযোগ পেশ করো কেন? এরা কারা? (সূরা ফাতহা ২ টীকা এবং সূরা আল বাকারা ১৬৩ টীকা দেখুন)।

আলোর মোকাবিলায় 'অন্ধকার' শব্দটিকে বহুবচনে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। কারণ, অন্ধকার বলা হয় আলোবিহীনতাকে আর আলোবিহীনতার রয়েছে অসংখ্য পর্যায়। তাই আলো এক বা একক এবং অন্ধকার একাধিক, বহু।

২. মানব দেহের সমুদয় অংশ মাটি থেকে গৃহীত। এর সামান্যতম অংশও অ–মৃত্তিকা নয়। তাই বলা হয়েছে, তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।

৩. অর্থাৎ কিয়ামতের সময়। তখন আগের ও পরের সমস্ত মানুষকে আবার নতুন করে জীবিত করা হবে এবং নিজেদের সমস্ত কাজের হিসেব দেবার জন্য তারা তাদের রবের সামনে হাযির হয়ে যাবে।

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٧ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ۝٨

হে নবী! যদি তোমার প্রতি কাগজে লেখা কোন কিতাবও নাযিল করতাম এবং লোকেরা নিজেদের হাত দিয়ে তা স্পর্শ করেও দেখে নিতো, তাহলেও আজ যারা সত্যকে অস্বীকার করছে তারা তখন বলতো, এটা সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা বলে, এ নবীর কাছে কোন ফেরেশতা পাঠানো হয় না কেন?[৫] যদি ফেরেশতা পাঠাতাম, তাহলে এতদিনে কবেই ফায়সালা হয়ে যেতো, তখন তাদেরকে আর কোন অবকাশই দেয়া হতো না।[৬]

৪. এখানে হিজরত এবং হিজরতের পরে ইসলাম একের পর এক যেসব সাফল্য অর্জন করবে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। যখন এ ইংগিত করা হয়েছিল সে সময় কোন্ ধরনের খবর পৌঁছুবে সে সম্পর্কে কাফেররা কোন কল্পনাই করতে পারেনি এবং মুসলমানদেরও এ সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন।

৫. অর্থাৎ যখন এ ব্যক্তিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছে তখন আকাশ থেকে একজন ফেরেশতাও পাঠানো উচিত ছিল। এ ফেরেশতা লোকদের ডেকে ডেকে বলবে, ইনি আল্লাহর নবী, এঁর কথা মেনে চলো, নয়তো তোমাদের শাস্তি দেয়া হবে। মূর্খ আপত্তিকারীরা অবাক হচ্ছিল এ ভেবে যে, পৃথিবী ও আকাশের মহা শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী স্রষ্টা একজনকে নিজের পয়গম্বর নিযুক্ত করবেন এবং তাকে মানুষের গালিগালাজ ও প্রস্তরাঘাত সহ্য করার জন্য সহায় সম্বলহীনভাবে ছেড়ে দেবেন, এটা কেমন করে হতে পারে? এত বড় বাদশাহর দূত বিপুল সংখ্যক রাজকীয় ও সরকারী আমলা কর্মচারীসহ না এলেও অন্তত আরদালী হিসেবে একজন ফেরেশতাকেও তো সংগে নিয়ে আসবেন। সে ফেরেশতা তাঁর হেফাজত করতো, মানুষের ওপর তাঁর প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করতো, তিনি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত একথা সবাইকে বুঝাতো এবং অস্বাভাবিক ও অলৌকিক পদ্ধতিতে তাঁর দায়িত্ব সম্পাদন করতো।

৬. এটা হচ্ছে তাদের আপত্তির প্রথম জবাব। এর অর্থ হচ্ছে, ঈমান আনার ও নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করার জন্য তোমরা যে সময়–সুযোগ ও অবকাশ লাভ করেছো এর সময়সীমা ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ সত্য অদৃশ্যের পর্দান্তরালে গোপন রয়েছে। নয়তো অদৃশ্যের পর্দা ছিন্ন হবার সাথে সাথেই এ অবকাশের সুযোগও শেষ হয়ে যাবে। এরপর শুধু হিসেব নেবার কাজটি বাকি থাকবে। কেননা দুনিয়ার জীবন তোমাদের জন্য একটি

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ﴿٩﴾ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٠﴾

যদি ফেরেশতা পাঠাতাম তাহলেও তাকে মানুষের আকৃতিতেই পাঠাতাম এবং এভাবে তাদেরকে ঠিক তেমনি সংশয়ে লিপ্ত করতাম যেমন তারা এখন লিপ্ত রয়েছে।[৭]

হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বেও অনেক রসূলের প্রতি বিদ্রূপ করা হয়েছে। কিন্তু বিদ্রূপকারীরা যে অকাট্য সত্য নিয়ে বিদ্রূপ করতো, সেটাই অবশেষে তাদের ওপর চেপে বসেছিল।

পরীক্ষাকাল। পরীক্ষা হচ্ছে এ বিষয়ের যে, প্রকৃত সত্যকে না দেখে নিজেদের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে তোমরা তাকে উপলব্ধি করতে ও জানতে পারো কি না এবং এ উপলব্ধি করার ও জানার পর নিজেদের নফস ও তার কামনা বাসনাকে নিয়ন্ত্রিত করে প্রকৃত সত্যের নিরীখে নিজেদের কর্মকাণ্ডকে সঠিক পথে চালাতে পারো কি না। এ পরীক্ষার জন্য অদৃশ্যের অদৃশ্য থাকাটা হচ্ছে একটি অপরিহার্য শর্ত। আর তোমাদের দুনিয়ার জীবন, যা আসলে পরীক্ষার অবকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়, এটিও ততক্ষণ প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে যতক্ষণ অদৃশ্য অদৃশ্যই থাকে। যখনই অদৃশ্য দৃশ্যমান হয়ে যাবে তখনই অবশ্যি এ অবকাশ খতম হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষার পরিবর্তে পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় সমাগত হবে। কাজেই তোমাদের দাবী অনুসারে ফেরেশতাকে তার আসল চেহারায় তোমাদের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ এখনই তোমাদের পরীক্ষার সময়কাল শেষ করে দিতে চান না। (সূরা আল বাকারার ২২৮ টীকা দেখুন)।

৭. এটি হচ্ছে তাদের আপত্তির দ্বিতীয় জবাব। প্রথমত ফেরেশতা তার আসল অদৃশ্য আকৃতিতে আসতে পারতো এবং এভাবে নিজেকে মানুষের সামনে প্রকাশ করতে পারতো। কিন্তু আগেই বলে দেয়া হয়েছে, এখনো তার সময় হয়নি। দ্বিতীয়ত ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে আসতে পারতো। এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যদি সে মানুষের রূপ ধরে আসতো, তাহলে সে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয়ে এসেছে সে ব্যাপারে তোমাদের মনে সে একই সন্দেহ ও বিভ্রম সৃষ্টি হয়ে যেতো যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্তির ব্যাপারে তোমাদের মনে সৃষ্টি হয়েছে।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ⑪ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلْ لِلّٰهِ ۚ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑫ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑬

২ রুকূ'

এদেরকে বলে দাও, পৃথিবীর বুকে একটু চলাফেরা করে দেখো, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে।[৮]

এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেগুলো কার?—বলো, সবকিছু আল্লাহরই।[৯] *অনুগ্রহের পথ অবলম্বন করা তিনি নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছেন। (এ জন্যই তিনি নাফরমানী ও সীমালংঘন করার অপরাধে তোমাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে পাকড়াও করেন না।) কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদের সবাইকে অবশ্যি একত্র করবেন। এটি এমন একটি সত্য যার মধ্যে সংশয়–সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। কিন্তু যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে তারা একথা মানে না।*

রাতের আঁধারে ও দিনের আলোয় যা কিছু বিরাজমান সবই আল্লাহর এবং তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।

৮. অর্থাৎ যেসব জাতি ও মানব গোষ্ঠী দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তাদের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও ঐতিহাসিক কাহিনীসমূহ একথার সাক্ষ দেবে যে, সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার এবং বাতিলের অনুসৃতির ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণে কিভাবে তারা শোচনীয় পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল।

৯. এটি একটি চমকপ্রদ বর্ণনাভংগী। প্রথমে হুকুম হলো, এদেরকে জিজ্ঞেস করো, পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যা কিছু আছে সেগুলো কার? প্রশ্নকারী প্রশ্ন করে জবাবের অপেক্ষায় থেমে রইল। যদিও শ্রোতা নিজেই স্বীকার করে যে, সবকিছু আল্লাহর তবুও সে ভুল জবাব দেবার সাহস করে না আবার সঠিক জবাব দিতেও চায় না। কারণ সঠিক জবাব দিলে তার আশংকা যে, বিরোধী পক্ষ তা থেকে তার মুশরিকী আকীদার বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করবে তাই সে জবাব না দিয়ে নীরব থাকে। তখনই হুকুম হয়, তাহলে তুমি নিজেই বলে দাও ঃ সবকিছু আল্লাহরই জন্য।

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ
وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ
عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾
وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ
فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ
الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾

বলো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমি কি আর কাউকে নিজের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবো? সেই আল্লাহকে বাদ দিয়ে—যিনি পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা এবং যিনি জীবিকা দান করেন, জীবিকা গ্রহণ করেন না।[১০] *বলো, আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে যেন আমি সবার আগে তাঁর সামনে আনুগত্যের শির নত করি। (আর তাকিদ করা হয়েছে, কেউ শিরক করলে করুক) কিন্তু তুমি মুশরিকদের অন্তরভুক্ত হয়ো না। যদি আমি আমার রবের নাফরমানী করি, তাহলে ভয় হয় একটি মহা (ভয়ংকর) দিনে আমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। সেদিন যে ব্যক্তি শাস্তি থেকে রেহাই পাবে আল্লাহ তার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন এবং এটিই সুস্পষ্ট সাফল্য। যদি আল্লাহ তোমার কোন ধরনের ক্ষতি করেন তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে তোমাকে ঐ ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে। আর যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ করেন, তাহলে তিনি সবকিছুর ওপর শক্তিশালী। তিনি নিজের বান্দাদের ওপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং তিনি জ্ঞানী ও সবকিছু জানেন।*

১০. এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পরিহাস নিহিত রয়েছে। মুশরিকরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ইলাহ বানিয়েছে তারা সবাই নিজেদের এ বান্দাদেরকে জীবিকা দেবার পরিবর্তে বরং এদের থেকে জীবিকা লাভের মুখাপেক্ষী। কোন ফেরাউন তার বান্দাদের কাছ থেকে কর ও নযরানা না পেলে প্রভুত্বের দাপট দেখাতে পারে না। কোন কবরে সমাহিত ব্যক্তির পূজারীরা যদি তার কবরে জমকালো গম্বুজ তৈরী না করে দেয় তাহলে তার উপাস্য ও আরাধ্য হবার চমক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কোন দেবতার পূজারীরা তার মূর্তি বানিয়ে কোন বিশাল মন্দিরে বা পূজা মণ্ডপে রেখে তাকে সুসজ্জিত ও সুশোভিত

قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللّٰهُ ۖ شَهِيْدٌۢ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ۗ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ۗ قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِىْ بَرِىْۤءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿١٩﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾

এদেরকে জিজ্ঞেস করো, কার সাক্ষ সবচেয়ে বড়?—বলো, আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী।[১১] আর এ কুরআন আমার কাছে পাঠানো হয়েছে অহীর মাধ্যমে, যাতে তোমাদের এবং আর যার যার কাছে এটি পৌঁছে যায় তাদের সবাইকে আমি সতর্ক করি। সত্যিই কি তোমরা এমন সাক্ষ দিতে সক্ষম যে, আল্লাহর সাথে আরো ইলাহও আছে?[১২] বলে দাও, আমি তো কখনোই এমন সাক্ষ দিতে পারি না।[১৩] বলো, আল্লাহ তো একজনই এবং তোমরা যে শিরকে লিপ্ত রয়েছো আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা এ বিষয়টিকে এমন সন্দেহাতীতভাবে চেনে যেমন নিজেদের সন্তানদেরকে চেনার ব্যাপারে তারা সন্দেহের শিকার হয় না।[১৪] কিন্তু যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তারা একথা মানে না।

না করা পর্যন্ত সে দেবতার দেব মহিমা ও খোদায়ী কর্তৃত্ব ব্যক্ত হবার কোন পথ পায় না। এসব বানোয়াট ইলাহদের গোষ্ঠীই তাদের বান্দাদের মুখাপেক্ষী। একমাত্র সমগ্র বিশ্বজাহানের প্রকৃত একচ্ছত্র মালিক ও প্রভু আল্লাহই সে আসল আল্লাহ, যাঁর কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্ব, উপাস্যত্ব ও প্রভুত্বের গৌরব তাঁর আপন শক্তি ও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী।

১১. অর্থাৎ এ মর্মে সাক্ষী যে, আমি তাঁর পক্ষ থেকে নিযুক্ত এবং যা কিছু বলছি তাঁরি নির্দেশ অনুসারে বলছি।

১২. কোন বিষয়ের সাক্ষ দেবার জন্য কেবল আন্দাজ-অনুমান যথেষ্ট নয়। বরং এ জন্য প্রত্যক্ষ ও সুনিশ্চিত জ্ঞান থাকা অপরিহার্য যেন সে এহেন নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে বলতে পারে যে, হাঁ, ব্যাপারটি ঠিক এরূপই। কাজেই এখানে প্রশ্নের অর্থ হচ্ছে, সত্যিই কি তোমরা নির্ভুলভাবে একথা জানো যে, এ বিশাল সৃষ্টিজগতে আল্লাহ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন প্রভু আছে, যে বন্দেগী ও পূজা-অর্চনা লাভের যোগ্য?

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ
الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۱﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَيْنَ
شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿۲۲﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّآ اَنْ
قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ﴿۲۳﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۲۴﴾

৩ রুকূ'

আর তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে[১৫] অথবা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে?[১৬] অবশ্যি এ ধরনের জালেমরা কখনই সফলকাম হতে পারে না।

যেদিন এদের সবাইকে একত্র করবো এবং মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস করবো, এখন তোমাদের মনগড়া সেই শরীকরা কোথায়, যাদেরকে তোমরা নিজেদের ইলাহ মনে করতে? তখন তারা এ (মিথ্যা বিবৃতি দেয়া) ছাড়া আর কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারবে না যে, হে আমাদের প্রভু! তোমার কসম, আমরা কখনো মুশরিক ছিলাম না। দেখো, সে সময় এরা কিভাবে নিজেরাই নিজেদের সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে নেবে এবং সেখানে তাদের সমস্ত বানোয়াট মাবূদ উধাও হয়ে যাবে।

১৩. অর্থাৎ যদি তোমরা নির্ভুল ও নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়া নিছক মিথ্যা সাক্ষ দিতে চাও, তাহলে দিতে পারো কিন্তু আমি তো এ ধরনের সাক্ষ দিতে পারি না।

১৪. অর্থাৎ যারা আসমানী কিতাবসমূহের জ্ঞান রাখে, তারা সন্দেহাতীতভাবে এ সত্যটি জানে ও উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ একক সত্তা এবং তাঁর প্রভুত্বের কর্তৃত্বে আর কেউ শরীক নয়। যেমন কারোর ছেলে অন্যান্য ছেলেদের ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলেও সে তাকে চিনে নেয়, ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান রাখে, সে ইলাহী কর্তৃত্ব ও উপাস্য হবার ব্যাপারে মানুষের অসংখ্য আকীদা, বিশ্বাস ও মতবাদের মধ্য থেকে কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় ছাড়াই প্রকৃত সত্যটি সহজেই চিনে নেয়।

১৫. অর্থাৎ এ মর্মে দাবী করে যে, প্রভুত্বের ব্যাপারে আরো অনেক সত্তা আল্লাহর সাথে শরীক। তাদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার গুণাবলী এবং তারা মানুষের সামনে তাদের বন্দেগীলাভ করার জন্য নিজেদেরকে উপস্থাপন করার যোগ্যতা

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ
فِيْ آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ حَتَّىٰ
إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ ۚ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا
أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

এদের কিছু লোক কান পেতে তোমার কথা শোনে কিন্তু অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমি তাদের অন্তরের ওপর আবরণ ফেলে দিয়েছি যার ফলে তারা এর কিছুই বোঝে না এবং তাদের কানে ভার রেখে দিয়েছি (যার ফলে সবকিছু শোনার পরও তারা কিছুই শোনে না)।[১৭] তারা যে নিদর্শনই প্রত্যক্ষ করুক তার ওপর ঈমান আনবে না। এমনকি যখন তারা তোমার কাছে এসে তোমার সাথে ঝগড়া করে তখন তাদের মধ্য থেকে যারা অস্বীকার করার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছে তারা (সমস্ত কথা শোনার পর) একথাই বলে যে, এটি প্রাচীন কালের একটি গালগল্প ছাড়া আর কিছুই নয়।[১৮] তারা এ মহাসত্যবাণী গ্রহণ করা থেকে লোকদেরকে বিরত রাখে এবং নিজেরাও এর কাছ থেকে দূরে পালায়। (তারা মনে করে এ ধরনের কাজ করে তারা তোমার কিছু ক্ষতি করছে) অথচ আসলে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করছে। কিন্তু এটা তারা উপলব্ধি করে না।

রাখে। তাছাড়া আল্লাহ অমুক অমুক সত্তাকে নিজের বিশেষ নিকটতম হিসেবে গণ্য করেছেন এবং তিনিই এ হুকুম দিয়েছেন অথবা কমপক্ষে তাদের সাথে ইলাহসুলভ গুণাবলী সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে সম্মত রয়েছেন এবং আল্লাহর সাথে বান্দার যে ধরনের আচার–আচরণ করা উচিত তাদের সাথেও সে ধরনের আচরণ করতে হবে—কারোর এ জাতীয় কথা বলাও আল্লাহর প্রতি এক ধরনের মিথ্যা দোষারোপ।

১৬. আল্লাহর নিদর্শনাবলী বলতে এমন সব নিদর্শন বুঝানো হয়েছে যেগুলো মানুষের নিজের সত্তার মধ্যে এবং সমগ্র বিশ্ব–জাহানের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে, নবী–রসূলগণের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যেগুলোর প্রকাশ ঘটেছে এবং যেগুলো আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে পেশ করা হয়েছে। এ সমস্ত নিদর্শন একটি মাত্র সত্যের প্রতিই মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সে সত্যটি হচ্ছে, এ সৃষ্টিজগতের বুকে যা কিছু অস্তিত্বমান তার মধ্যে বিধাতা ও মনিব মাত্র একজনই এবং বাকি সবাই প্রজা ও বান্দা। এখন যে ব্যক্তি এ সমস্ত নিদর্শনের মোকাবিলায় প্রকৃত ও যথার্থ সাক্ষ–প্রমাণ ছাড়াই, কোন জ্ঞান, প্রত্যক্ষ

দর্শন ও কোন প্রকার অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই নিছক আন্দাজ–অনুমান বা পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণের ভিত্তিতে অন্যদের সাথে উপাস্য ও পূজনীয় হবার গুণাবলী সংযুক্ত করে এবং আল্লাহ যেসব অধিকার এককভাবে লাভ করেন, তাদেরকে সেগুলোর যোগ্য গণ্য করে, তাদের চেয়ে বড় জালেম আর কেউ হতে পারে না। তারা সুস্পষ্ট ও জাজ্জ্বল্যমান সত্যের প্রতি অবিচার ও জুলুম করছে। তারা নিজেদের নফসের ওপর জুলুম করছে। তারা এ ভ্রান্ত মতাদর্শের ভিত্তিতে বিশ্ব–জাহানের যেসব জিনিসের সাথে সম্পর্ক ও সংযোগ স্থাপন করে এবং তাদেরকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে তাদের প্রত্যেকের সাথে জুলুম করছে।

১৭. এখানে একথাটি সামনে রাখতে হবে যে, প্রাকৃতিক আইনের আওতায় দুনিয়ায় যা কিছু ঘটে সবকিছুকেই আল্লাহ নিজের কাজ বলে দাবী করেন। কারণ এ আইন আসলে আল্লাহর তৈরী এবং এর আওতায় যা কিছু সংঘটিত হয় তা মূলত আল্লাহর নির্দেশ ও অনুমতিক্রমেই বাস্তব রূপ লাভ করে। হঠকারী ও সত্য অস্বীকারকারীদের সবকিছু শোনার পরও কিছু না শোনা এবং সত্যের আহবায়কের কোন কথা তাদের মনের গহনে প্রবেশ না করা তাদের একগুঁয়েমি, গোঁড়ামি ও স্থবিরতার স্বাভাবিক ফল। যে ব্যক্তি জিদ ও হঠকারিতার শিকার হয় এবং সকল প্রকার পক্ষপাতিত্ব ও একদেশদর্শিতা পরিহার করে সত্যনিষ্ঠ মানুষের দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করতে প্রস্তুত হয় না। তার মনের দরজা তার কামনা ও প্রবৃত্তি বিরোধী প্রতিটি সত্যের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, এটিই প্রকৃতির আইন। একথাটি বলার সময় আমরা বলি, অমুক ব্যক্তির মনের দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে। আর আল্লাহ একথাটি বলার সময় বলেন, তার মনের দরজা আমি বন্ধ করে দিয়েছি। কারণ আমরা কেবলমাত্র ঘটনা বর্ণনা করি আর আল্লাহ বর্ণনা করেন ঘটনার অভ্যন্তরের প্রকৃত সত্য।

১৮. মূর্খ ও নির্বোধদের সত্যের দিকে আহবান জানালে তারা সাধারণত বলে থাকে, তুমি আর নতুন কথা কি বললে? এসব তো সে পুরনো কথা, যা আমরা আগে থেকেই শুনে আসছি। যেন এ নির্বোধদের মতে কোন কথা সত্য হতে হলে তা একেবারে আনকোরা নতুন হওয়া চাই এবং পুরনো কোন কথা সত্য হতে পারে না। অথচ সত্য প্রতি যুগেই এক এবং চিরকাল একই থাকবে। আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে যারা মানব জাতিকে পথ দেখাবার জন্য এগিয়ে এসেছেন তারা ইতিহাসের প্রাচীনতম যুগ থেকে একই সত্য পেশ করে এসেছেন এবং ভবিষ্যতেও যে ব্যক্তি এই জ্ঞানের উৎস থেকে লাভবান হয়ে কিছু পেশ করবেন তিনিও এই একই পুরনো কথার পুনরাবৃত্তিই করবেন। অবশ্যি নতুন ও উদ্ভট অলীক কথা কেবল তারাই উদ্ভাবন করতে পারবেন যারা আল্লাহর আলোক থেকে বঞ্চিত হয়ে আদি ও চিরন্তন সত্য প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবেন এবং নিজেদের কিছু মনগড়া মতবাদকে সত্যের নামে মানুষের সামনে উপস্থাপন করবেন। এ ধরনের লোকেরাই নিসন্দেহে এমন নতুন ও আজগুবী কথা বলতে পারেন, যা তাদের পূর্বে দুনিয়ায় কেই কোনদিন বলেনি।

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾

হায়! যদি তুমি সে সময়ের অবস্থা দেখতে পারতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারে দাঁড় করানো হবে। সে সময় তারা বলবে, হায়! যদি এমন কোন উপায় হতো যার ফলে আমরা আবার দুনিয়ায় প্রেরিত হতাম তখন আমাদের রবের নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা বলতাম না এবং মুমিনদের অন্তরভুক্ত হয়ে যেতাম। আসলে একথা তারা নিছক এ জন্য বলবে যে, তারা যে সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল তা সে সময় আবরণমুক্ত হয়ে তাদের সামনে এসে যাবে।[১৯] নয়তো তাদেরকে যদি আগের জীবনের দিকে ফেরত পাঠানো হয় তাহলে আবার তারা সে সবকিছুই করে যাবে যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। তারা তো মিথ্যুকই (তাই নিজেদের মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করার ক্ষেত্রেও তারা মিথ্যারই আশ্রয় নেবে)। আজ এরা বলে, জীবন বলতে যা কিছু আছে, তা কেবল এ দুনিয়ার জীবনটুকুই এবং মরার পর আমাদের আর কোনক্রমেই উঠানো হবে না। হায়! সেই দৃশ্যটা যদি তোমরা দেখতে পারতে যখন এদেরকে এদের রবের সামনে দাঁড় করানো হবে। সে সময় এদের রব এদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, "এটা কি সত্য নয়"? এরা বলবে, "হাঁ, হে আমাদের রব! এটা সত্যই।" তিনি বলবেন, "আচ্ছা, এবার তাহলে নিজেদের সত্য অস্বীকারের ফলস্বরূপ আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো।

১৯. অর্থাৎ তাদের একথা আসলে বুদ্ধি–বিবেক ও চিন্তা–ভাবনার কোন সঠিক সিদ্ধান্ত এবং তার ভিত্তিতে কোন যথার্থ মত পরিবর্তনের ফল হবে না। বরং তা হবে নিছক সত্যের সাথে সরাসরি সাক্ষাতের ফল, যার পরে কোন কট্টর কাফেরও আর অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে না।

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللهِ ۖ حَتّٰى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ أَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٣١﴾ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٣٢﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٣٣﴾

৪ রুকূ'

যারা আল্লাহর সাথে নিজেদের সাক্ষাতের ঘোষণাকে মিথ্যা গণ্য করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যখন অকস্মাৎ সে সময় এসে যাবে তখন এরাই বলবে, "হায়, আফসোস! এ ব্যাপারে আমাদের কেমন ভুল হয়ে গেছে।" আর তারা নিজেদের পিঠে নিজেদের গোনাহের বোঝা বহন করতে থাকবে। দেখো, কেমন নিকৃষ্ট বোঝা এরা বহন করে চলছে! দুনিয়ার জীবন তো একটি খেল–তামাসার ব্যাপার।[২০] *আসলে যারা ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে চায় তাদের জন্য আখেরাতের আবাসই ভালো। তবে কি তোমরা বুদ্ধি–বিবেচনাকে কাজে লাগাবে না?*

হে মুহাম্মাদ! একথা অবশ্যি জানি, এরা যেসব কথা তৈরী করে, তা তোমাকে কষ্ট দেয় কিন্তু এরা তোমাকে মিথ্যা বলে না বরং এ জালেমরা আসলে আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করছে।[২১]

২০. এর মানে এ নয় যে, দুনিয়ার জীবনটি নেহাত হাল্কা ও গুরুত্বহীন বিষয়, এর মধ্যে কেন গাম্ভীর্য নেই এবং নিছক খেল–তামাসা করার জন্য এ জীবনটি তৈরী করা হয়েছে। বরং এর মানে হচ্ছে, আখেরাতের যথার্থ ও চিরন্তন জীবনের তুলনায় দুনিয়ার এ জীবনটি ঠিক তেমনি যেমন কোন ব্যক্তি কিছুক্ষণ খেলাধূলা করে চিত্তবিনোদন করে তারপর তার আসল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ কারবারে মনোনিবেশ করে। তাছাড়া একে খেলাধূলার সাথে তুলনা করার কারণ হচ্ছে এই যে, এখানে প্রকৃত সত্য গোপন থাকার ফলে যারা ভেতরে দৃষ্টি না দিয়ে শুধুমাত্র বাইরেরটুকু দেখতে অভ্যস্ত তাদের জন্য বিভ্রান্তির শিকার হবার বহুতর কারণ বিদ্যমান। এসব বিভ্রান্তির শিকার হয়ে মানুষ প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধে এমন সব অদ্ভুত ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে যার ফলশ্রুতিতে তাদের জীবন নিছক একটি খেলা ও তামাসার বস্তুতে পরিণত হয়। যেমন যে ব্যক্তি এ

পৃথিবীতে বাদশাহের আসনে বসে তার মর্যাদা আসলে নাট্যমঞ্চের সেই কৃত্রিম বাদশাহর চাইতে মোটেই ভিন্নতর নয়, যে সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে সিংহাসনে বসে এবং এমনভাবে হুকুম চালাতে থাকে যেন সে সত্যিকারের একজন বাদশাহ। অথচ প্রকৃত বাদশাহীর সামান্যতম নামগন্ধও তার মধ্যে নেই। পরিচালকের সামান্য ইংগিতেই তার বরখাস্ত, বন্দী ও হত্যার সিদ্ধান্তও হয়ে যেতে পারে। এ দুনিয়ার সর্বত্র এ ধরনের অভিনয়ই চলছে। কোথাও কোন পীর–অলী বা দেব–দেবীর দরবারে মনস্কামনা পূরণের জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে। অথচ সেখানে মনস্কামনা পূর্ণ করার ক্ষমতার লেশ মাত্রও নেই। কোথাও অদৃশ্য জ্ঞানের কৃতিত্বের প্রকাশ ঘটানো হচ্ছে। অথচ সেখানে অদৃশ্য জ্ঞানের বিন্দু বিসর্গও নেই। কোথাও কেউ মানুষের জীবিকার মালিক হয়ে বসে আছে। অথচ সে বেচারা নিজের জীবিকার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী। কোথাও কেউ নিজেকে সম্মান ও অপমানের এবং লাভ ও ক্ষতির সর্বময় কর্তা মনে করে বসে আছে। সে এমনভাবে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ডংকা বাজিয়ে চলছে যেন মনে হয়, আশপাশের সমুদয় সৃষ্টির সে এক মহাপ্রভু। অথচ তার ললাটে চিহ্নিত হয়ে আছে দাসত্বের কলংক টীকা। ভাগ্যের সামান্য হেরফেরেই শ্রেষ্টত্বের আসন থেকে নামিয়ে তাকে সেসব লোকের পদতলে নিষ্পিষ্ট করা হতে পারে যাদের ওপর কাল পর্যন্তও সে প্রভুত্ব ও কৃর্তত্ব চালিয়ে আসছিল। দুনিয়ার এই মাত্র কয়েকদিনের জীবনেই এসব অভিনয় চলছে। মৃত্যুর মুহূর্ত আসার সাথে সাথেই এক লহমার মধ্যেই এসব কিছুই বন্ধ হয়ে যাবে। এ জীবনের সীমান্ত পার হবার সাথে সাথেই মানুষ এমন এক জগতে পৌঁছে যাবে যেখানে সবকিছুই হবে প্রকৃত সত্যের অনুরূপ এবং যেখানে এ দুনিয়ার জীবনের সমস্ত বিভ্রান্তির আবরণ খুলে ফেলে দিয়ে মানুষকে দেখিয়ে দেয়া হবে কি পরিমাণ সত্য সে সাথে করে এনেছে। সত্যের মীযান তথা ভারসাম্যপূর্ণ তুলাদণ্ডে পরিমাপ করে তার মূল্য ও মান নির্ধারণ করা হবে।

২১. প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যতদিন পর্যন্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জাতিকে আল্লাহর আয়াত শুনাতে শুরু করেননি ততদিন তারা তাঁকে "আমীন" ও সত্যবাদী মনে করতো এবং তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতো। যখন তিনি তাদেরকে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাতে শুরু করলেন তখন থেকেই তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে শুরু করলো। এ দ্বিতীয় যুগেও তাদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলার সাহস করতে পরতো। তাঁর কোন কট্টর বিরোধীও তাঁর বিরুদ্ধে কখনো এ ধরনের দোষারোপ করেনি যে, দুনিয়াবী ব্যাপারে তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেছেন। নবী হবার কারণে এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করার জন্যই তারা তাঁকে মিথ্যাচারে অভিযুক্ত করেছে। তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল আবু জাহেল। হযরত আলীর (রা) বর্ণনা মতে একবার আবু জাহেল নিজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আলাপ প্রসংগে বলে ঃ

انا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به

"আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী মনে করি না বরং আপনি যা কিছু পেশ করছেন সেগুলোকেই মিথ্যা বলছি।"

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا
حَتّٰى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ
نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٤﴾ وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ
اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ۚ
وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٣٥﴾

তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকে মিথ্যা বলা হয়েছে কিন্তু তাদের ওপর যে মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে এবং যে কষ্ট দেয়া হয়েছে, তাতে তারা সবর করেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে গেছে। আল্লাহর কথাগুলো পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারোর নেই[২২] এবং আগের রসূলদের সাথে যা কিছু ঘটে গেছে তার খবর তো তোমার কাছে পৌঁছে গেছে। তবুও যদি তাদের উপেক্ষা তোমার কাছে অসহনীয় হয়ে থাকে তাহলে তোমার মধ্যে কিছু শক্তি থাকলে তুমি ভূগর্ভে কোন সুড়ংগ খুঁজে নাও অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগাও এবং তাদের কাছে কোন নিদর্শন আনার চেষ্টা করো।[২৩] আল্লাহ চাইলে এদের সবাইকে হেদায়াতের ওপর একত্র করতে পারতেন। কাজেই মূর্খদের অন্তরভুক্ত হয়ো না।[২৪]

বদর যুদ্ধের সময় আখনাস ইবনে শারীক নিরিবিলিতে আবু জাহেলকে জিজ্ঞেস করে, "এখানে আমি ও তুমি ছাড়া আর তৃতীয় কেউ নেই। সত্যি করে বল তো, মুহাম্মাদকে তুমি সত্যবাদী মনে করো, না মিথ্যাবাদী? আবু জাহেল জবাব দেয়, "আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ একজন সত্যবাদী। সারা জীবনে কখনো মিথ্যা বলেনি। কিন্তু যখন পতাকা, হাজীদের পানি পান করানো, আল্লাহর ঘরের পাহারাদারী ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ও নবুওয়াত সবকিছুই 'কুসাই' বংশের লোকদের ভাগে পড়ে তখন কুরাইশ বংশের অন্যান্য শাখার ভাগে কি থাকে বলো?" তাই এখানে আল্লাহ তাঁর নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, তারা তোমার নয় বরং আমার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছে আর আমি যখন এসব সহ্য করে নিচ্ছি এবং তাদেরকে ঢিল দিয়ে চলছি তখন তুমি কেন অস্থির হয়ে পড়েছো?

২২. অর্থাৎ হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার সংঘাতের যে বিধান আল্লাহ তৈরী করে দিয়েছেন, তা বদলে দেবার ক্ষমতা কারোর নেই। সত্যপন্থীদের অবশ্যি দীর্ঘকাল পরীক্ষার আগুনে ঝালাই হতে হবে। তাদের পরীক্ষা দিতে হবে নিজেদের সবর, সহিষ্ণুতা, সততা, সত্যবাদিতা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, আত্মোৎসর্গিতা, ঈমানী দৃঢ়তা ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার। বিপদ, মুসিবত, সমস্যা ও সংকটের সুকঠিন পথ অতিক্রম করে তাদের মধ্যে এমন গুণাবলী সৃষ্ট করতে হবে, যা কেবল মাত্র ঐ কঠিন বিপদ সংকুল গিরিবর্তেই

লালিত হতে পারে। তাদের শুরুতেই নির্ভেজাল উন্নত নৈতিক গুণাবলী ও সচ্চরিত্রের অস্ত্র ব্যবহার করে জাহেলিয়াতের ওপর বিজয় লাভ করতে হবে। এভাবে তারা নিজেদেরকে উন্নত সংস্কারকারী বলে প্রমাণ করতে পারলেই আল্লাহর সাহায্য যথা সময়ে তাদেরকে সহায়তা দান করার জন্য এগিয়ে আসবে। সময় হবার পূর্বে কেউ হাজার চেষ্টা করেও তাকে আনতে পারবে না।

২৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দেখতেন, এ জাতিকে বুঝাতে বুঝাতে দীর্ঘকাল হয়ে গেলো অথচ এরা কোনক্রমেই হেদায়াতের পথে আসছে না, তখন অনেক সময় তাঁর মনের গহনে এ ধরনের ইচ্ছা ও বাসনা জন্ম নিতো যে, আহা, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোন নিদর্শন প্রকাশিত হতো, যার ফলে এরা কুফরী পরিহার করে আমার দাওয়াতকে সত্য বলে গ্রহণ করে নিতো। তাঁর এ ইচ্ছা ও বাসনার জবাব এ আয়াতে দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, অধৈর্য হয়ো না। যে বিন্যাস ও ধারবাহিকতা সহকারে আমি এ কাজটি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তার ওপর সবর করে এগিয়ে চলো। অলৌকিকতার আশ্রয় নিতে হলে তা কি আমি নিজেই নিতে পারতাম না? কিন্তু আমি জানি, তোমাকে যে চিন্তাগত ও নৈতিক বিপ্লব এবং যে সুস্থ সাংস্কৃতিক জীবনধারা নির্মাণের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে তাকে সফলতার মনযিলে পৌছাবার সঠিক পথ এটা নয়। তবুও যদি লোকদের বর্তমান নিশ্চলতা ও অস্বীকৃতির অচলায়তনের মোকাবিলায় তুমি সবর করতে না পারো এবং তুমি ধারণা করে থাকো যে, এ নিশ্চলতা দূর করার জন্য কোন বস্তুগত নিদর্শনের চাক্ষুষ প্রদর্শনী অপরিহার্য, তাহলে তুমি নিজেই চেষ্টা করো, শক্তি ব্যবহার করো এবং ক্ষমতা থাকলে যমীনের মধ্যে সুড়ংগ কেটে বা আসমানে উঠে এমন কোন অলৌকিক ব্যাপার ঘটাবার চেষ্টা করো, যা অবিশ্বাসকে বিশ্বাসে রূপান্তরিত করে দেবার জন্য যথেষ্ট বলে তুমি মনে করো। কিন্তু আমি তোমার এ বাসনা পূর্ণ করবো, এ ধরনের আকাংখা আমার ব্যাপারে পোষণ করো না। কারণ আমার পরিকল্পনায় এ ধরনের কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বনের কোন অবকাশ নেই।

২৪. অর্থাৎ যদি কেবলমাত্র সমস্ত মানুষকে কোন না কোনভাবে সত্যপন্থী বানানোই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে কিতাব নাযিল করা, মুমিনদেরকে কাফেরদের মোকাবিলায় সংগ্রামরত করা এবং সত্যের দাওয়াতকে পর্যায়ক্রমে আন্দোলনের মনযিল অতিক্রম করাবার কি প্রয়োজন ছিল? আল্লাহর একটি মাত্র সৃজনী ইংগিতেই এ কাজ সম্পন্ন হতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ এ কাজটি এ পদ্ধতিতে করতে চান না। তিনি চান সত্যকে যুক্তি-প্রমাণ সহকারে লোকদের সামনে পেশ করতে। তারপর তাদের মধ্য থেকে যারা সঠিক ও নির্ভুল চিন্তা শক্তি প্রয়োগ করে সত্যকে চিনে নেবে, তারা নিজেদের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে তার প্রতি ঈমান আনবে। নিজেদের চরিত্রকে তার ছাঁচে ঢালাই করে বাতিল পূজারীদের মোকাবিলায় নিজেদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে। নিজেদের শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন, উন্নত লক্ষ ও উদ্দেশ্য, উত্তম জীবনধারা এবং পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্র মাধুর্যে মানব সমাজের সত্যনিষ্ঠ ও সদাচারী ব্যক্তিদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকবে এবং বাতিলের বিরুদ্ধে উপর্যুপরি সংগ্রাম চালিয়ে স্বাভাবিক পরিবর্তনের পথ ধরে আল্লাহর সত্য দীন প্রতিষ্ঠার মনযিলে পৌছে যাবে। এ কাজে আল্লাহ তাদেরকে পথ দেখাবেন এবং যে পর্যায়ে তারা আল্লাহর কাছ থেকে যে ধরনের সাহায্য

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

সত্যের দাওয়াতে তারাই সাড়া দেয় যারা শোনে। আর মৃতদেরকে[২৫] তো আল্লাহ কবর থেকেই ওঠাবেন, তারপর তাদেরকে (তাঁর আদালতে হাযির হবার জন্য) ফিরিয়ে আনা হবে।

তারা বলে, এ নবীর ওপর তার রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন? বলো, আল্লাহ নিদর্শন অবতীর্ণ করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক অজ্ঞতায় ডুবে আছে।[২৬] ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল কোন প্রাণী এবং বাতাসে ডানা বিস্তার করে উড়ে চলা কোন পাখিকেই দেখ না কেন, এরা সবাই তোমাদের মতই বিভিন্ন শ্রেণী। তাদের ভাগ্যলিপিতে কোন কিছু লিখতে আমি বাদ দেইনি।

লাভের যোগ্য বলে নিজেদেরকে প্রমাণ করতে পারবে সে পর্যায়ে তাদেরকে সে সাহায্যও দিয়ে যেতে থাকবেন। কিন্তু যদি কেউ চায় এ স্বাভাবিক পথ পরিহার করে আল্লাহ নিছক তাঁর প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির জোরে খারাপ চিন্তা নির্মূল করে মানুষের মধ্যে সুস্থ চিন্তার বিস্তার ঘটাবেন এবং অসুস্থ সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিলোপ সাধন করে সৎ ও সুস্থ জীবনধারা নির্মাণ করে দেবেন, তাহলে এমনটি কখনো হবে না। কারণ, যে প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মনীতির ভিত্তিতে আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় একটি দায়িত্বশীল প্রাণী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, তাকে কাজ করার ও আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুকে কাজে লাগাবার ক্ষমতা দিয়েছেন, আনুগত্য ও অবাধ্যতা করার স্বাধীনতা দান করেছেন, পরীক্ষার অবকাশ দিয়েছেন এবং তার প্রচেষ্টা অনুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের জন্য ফায়সালার সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, এটি তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

২৫. যারা শোনে বলতে এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে যাদের বিবেক জীবন্ত ও জাগ্রত, যারা নিজেদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিকে অচল করে দেয়নি এবং যারা নিজেদের মনের দুয়ারে পক্ষপাতিত্ব, বিদ্বেষ ও জড়তার তালা ঝুলিয়ে দেয়নি। পক্ষান্তরে মৃত হচ্ছে তারা যারা ভেড়ার পালের মতো গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে অন্ধের মতো এগিয়ে যেতে থাকে এবং প্রথম ভেড়াটির পথ ছাড়া অন্য কোন পথ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না, তা দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট ও অকাট্য সত্য হলেও।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِي الظُّلُمٰتِ ۗ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ۗ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاۗءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ۝

তারপর তাদের সবাইকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে। কিন্তু যারা আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা বলে তারা বধির ও বোবা, তারা অন্ধকারে ডুবে আছে,[২৭] আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন আবার যাকে চান সত্য সরল পথে পরিচালিত করেন।[২৮] এদেরকে বলো, একটু ভেবে চিন্তে বলতো দেখি, যদি তোমাদের ওপর কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বড় রকমের বিপদ এসে পড়ে অথবা শেষ সময় এসে যায়, তাহলে সে সময় কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ডাকো? বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তখন তোমরা একমাত্র আল্লাহকেই ডেকে থাকো। তারপর তিনি চাইলে তোমাদেরকে সেই বিপদমুক্ত করেন। যাদেরকে তোমরা তাঁর সাথে শরীক করতে তাদের কথা এ সময় একদম ভুলে গিয়ে থাকো।[২৯]

২৬. নিদর্শন বলতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মু'জিযাকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর এ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, মু'জিযা না দেখাবার কারণ এ নয় যে, আমি তা দেখাতে অক্ষম বরং এর কারণ অন্য কিছু। নিছক নিজেদের অজ্ঞতার কারণে তারা এটা বুঝতে পারছে না।

২৭. অর্থাৎ তোমরা যদি নিছক তামাশা দেখার জন্য নয় বরং এ নবী যে বিষয়ের দিকে আহবান জানাচ্ছেন তা সত্য কিনা যথার্থই তা জানার জন্য নিদর্শন দেখতে চাও, তাহলে ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখো, তোমাদের চারদিকে অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল প্রাণীকূল এবং শূন্যে উড়ে চলা পাখিদের কোন একটি শ্রেণীকে নিয়ে তাদের জীবন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করো। দেখো, কীভাবে তাদেরকে অবস্থা ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তাদের আকৃতি নির্মাণ করা হয়েছে। কীভাবে তাদের সৃষ্টিগত স্বাভাবিক প্রবণতার মধ্যে তাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন অনুযায়ী শক্তি ও সামর্থের সঞ্চার করা হয়েছে। কীভাবে তাদের জীবিকা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কীভাবে তাদের জন্য ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তারা তার সীমানা পেরিয়ে এগিয়ে যেতেও পারে না, পিছিয়ে আসতেও পারে না। কীভাবে তাদের এক একটি প্রাণীকে

এবং এক একটি ছোট ছোট কীট–পতঙ্গকেও তার নিজের স্থানে সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পথপ্রদর্শন করা হচ্ছে। কীভাবে একটি নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী তার থেকে কাজ আদায় করে নেয়া হচ্ছে। কীভাবে তাকে একটি নিয়ম–শৃংখলার আওতাধীন করে রাখা হয়েছে। কীভাবে তার জন্ম, মৃত্যু ও বংশ বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা যথা নিয়মে চলছে। আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনের মধ্য থেকে যদি কেবলমাত্র এ একটি নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করো তাহলে তোমরা জানতে পারবে যে, আল্লাহর একত্ব এবং তাঁর গুণাবলীর যে ধারণা এ নবী তোমাদের সামনে পেশ করছেন এবং সে ধারণা অনুযায়ী দুনিয়ায় জীবন যাপন করার জন্য যে কর্মনীতি অবলম্বন করার দিকে তোমাদের আহবান জানাচ্ছেন, তা–ই যথার্থ ও প্রকৃত সত্য। কিন্তু তোমরা নিজেদের চোখ মেলে এগুলো দেখও না আর কেউ বুঝাতে এলে তার কথা মেনেও নাও না। তোমরা তো মুখ গুঁজে পড়ে আছো মূর্খতার নিকষ অন্ধকারে। অথচ তোমরা চাইছো আল্লাহর বিস্ময়কর ক্ষমতার তেলেসমাতি দেখিয়ে তোমাদের মন মাতিয়ে রাখা হোক।

২৮. আল্লাহর বিপথগামী করার অর্থ হচ্ছে একজন মূর্খতা ও অজ্ঞতাপ্রিয় ব্যক্তিকে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অধ্যয়ন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা। আর একজন পক্ষপাতদুষ্ট, বিদ্বেষী ও সত্যবিরোধী জ্ঞানান্বেষী কখনো আল্লাহর নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করলেও সত্যের পক্ষে পৌঁছার নিশানীগুলো তার দৃষ্টির অগোচরে থেকে যাবে এবং বিভ্রান্তির অক্টোপাসে জড়িয়ে ফেলার মতো জিনিসগুলো তাকে সত্য থেকে দূরে টেনে নিয়ে যেতে থাকবে। অপরদিকে আল্লাহর হেদায়াত তথা সত্য–সরল পথে পরিচালিত করার অর্থ হচ্ছে এই যে, একজন সত্যান্বেষী ব্যক্তি জ্ঞানের উপকরণসমূহ থেকে লাভবান হবার সুযোগ লাভ করে এবং আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে সত্যের লক্ষ্যে পৌঁছার নিশানীগুলো লাভ করে যেতে থাকে। এ তিনটি অবস্থার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আজকাল প্রায়ই আমাদের সামনে এসে থাকে। এমন বহু লোক আছে যাদের সামনে পৃথিবীর বস্তুনিচয় ও প্রাণীকূলের মধ্যে তাদের জন্য আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে কিন্তু তারা জন্তু–জানোয়ারের মতো সেগুলো দেখে থাকে এবং সেখান থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না। বহু লোক প্রাণীবিদ্যা (ZOOLOGY), উদ্ভিদ বিদ্যা (BOTANY), জীববিদ্যা (BIOLOGY), ভূতত্ত্ব (GEOLOGY), মহাকাশ বিদ্যা (ASTRONOMY), শরীর বিজ্ঞান (PHYSIOLOGY), শবব্যবচ্ছেদ বিদ্যা (ANATOMY), এবং বিজ্ঞানের আরো বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় ব্যাপক অধ্যয়ন করেন, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও সমাজ বিজ্ঞানে গবেষণা করেন এবং এমন সব নিদর্শন তাদের সামনে আসে যেগুলো হৃদয়কে ঈমানের আলোয় ভরে দেয়। কিন্তু যেহেতু তারা বিদ্বেষ ও পক্ষপাতদুষ্ট মানসিকতা নিয়ে অধ্যয়নের সূচনা করেন এবং তাদের সামনে বৈষয়িক লাভ ছাড়া আর কিছুই থাকে না, তাই এ অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণকালে তারা সত্যের দোরগোড়ায় পৌঁছবার মতো কোন নিদর্শন পায় না। বরং তাদের সামনে যে নিদর্শনটিই উপস্থিত হয় সেটিই তাদেরকে নাস্তিকতা, আল্লাহ বিমুখতা, বস্তুবাদিতা ও প্রকৃতিবাদিতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাদের মোকাবিলায় এমন লোকের সংখ্যাও একেবারে নগণ্য নয় যারা সচেতন বুদ্ধি বিবেকের সাথে চোখ মেলে বিশ্ব প্রকৃতির এ সুবিশাল কর্মক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করেন এবং বলে ওঠেন ঃ

"সচেতন দৃষ্টি সমুখে গাছের প্রতিটি সবুজ পাতা
একেকটি গ্রন্থ যেন স্রষ্টা–সন্ধানের এনেছে বারতা।"

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَٰهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَٰبَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَآ أُوتُوٓا۟ أَخَذْنَٰهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾

৫ রুকূ'

তোমার পূর্বে অনেক মানব গোষ্ঠীর কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে বিপদ ও কষ্টের মুখে নিক্ষেপ করেছি, যাতে তারা বিনীতভাবে আমার সামনে মাথা নত করে। কাজেই যখন আমার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কঠোরতা আরোপিত হলো তখন তারা বিনম্র হলো না কেন? বরং তাদের মন আরো বেশী কঠিন হয়ে গেছে এবং শয়তান তাদেরকে এ মর্মে নিশ্চিন্ততা বিধান করেছে যে, তোমরা যা কিছু করছো ভালই করছো। তারপর যখন তারা তাদের যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তা ভুলে গেলো তখন তাদের জন্য সমৃদ্ধির সকল দরজা খুলে দিলাম। শেষ পর্যন্ত তারা যখন তাদেরকে যা কিছু দান করা হয়েছিল তার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে গেলো তখন অকস্মাত তাদেরকে পাকড়াও করলাম এবং তখন অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, তারা সব রকমের কল্যাণ থেকে নিরাশ হয়ে পড়েছিল।

২৯. আগের আয়াতে বলা হয়েছিল, তোমরা একটি নিদর্শন নিয়ে আসার দাবী জানাচ্ছো অথচ তোমাদের চারদিকে অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। এ প্রসংগে প্রথম দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রাণীদের জীবনধারা পর্যবেক্ষণ করার আহবান জানানো হয়েছিল। এরপর এখন আর একটি নিদর্শনের দিকে ইংগিত করা হচ্ছে। এ নিদর্শনটি সত্য অস্বীকারকারীদের নিজেদের মধ্যেই রয়েছে। মানুষ কোন বড় রকমের বিপদের সম্মুখীন হলে অথবা মৃত্যু তার ভয়াবহ চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালে এক আল্লাহর আশ্রয় ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল তখন আর মানুষের চোখে পড়ে না। বড় বড় মুশরিকরা এ সময় নিজেদের উপাস্য দেবতাদের কথা ভুলে এক আল্লাহকে ডাকতে থাকে। কট্টর খোদাদ্রোহী নাস্তিকও এ সময় আল্লাহর কাছে দু'হাত তুলে দোয়া করে। এ নিশানীটিকে এখানে সত্যের নিদর্শন হিসেবে পেশ করা হচ্ছে। কারণ আল্লাহ ভক্তি ও তাওহীদের সাক্ষ প্রত্যেক মানুষের নিজের মধ্যেই বিদ্যমান। এর ওপর গাফলতি ও অজ্ঞানতার যতই আবরণ পড়ুক না কেন তবুও তা কখনো না কখনো দৃষ্টি সমক্ষে জেগে ওঠে। আবু জাহেলের ছেলে ইকরামা এ ধরনের নিশানী প্রত্যক্ষ

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٧﴾

এ ভাবে যারা জুলুম করেছিল তাদের শিকড় কেটে দেয়া হলো। আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রভু আল্লাহর জন্য (কারণ তিনিই তাদের শিকড় কেটে দিয়েছেন।)।

হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো একথা ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহ তোমাদের থেকে তোমাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি ছিনিয়ে নেন এবং তোমাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন[৩০] তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন্ ইলাহ আছে যে এ শক্তিগুলো তোমাদের ফিরিয়ে দিতে পারে? দেখো, কিভাবে আমরা বারবার আমাদের নিশানীগুলো তাদের সামনে পেশ করি এবং এরপরও তারা কিভাবে এগুলো থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। বলো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যে আযাব এসে যায় তাহলে জালেমরা ছাড়া আর কেউ ধ্বংস হবে কি?

করেই ঈমানের সম্পদলাভে সক্ষম হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে মক্কা বিজিত হবার পর ইকরামা জেদ্দার দিকে পালিয়ে যান। একটি নৌকায় চড়ে তিনি হাবশার (ইথিয়োপিয়ার) পথে যাত্রা করেন। পথে ভীষণ ঝড়–তুফানে তার নৌকা চরম বিপদের সম্মুখীন হয়। প্রথমে দেবদেবীদের দোহাই দেয়া শুরু হয়। কিন্তু এতে তুফানের ভয়াবহতা কমে না বরং আরো বেড়ে যেতেই থাকে। যাত্রীদের মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, এবার নৌকা ডুবে যাবে। তখন সবাই বলতে থাকে, এখন আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ডাকলে চলবে না। একমাত্র তিনি চাইলে আমাদের বাঁচাতে পারেন। এ সময় ইকরামার চোখ খুলে যায়। তার মন বলে ওঠে, যদি এখানে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সাহায্যকারী না থেকে থাকে, তাহলে অন্য জায়গায়ই বা আর কেউ থাকবে কেন? একথাটাই তো আল্লাহর সেই নেক বান্দাটি আমাদের গত বিশ বছর থেকে বুঝাচ্ছেন আর আমরা খামখা তাঁর সাথে লড়াই করছি। এটি ছিল ইকরামার জীবনের সিদ্ধান্তকরী মুহূর্ত। সে মুহূর্তেই তিনি আল্লাহর কাছে অংগীকার করেন, যদি এ যাত্রায় আমি বেঁচে যাই, তাহলে সোজা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাবো এবং তাঁর হাতে আমার হাত দিয়ে দেবো। পরে তিনি নিজের এ অংগীকার পূর্ণ করেন। ফিরে এসে তিনি কেবল

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ۚ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

আমি যে রসূল পাঠাই তা তো কেবল এ জন্যই পাঠাই যে, তারা সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদ দানকারী এবং দুষ্কৃতকারীদের জন্য ভীতিপ্রদর্শনকারী হবে। তারপর যারা তাদের কথা মেনে নেবে এবং নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করবে তাদের জন্য কোন ভয় ও দুঃখের কারণ নেই। আর যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলবে তাদেরকে নিজেদের নাফরমানীর শাস্তি ভোগ করতেই হবে।

হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলো, "আমি তোমাদের একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে, আমি গায়েবের জ্ঞানও রাখি না এবং তোমাদের একথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো কেবলমাত্র সে অহীর অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি নাযিল করা হয়।"[৩১] তারপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে?[৩২] তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করো না?

মুসলমান হয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং অবশিষ্ট জীবন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করেই কাটান।

৩০. এখানে হৃদয়ে মোহর মেরে দেবার মানে হচ্ছে চিন্তা ও অনুধাবন করার শক্তি কেড়ে নেয়া।

৩১. অজ্ঞ লোকেরা চিরকাল এ ধরনের নির্বুদ্ধিতা প্রসূত চিন্তা পোষণ করে এসেছে যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ও তাঁর গভীর সান্নিধ্যে অবস্থানকারী ব্যক্তিকে অবশ্যি মানবিক গুণাবলীর উর্ধে অবস্থান করতে হবে। তিনি অভিনব, বিস্ময়কর ও অলৌকিক কার্যাবলী সম্পাদন করবেন। তাঁর হাতের একটি মাত্র ইশারায় পাহাড় সোনায় পরিণত হবে। তাঁর আদেশ দেবার সাথে সাথেই পৃথিবী ধন উদগীরণ করতে থাকবে। লোকদের ভূত-ভবিষ্যত তার সামনে দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট থাকবে। হারানো জিনিস কোথায় আছে তিনি এক নিমেষে বলে দেবেন। রোগী মরে যাবে, না বেঁচে উঠবে এবং প্রসূতির পেটে ছেলে না মেয়ে আছে তা বলে দিতে তার একটুও বেগ পেতে হবে না। এ ছাড়া তাকে মানবিক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতামুক্ত হতে হবে। সে ব্যক্তি আবার কেমন করে

وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾

৬ রুকূ'

আর হে মুহাম্মাদ! তুমি এ অহীর জ্ঞানের সাহায্যে তাদেরকে নসিহত করো যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের রবের সামনে কখনো এমন অবস্থায় পেশ করা হবে যে, সেখানে তাদের সাহায্য–সমর্থন বা সুপারিশ করার জন্য তিনি ছাড়া আর কেউ (ক্ষমতা ও কর্তৃত্বশালী) থাকবে না। হয়তো (এ নসিহতের কারণে সতর্ক হয়ে) তারা আল্লাহভীতির পথ অবলম্বন করবে।[৩৩] *আর যারা তাদের রবকে দিন–রাত ডাকতে থাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টারত থাকে তাদেরকে তোমার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিয়ো না।*[৩৪] *তাদের কৃতকর্ম থেকে কোন জিনিসের (জবাবদিহির) দায়িত্ব তোমার ওপর নেই এবং তোমার কৃতকর্ম থেকেও কোন জিনিসের (জবাবদিহির) দায়িত্ব তাদের ওপর নেই। এ সত্ত্বেও যদি তুমি তাদেরকে দূরে ঠেলে দাও তাহলে তুমি জালেমদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।*[৩৫]

আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করলো যে ক্ষুধা ও পিপাসা অনুভব করে এবং নিদ্রার শিকার হয়, যার স্ত্রী–পুত্র পরিবার আছে, নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যাকে কেনাবেচা করতে হয়, কখনো ঋণ নিতে হয় এবং কখনো অভাবে–অনটনে চরম দূরাবস্থার শিকার হতে হয়? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন লোকদের মনেও এ ধরনের চিন্তা বিরাজ করতো। তারা তাঁর নবুওয়াতের দাবী শুনে তার সত্যতা যাচাই করার জন্য তাঁর কাছে গায়েবের খবর জিজ্ঞেস করতো। তাঁর কাছে অলৌকিক কার্যাবলী সম্পাদন করার দবী জানাতো। তাঁকে একজন সাধারণ পর্যায়ের মানুষ দেখে তারা আপত্তি করতো যে, এ আবার কেমন পয়গম্বর যিনি খাওয়া দাওয়া করছেন, স্ত্রী–পুত্র–কন্যা নিয়ে থাকছেন এবং হাট–বাজারেও চলাফেরা করছেন? এসব কথার জবাব এ আয়াতে দেয়া হয়েছে।

৩২. এর অর্থ হচ্ছে, আমি যে সত্যগুলো তোমাদের সামনে পেশ করছি, আমি নিজে সেগুলো প্রত্যক্ষ করেছি। সরাসরি আমার অভিজ্ঞতায় সেগুলো ধরা পড়েছে। অহীর মাধ্যমে

সেগুলোর সঠিক জ্ঞান আমাকে দান করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে আমার সাক্ষ চাক্ষুস সাক্ষ ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ তোমরা এ সত্যগুলোর ব্যাপারে একেবারেই অন্ধ। তোমরা এ সত্যগুলো সম্পর্কে যেসব চিন্তা পোষণ করে থাকো তা নিছক আন্দাজ–অনুমান ও ধারণা–কল্পনা ভিত্তিক অথবা সেগুলোর ভিত গড়ে উঠেছে নিছক অন্ধ অনুসরণের ওপর। কাজেই আমার ও তোমাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে চক্ষুষ্মান ও অন্ধের পার্থক্য। তোমাদের ওপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব কেবল এ কারণেই। আমার কাছে আল্লাহর কোন গোপন ধনভাণ্ডার আছে অথবা আমি গায়েবের খবর জানি বা মানবিক দুর্বলতা থেকে আমি মুক্ত—এ জাতীয় কোন বৈশিষ্টের কারণে তোমাদের ওপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

৩৩. এর অর্থ হচ্ছে, যারা দুনিয়ার জীবনে এমনভাবে নিমগ্ন হয়েছে যে, তাদের মৃত্যুর চিন্তাই নেই এবং কখনো আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে এমন কথা ভাবেও না, তাদের জন্য এ নসীহত কখনো ফলপ্রসূ হবে না। অনুরূপভাবে যারা এই ভিত্তিহীন ভরসায় জীবন যাপন করছে যে, দুনিয়ায় তারা যাই কিছু করুক না কেন আখেরাতে তাদের সামান্যতম ক্ষতিও হবে না, কারণ তারা অমুকের সাথে সম্পর্ক পাতিয়ে রেখেছে। অমুক তাদের জন্য সুপারিশ করবে অথবা অমুক তাদের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে, তাদের ওপরও এর কোন প্রভাব পড়বে না। কাজেই এ ধরনের লোকদেরকে বাদ দিয়ে তুমি এমন লোকদেরকে সম্বোধন করো যাদের মনে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবার ভীতি বিরাজমান এবং তাঁর ব্যাপারে কোন মিথ্যা আশ্বাসবাণীতে বিশ্বাস করে না। কেবলমাত্র এ ধরনের লোকদের ওপরই এ নসীহতের প্রভাব পড়তে পারে এবং তাদের সংশোধনের আশা করা যেতে পারে।

৩৪. কুরাইশদের বড় বড় সরদার এবং তাদের বিত্তবান ও স্বচ্ছল লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উত্থাপন করেছিল তার একটি ছিল এই যে, আপনার চারদিকে আমাদের জাতির ক্রীতদাস, মুক্তি প্রাপ্ত ক্রীতদাস এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা সমবেত হয়েছে। তারা এ বলে নিন্দা ও বিদ্রূপ করতোঃ দেখো, এ ব্যক্তির সাথীও জুটেছে কত বড় সব সম্ভ্রান্ত লোকেরা! বেলাল, আম্মার, সোহাইব, খাব্বাব এরাই তার সাথী। আল্লাহ আমাদের মধ্য থেকে সম্মানিত করার জন্য কি এদের ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পেলেন না? তারপর তারা এ ঈমান গ্রহণকারীদের কেবল দূরবস্থার প্রতি বিদ্রূপ করেই ক্ষান্ত হতো না, তাদের মধ্য থেকে যারা ইতিপূর্বে কোন নৈতিক দুর্বলতার শিকার হয়েছিল তারও সমালোচনা করতো এবং বলতো, যারা গতকাল পর্যন্ত এমন ছিল এবং অমুক ব্যক্তি যে অমুক কাজটি করেছিল, এসব লোকই এই 'সম্মানিত দলের' অন্তরভুক্ত হয়েছে। এখানে এসব কথার জবাব দেয়া হয়েছে।

৩৫. অর্থাৎ নিজের দোষ–গুণ ও ভাল–মন্দের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই দায়ী। এ ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তির কাজের জবাবদিহি করার জন্য তুমি দাঁড়াবে না এবং তোমার কাজের জবাবদিহি করার জন্যও তাদের কেউ দাঁড়াবে না। তোমার অংশের কোন নেকী তারা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এবং তাদের অংশের কোন গোনাহও তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারবে না। এরপরও যখন তারা নিছক সত্যান্বেষী হিসেবে তোমার কাছে আসে তখন তুমি তাদেরকে দূরে ঠেলে দেবে কেন?

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا ۭ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ۝٥٣ وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰي نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْۗءًۢا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥٤ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝٥٥

আসলে আমি এভাবে মানুষের মধ্য থেকে এক দলকে আর এক দলের সাহায্যে পরীক্ষা করেছি,[৩৬] যাতে তারা এদেরকে দেখে বলে, "এরা কি সেসব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন?"—হাঁ, আল্লাহ কি তাঁর শোকরগুজার বান্দা কারা, সেটা এদের চাইতে বেশী জানেন না? আমার আয়াতের প্রতি যারা ঈমান আনে তারা যখন তোমার কাছে আসে তখন তাদেরকে বলো, "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের রব দয়া ও অনুগ্রহের নীতি নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছেন। তোমাদের কেউ যদি অজ্ঞতা বশত কোন খারাপ কাজ করে বসে, তারপর তাওবা করে এবং সংশোধন করে নেয়, তাহলে তিনি তাকে মাফ করে দেন এবং নরম নীতি অবলম্বন করেন, এটি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহেরই প্রকাশ।[৩৭] আর এভাবে আমি আমার নিশানীগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করে থাকি যাতে অপরাধীদের পথ একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৩৮]

৩৬. অর্থাৎ সমাজের নিম্ন পর্যায়ে অবস্থানকারী দরিদ্র, অভাবী ও কপর্দকহীনদেরকে সর্বপ্রথম ঈমান আনার সুযোগ দান করে আমি ধন ও বিত্তের অহংকারে মত্ত লোকদেরকে পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করেছি।

৩৭. যারা সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিলেন তাদের মধ্যে বহু লোক এমনও ছিলেন, যারা জাহেলী যুগে বড় বড় গোনাহ করেছিলেন। এখন ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে বদলে গেলেও ইসলাম বিরোধীরা তাদের পূর্ববর্তী জীবনের দোষ ও কার্যাবলীর জন্য তাদেরকে বিদ্রূপ করতো ও খোঁটা দিতো। এর জবাবে বলা হচ্ছে ঃ ঈমানদারদেরকে সান্ত্বনা দাও। তাদেরকে বলো, যে ব্যক্তি তাওবা করে নিজের সংশোধন করে নেয় তার পেছনের গোনাহের জন্য তাকে পাকড়াও করা আল্লাহর রীতি নয়।

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ قُلْ لَا أَتَّبِعُ
أَهْوَاءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ
مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ
إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا
تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

৭ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলে দাও, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য যাদেরকে ডাকো তাদের বন্দেগী করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বলো, আমি তোমাদের ইচ্ছা–বাসনার অনুসরণ করবো না। এমনটি করলে আমি বিপথগামী হবো এবং সরল–সত্য পথ লাভকারীদের অন্তরভুক্ত থাকবো না। বলো, আমার রবের পক্ষ থেকে আমি একটি উজ্জ্বল প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তোমরা তাকে মিথ্যা বলেছো। এখন তোমরা যে জিনিসটি তাড়াতাড়ি চাচ্ছো সেটি আমার ক্ষমতার আওতাধীন নয়।[৩৯] *ফায়সালার সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। তিনিই সত্য বিবৃত করেন এবং তিনিই সবচেয়ে ভাল ফায়সালাকারী। বলো, তোমরা যে জিনিসটি তাড়াতাড়ি চাচ্ছো সেটি যদি আমার আওতার মধ্যে থাকতো তাহলে তো আমার ও তোমাদের মধ্যে কবেই ফায়সালা হয়ে যেতো। কিন্তু জালেমদের সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করা উচিত তা আল্লাহই ভাল জানেন।*

৩৮. "এভাবে" শব্দটি বলে ইংগিত করা হয়েছে এ সমগ্র ধারাবাহিক ভাষণটির প্রতি—যেটি শুরু হয়েছে চতুর্থ রুকূ'র নিম্নোক্ত আয়াতটি থেকে ঃ "তারা বলে, এ নবীর ওপর তার রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন?" এর অর্থ হচ্ছে, এ ধরনের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন দলীল, প্রমাণ ও নিদর্শনের পরও যারা নিজেদের কুফরী, অস্বীকার ও অবাধ্যতার ওপর জিদ ধরে চলছে, তাদের অপরাধী হওয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। এ সংগে এ সত্যটি দিবালোকের মত স্বচ্ছ হয়ে ভেসে উঠছে যে, আসলে এসব লোক নিজেদের গোমরাহী প্রীতির কারণেই এ পথে চলছে। সত্যপথে চলার স্বপক্ষে যুক্তি–প্রমাণ তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি অথবা নিজেদের এ গোমরাহীর পক্ষেও তাদের কাছে কিছু দলীল–প্রমাণ আছে, এ কারণে তারা এ পথে চলছে না।

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٩﴾ وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٠﴾

তাঁরই কাছে আছে অদৃশ্যের চাবি, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। জলে স্থলে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে গাছের একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকার প্রদেশে এমন একটি শস্যকণাও নেই যে সম্পর্কে তিনি অবগত নন। শুষ্ক ও আর্দ্র সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত আছে। তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিবসে তোমরা যা কিছু করো তা জানেন। আবার পরদিন তোমাদের সেই কর্মজগতে ফেরত পাঠান, যাতে জীবনের নির্ধারিত সময়–কাল পূর্ণ হয়। সবশেষে তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি জানিয়ে দেবেন তোমরা কি কাজে লিপ্ত ছিলে।

৩৯. এখানে আল্লাহর আযাবের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। বিরোধীরা বলছিল, যদি তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী হয়ে থাকো তাহলে আমরা যেখানে প্রকাশ্যে তোমাকে মিথ্যুক বলছি এবং তোমার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করছি সেখানে আল্লাহর আযাব আমাদের ওপর আপতিত হচ্ছে না কেন? তোমার আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত হবার বিষয়টি একথা দাবী করে যে, কেউ তোমাকে মিথ্যুক বলার ও অবমাননা করার সাথে সাথেই মাটির বুক বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং সে তার মধ্যে চাপা পড়ে যাবে অথবা সাথে সাথেই বজ্রপাত হবে এবং সে বজ্রাঘাতে সে পুড়ে ভষ্ম হয়ে যাবে। আল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তি এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান আনছে তাদের ওপর বিপদের পরে বিপদ আসছে এবং তাদেরকে হেয় ও অপদস্থ করা হচ্ছে অথচ যারা তাদেরকে গালিগালাজ করছে এবং তাদের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারছে তারা আরামে ও নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করছে।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ؕ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۟ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿٦٢﴾ قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٣﴾ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾

৮ রুকূ'

তিনি নিজের বান্দাদের ওপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং তোমাদের ওপর রক্ষক নিযুক্ত করে পাঠান।[৪০] অবশেষে যখন তোমাদের কারোর মৃত্যুর সময় সমুপস্থিত হয় তখন তাঁর প্রেরিত ফেরেশতারা তার প্রাণ বের করে নেয় এবং নিজেদের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তারা সামান্যতম শৈথিল্যও দেখায় না। তারপর তাদের প্রকৃত মালিক ও প্রভু আল্লাহর দিকে তাদের সবাইকে ফিরিয়ে আনা হয়। সাবধান হয়ে যাও, ফায়সালা করার যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র তিনিই এবং তিনি হিসেব গ্রহণের ব্যাপারে অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন।

হে মুহাম্মাদ! এদেরকে জিজ্ঞেস করো, জল–স্থলের গভীর অন্ধকারে কে তোমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে? কার কাছে তোমরা কাতর কণ্ঠে ও চুপে চুপে প্রার্থনা করো? কার কাছে বলে থাকো, এ বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করলে আমরা অবশ্যি তোমার শোকরগুজারী করবো?—বলো, আল্লাহ তোমাদের এ থেকে এবং প্রতিটি দুঃখ–কষ্ট থেকে মুক্তি দেন। এরপরও তোমরা অন্যদেরকে তাঁর সাথে শরীক করো।[৪১]

৪০. অর্থাৎ এমন ধরনের ফেরেশতা নিযুক্ত করেন, যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কথা এবং তৎপরতার ওপর, প্রতিটি নড়াচড়ার ওপর নজর রাখে এবং তোমাদের প্রতিটি গতিবিধিকে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করতে থাকে।

৪১. অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহই যে, সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন, সকল শক্তির অধিকারী, সমস্ত ইখতিয়ার ও কর্মক্ষমতা যে, তাঁরই হাতে সীমাবদ্ধ, তোমাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ করার যাবতীয় ক্ষমতা যে, তাঁরই আয়ত্তাধীন এবং তাঁরই হাতে যে, রয়েছে তোমাদের

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن
تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۗ
انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ
وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿٦٦﴾ لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ ۚ وَسَوْفَ
تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ
بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾

বলো, তিনি ওপর থেকে বা তোমাদের পদতল থেকে তোমাদের ওপর কোন আযাব নাযিল করতে অথবা তোমাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে এক দলকে আর এক দলের শক্তির স্বাদ গ্রহণ করিয়ে দিতে সক্ষম। দেখো, আমি কিভাবে বারবার বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমার নিদর্শনসমূহ তাদের সামনে পেশ করছি, হয়তো তারা এ সত্যটি অনুধাবন করবে।[৪২] তোমার জাতি সেটি অস্বীকার করছে। অথচ সেটি সত্য। এদেরকে বলে দাও, আমাকে তোমাদের ওপর হাবিলদার নিযুক্ত করা হয়নি।[৪৩] প্রত্যেকটি খবর প্রকাশিত হবার একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। শীঘ্রই তোমরা নিজেরাই পরিণাম জানতে পারবে।

আর হে মুহাম্মাদ! যখন তুমি দেখো, লোকেরা আমার আয়াতের মধ্যে দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন তাদের কাছ থেকে সরে যাও, যে পর্যন্ত না তারা এ আলোচনা বাদ দিয়ে অন্য প্রসংগে লিপ্ত হয়। আর যদি কখনো শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়,[৪৪] তাহলে যখনই তোমার মধ্যে এ ভুলের অনুভূতি জাগে তারপর আর এ জালেম লোকদের কাছে বসো না।

ভাগ্যের চাবিকাঠি—এ সত্যগুলোর সাক্ষ তো তোমাদের নিজেদের অস্তিত্বের মধ্যেই বিদ্যমান। কোন কঠিন সংকটকাল এলে এবং যাবতীয় উপায় উপকরণ হাতছাড়া হতে দেখা গেলে তোমরা নিতান্ত অসহায়ের মতো তাঁর আশ্রয় চাও। কিন্তু এ সমস্ত দ্ব্যর্থহীন আলামত থাকা সত্ত্বেও তোমরা প্রভূত্বের ক্ষেত্রে কোন প্রকার যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই তাঁর সাথে অন্যদেরকে শরীক করেছো। তাঁরই দেয়া জীবিকায় প্রতিপালিত হয়ে অন্নদাতা

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ ۝٦٩ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ۚ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ
بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝٧٠

তাদের কৃতকর্ম থেকে কোন কিছুর দায়-দায়িত্ব সতর্কতা অবলম্বনকারীদের ওপর নেই। তবে নসীহত করা তাদের কর্তব্য। হয়তো তারা ভুল কর্মনীতি অবলম্বন করা থেকে বেঁচে যাবে।[৪৫] যারা নিজেদের দীনকে খেল-তামাশায় পরিণত করেছে এবং দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারণায় নিক্ষেপ করেছে তাদেরকে পরিত্যাগ করো। তবে এ কুরআন শুনিয়ে উপদেশ দিতে ও সতর্ক করতে থাকো, যাতে কোন ব্যক্তি নিজের কর্মকাণ্ডের দরুন ধ্বংসের শিকার না হয়, যখন আল্লাহর হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য কোন রক্ষাকারী, সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী থাকবে না, আর যদি সে সম্ভাব্য সকল জিনিসের বিনিময়ে নিষ্কৃতি লাভ করতে চায় তাহলে তাও গৃহীত হবে না। কারণ, এ ধরনের লোকেরা তো নিজেরাই নিজেদের কৃতকর্মের ফলে ধরা পড়ে যাবে। নিজেদের সত্য অস্বীকৃতির বিনিময়ে তারা পান করার জন্য পাবে ফুটন্ত পানি আর ভোগ করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

বলছো অন্যদেরকে। তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা লাভ করে অন্যদেরকে বন্ধু ও সাহায্যকারী আখ্যা দিচ্ছো। তাঁর দাস হওয়া সত্ত্বেও অন্যদের বন্দেগী ও দাসত্ব করছো। সংকট থেকে তিনিই উদ্ধার করেন এবং বিপদ ও দুঃখ-কষ্টের দিনে তাঁরই কাছে কান্নাকাটি করো কিন্তু তাঁর সহায়তায় সে কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করার পর অন্যদেরকে ত্রাণকর্তা মনে করতে থাকো এবং অন্যদের নামে নযরানা দিতে থাকো।

৪২. আল্লাহর আযাবকে নিজেদের থেকে দূরে অবস্থান করতে দেখার কারণে তারা সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করার ব্যাপারে অত্যন্ত দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে চলছিল। তাই তাদের উদ্দেশ্যে এখানে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলা হচ্ছে, আল্লাহর আযাব আসতে একটুও দেরী

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾ وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ؕ وَهُوَ الَّذِىْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٢﴾

৯ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, আমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ডাকবো, যারা আমাদের উপকারও করতে পারে না, অপকারও করতে পারে না? আর আল্লাহ যখন আমাদের সোজা পথ দেখিয়ে দিয়েছেন তখন আবার কি আমরা উল্টো দিকে ফিরে যাবো? আমরা কি নিজেদের অবস্থা সে ব্যক্তির মতো করে নেবো, যাকে শয়তানরা মরুভূমির বুকে পথ ভুলিয়ে দিয়েছে এবং সে হয়রান, পেরেশান ও উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? অথচ তার সাথীরা তাকে চীৎকার করে ডেকে বলছে, এদিকে এসো, এখানে রয়েছে সোজা পথ? বলো, আসলে আল্লাহর হেদায়াতই একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল হেদায়াত এবং তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে নির্দেশ এসেছে, বিশ্ব-জাহানের প্রভুর সামনে আনুগত্যের শির নত করে দাও, নামায কায়েম করো এবং তাঁর নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকো। তাঁরই কাছে তোমাদের সমবেত করা হবে।

হয় না। একটি ঘূর্ণিঝড় অকস্মাত তোমাদের সবকিছু বরবাদ করে দিতে পারে। ভূমিকম্পের একটি মাত্র ঝট্‌কা তোমাদের সমগ্র জনপদকে ধূলিস্মাত করে দেবার জন্য যথেষ্ট। গোত্রীয় ও জাতীয় বিবাদ বিসম্বাদ এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিরাজমান শত্রুতার বারুদে শুধু ছোট্ট একটু খানি আগুনের স্ফুলিংগ রেখে দিলেই তা এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্ম দিতে পারে যার ফলে বছরের পর বছর ধরে রক্তপাত, বিশৃংখলা ও অশান্তি থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হবে না। কাজেই আযাব আসছে না বলে তোমরা গাফলতির জোয়ারে বেহুঁশের মতো গা ভাসিয়ে দিয়ো না। তোমরা যেন একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে ভুল-নির্ভুল, ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যার মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করা ছাড়াই অন্ধের মতো জীবন পথে এগিয়ে চলো না। আল্লাহ তোমাদের অবকাশ দিয়েছেন এবং তোমাদের সামনে এমন সব নিশানী পেশ করছেন যার সাহায্যে তোমরা সত্যকে চিনে নিয়ে সঠিক ও নির্ভুল পথ অবলম্বন করতে পারবে, এটাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করো।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٧٣﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ۖ إِنِّي أَرٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٧٤﴾ وَكَذٰلِكَ نُرِي إِبْرٰهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾

তিনিই যথাযথভাবে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।[৪৬] আর যেদিন তিনি বলবেন, হাশর হয়ে যাও, সেদিনই তা হয়ে যাবে। তাঁর কথা যথার্থ অকাট্য সত্য। আর যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে[৪৭] সেদিন রাজত্ব হবে একমাত্র তাঁরই।[৪৮] তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য[৪৯] সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন এবং তিনি প্রজ্ঞাময় ও সবকিছু জানেন।

ইবরাহীমের ঘটনা স্মরণ করো যখন সে তার পিতা আযরকে বলেছিল, "তুমি কি মূর্তিগুলোকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করছো?[৫০] আমি তো দেখছি, 'তুমি ও তোমার জাতি প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত।'' ইবরাহীমকে এভাবেই আমি যমীন ও আসমানের রাজ্য পরিচালন ব্যবস্থা দেখাতাম।[৫১] আর এ জন্য দেখাতাম যে, এভাবে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তরভূক্ত হয়ে যাবে।[৫২]

৪৩. অর্থাৎ তোমরা যা দেখতে পাচ্ছো না তা জোর করে তোমাদের দেখিয়ে দেয়া এবং যা বুঝতে পারছো না তা জোর করে তোমাদের বুঝিয়ে দেয়া আমার কাজ নয়। আর তোমরা না দেখলে ও না বুঝলে তোমাদের ওপর আযাব নাযিল করাও আমার কাজ নয়। আমার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যাকে সুস্পষ্ট করে তোমাদের সামনে তুলে ধরা। এখন যদি তোমরা তা মেনে নিতে প্রস্তুত না হও তাহলে যে খারাপ পরিণতির ভয় তোমাদের দেখিয়ে আসছি তা যথা সময়ে তোমাদের সামনে এসে যাবে।

৪৪. অর্থাৎ যদি কখনো আমার এ নির্দেশ ভুলে যাও এবং ভুলবশত এ ধরনের লোকদের সাহচর্যে গিয়ে বসো।

৪৫. এর অর্থ হচ্ছে, যারা নিজেরা আল্লাহর নাফরমানী থেকে দূরে অবস্থান করে কাজ করতে থাকে, নাফরমানদের কোন কাজের দায়–দায়িত্ব তাদের ওপর নেই। সুতরাং নাফরমানদের সাথে তর্ক–বিতর্ক করে যেনতেন প্রকারে তাদের সমর্থন আদায় করতেই হবে এবং তাদের প্রত্যেকটি আজেবাজে প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে আর তারা সত্যকে

স্বীকার না করলে কোন না কোনভাবে তাদের স্বীকৃতি আদায় করে নিতেই হবে, এ ধরনের দায়িত্ব কেন তারা খামখা নিজেদের ওপর চাপিয়ে নেবে? তাদের দায়িত্ব শুধু এতটুকু, যাদেরকে ভুল পথে চলতে দেখবে তাদেরকে উপদেশ দেবে এবং সত্যকে তাদের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবে। তারপর যদি তারা সত্যকে না মানে এবং ঝগড়া–ঝাঁটি ও তর্ক–বিতর্ক করতে প্রবৃত্ত হয় তাহলে তাদের সাথে অযথা বুদ্ধির লড়াই করে নিজের শক্তি ও সময় নষ্ট করা সত্যপন্থীদের কাজ নয়। এ ধরনের গোমরাহীর প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ব্যক্তিদের পেছনে সময় ও শক্তি নষ্ট না করে যারা নিজেরাই সত্যের সন্ধানে লিপ্ত তাদের শিক্ষা–দীক্ষা সংশোধন এবং উপদেশ দানে সত্যপন্থীদের সময় ব্যয় করা উচিত।

৪৬.. কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে বা হকের সাথে সৃষ্টি করেছেন। এ বাণীটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ।

এর একটি অর্থ হচ্ছে, পৃথিবী ও আকাশসমূহের সৃষ্টি নিছক খেলাচ্ছলে সাধিত হয়নি। এটি ঈশ্বরের বা ভগবানের লীলা নয়। এটি কোন শিশুর হাতের খেলনাও নয়। নিছক মন ভুলাবার জন্য কিছুক্ষণ খেলার পর শিশু অকস্মাত একে ভেঙ্গে চুরে শেষ করে ফেলে দেবে এমনও নয়। আসলে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ। অত্যন্ত গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের ভিত্তিতে এ কাজটি করা হয়েছে। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে একটি বিরাট উদ্দেশ্য। এর একটি পর্যায় অতিক্রান্ত হবার পর এ পর্যায়ে যে সমস্ত কাজ হয়েছে তার হিসেব নেয়া এবং এই পর্যায়ের কাজের ফলাফলের ওপর পরবর্তী পর্যায়ের বুনিয়াদ রাখা স্রষ্টার জন্য একান্ত অপরিহার্য। এ কথাটিকেই অন্যান্য জায়গায় এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا "হে আমাদের রব! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করোনি।"

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ

"আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে সেগুলোকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।"

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ –

"তোমরা কি ভেবেছো, আমি তোমাদেরকে এমনি অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার দিকে ফিরিয়ে আনা হবে না?"

দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে ঃ আল্লাহ তাআলা বিশ্ব–জাহানের গোটা ব্যবস্থা ও অবকাঠামোকে নিরেট ও নির্ভেজাল সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ন্যায়নীতি, সূক্ষ্মদর্শীতা ও বিচক্ষণতা এবং সততার বিধান এর প্রতিটি জিনিসের পেছনে ক্রিয়াশীল। বাতিল ও অসত্যের জন্য শেকড় গাড়া ও ফলপ্রসূ হবার কোন অবকাশই এ অবকাঠামোতে নেই। অবশ্য বাতিলপন্থীরা যদি তাদের মিথ্যা, অন্যায় ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটাতে চায়, তবে তাদেরকে সে জন্য চেষ্টা–সাধনা চালানোর কিছু সুযোগ আল্লাহ দিতেও

পারেন—সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে বাতিলের প্রতিটি বীজকে পৃথিবী উগরে ফেলে দেবে এবং শেষ হিসেব–নিকেশে প্রত্যেক বাতিলপন্থী দেখতে পাবে যে, এ নোংরা ও অবাঞ্ছিত বৃক্ষের চাষ করতে সে যত চেষ্টা চালিয়েছে, তার সবই বৃথা ও নিষ্ফল হয়ে গেছে।

তৃতীয় অর্থ হচ্ছে ঃ মহান আল্লাহ বিশ্ব–জাহানের এ সমগ্র ব্যবস্থাপনাটি হকের তথা নিরেট ও নির্ভেজাল সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাঁর নিজস্ব হক ও অধিকারের ভিত্তিতে তার ওপর শাসন কর্তৃত্ব চালাচ্ছেন। তাঁর হুকুম এখানে এ জন্য চলে যে, তিনিই তাঁর সৃষ্ট এ বিশ্ব–জাহানের ওপর রাজত্ব করার অধিকার রাখেন। আপাত দৃষ্টিতে যদি অন্যদের রাজত্বও এখানে চলতে দেখা যায় তাহলে তাতে প্রতারিত হয়ো না। প্রকৃতপক্ষে তাদের হুকুম চলে না, চলতে পারেও না। কারণ এ বিশ্ব–জাহানের কোন জিনিসের ওপর তাদের কর্তৃত্ব চালাবার কোন অধিকারই নেই।

৪৭. শিংগায় ফুঁক দেবার সঠিক স্বরূপ ও ধরনটা কি হবে তার বিস্তারিত চেহারা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কুরআন থেকে আমরা যা কিছু জানতে পেরেছি তা কেবল এতটুকু যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর হুকুমে একবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং তাতে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর নাজানি কত সময় কত বছর চলে যাবে, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন, দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। এর ফলে পূর্বের ও পরের এবং প্রথমের ও শেষের সবাই পুনর্বার জীবিত হয়ে নিজেদেরকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত দেখতে পাবে। প্রথম ফুঁকে বিশ্ব–জাহানের সমস্ত ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়বে, সবকিছু ওলট পালট ও লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ফুঁকে নতুন প্রকৃতি ও নতুন আইন কানুন নিয়ে আর একটি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হবে।

৪৮. এর অর্থ এ নয় যে, সেদিন রাজত্ব তাঁর হবে আর আজকে রাজত্ব তাঁর নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, সেদিন যখন পর্দা উঠে যাবে, অন্তরাল সরে যাবে এবং প্রকৃত অবস্থা একেবারে সামনে এসে যাবে, তখন জানা যাবে, যাদেরকে দুনিয়ায় ক্ষমতাশালী দেখা যেতো, তারা সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন এবং যে আল্লাহ এ বিশ্ব–জাহান সৃষ্টি করেছেন রাজত্ব করার সমস্ত ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের একমাত্র ও একচ্ছত্রভাবে তিনিই অধিকারী।

৪৯. সৃষ্টির দৃষ্টি থেকে যা কিছু গোপন আছে তাই অদৃশ্য।

সৃষ্টির সামনে যা কিছু প্রকাশিত ও তার গোচরীভূত, তাই দৃশ্য।

৫০. এখানে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনাবলী উল্লেখ করে এ বিষয়টির পক্ষে সমর্থন ও সাক্ষ পেশ করা হচ্ছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের বদৌলতে যেভাবে আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীরা শিরককে অস্বীকার করেছেন এবং সকল কৃত্রিম ইলাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একমাত্র বিশ্ব–জাহানের মালিক, স্রষ্টা ও প্রভু আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নত করে দিয়েছেন ঠিক তেমনি ইতিপূর্বে ইবরাহীম আলাইহিস সালামও করেছেন। আর যেভাবে আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর ওপর যারা ঈমান এনেছেন তাদের সাথে তাদের মূর্খ ও অজ্ঞ জাতি ঝগড়া ও বিতর্ক করছে ঠিক তেমনি ইতিপূর্বে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথেও তার জাতি বাক–বিতণ্ডা করেছে। উপরন্তু ইতিপূর্বে হযরত ইবরাহীম

আলাইহিস সালাম তাঁর জাতিকে যে জওয়াব দিয়েছিলেন আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের পক্ষ থেকেও তাদের জাতির জন্য রয়েছে সেই একই জওয়াব। নূহ, ইবরাহীম ও ইবরাহীমী বংশোদ্ভূত সমস্ত নবী যে পথে চলেছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে একই পথে চলছেন। কাজেই এখন যারা তাঁর আনুগত্য অস্বীকার করছে তাদের জেনে রাখা উচিত, তারা নবীদের পথ থেকে সরে গিয়ে গোমরাহীর পথ অবলম্বন করেছে।

এ প্রসংগে আরো একটি কথা মনে রাখতে হবে। আরবের লোকেরা সাধারণভাবে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নিজেদের নেতা ও শ্রেষ্ঠ অনুসরণীয় পূর্বপুরুষ হিসেবে স্বীকার করতো। বিশেষ করে কুরাইশ বংশের লোকদের সমস্ত আভিজাত্যবোধের মূলে ছিল তাদের ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধর হবার এবং তাঁর নির্মিত কাবাঘরের সেবক হবার অহংকার। তাই তাদের সামনে হযরত ইবরাহীমের তাওহীদ বিশ্বাস ও শির্ক অস্বীকৃতি এবং মুশরিক সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর বিতর্কের উল্লেখ করার অর্থ ছিল যে জিনিস কুরাইশদের সমস্ত আভিজাত্য গৌরবের উৎস ছিল এবং মুশরিকী ও পৌত্তলিক ধর্মের ওপর আরবের কাফের সমাজের যে পরিপূর্ণ মনস্তুষ্টি ও তৃপ্তি ছিল তা ছিনিয়ে নেয়া এবং তাদের ওপর একথা প্রমাণ করে দেয়া যে, আজ মুসলমানরা ঠিক সেখানে অবস্থান করছে যেখানে ইতিপূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ) ছিলেন এবং তোমাদের অবস্থা এখন সেই পর্যায়ভুক্ত যে পর্যায়ে অবস্থান করছিল সেদিন হযরত ইবরাহীমের সাথে বিতর্ককারী তাঁর মূর্খ জাতি। এটা ঠিক তেমনি যেমন হযরত আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ভক্ত-অনুরক্ত ও কাদেরী বংশজাত পীরজাদাদের সামনে হযরত শায়খের আসল শিক্ষা ও তাঁর জীবনের ঘটনাবলী পেশ করে কেউ যদি প্রমাণ করে দেয় যে, যে মহান ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে তোমরা নিজেদেরকে গৌরবান্বিত মনে করো তোমাদের নিজেদের নিয়ম-রীতি ও কর্মকাণ্ড তার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তোমাদের পীর ও মুরশিদ সারা জীবন যাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেছেন তোমরা আজ সেসব গোমরাহ লোকের পথ অবলম্বন করেছো।

৫১. অর্থাৎ তোমাদের সামনে আজ যেমন বিশ্ব-জাহানের নিদর্শনাবলী সুস্পষ্ট এবং আল্লাহর নিশানীগুলো তোমাদর দেখানো হচ্ছে ঠিক তেমনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সামনেও এ নিদর্শন ও নিশানীগুলোই ছিল। কিন্তু তোমরা এগুলো দেখার পরও এমন ভাব করছো যেন অন্ধের মতো কিছুই দেখতে পাও না। অথচ ইবরাহীম এগুলো দেখেছিলেন একজন সত্যিকার চক্ষুষ্মান ব্যক্তির মতো বিস্ফারিত নেত্রে। এ একই সূর্য, চন্দ্র, তারকা প্রতিদিন তোমাদের সামনে উদিত হচ্ছে। উদয়কালে এরা তোমাদের যেমন গোমরাহীতে লিপ্ত দেখে অস্তমিত হবার সময়ও ঠিক তেমনি একই অবস্থায় রেখে যায়। সে চক্ষুষ্মান মানুষটিও এদেরকে দেখেছিলেন এবং এ নিদর্শন ও নিশানীগুলোর মাধ্যমে তিনি প্রকৃত মহাসত্যের সন্ধান লাভ করেছিলেন।

৫২. কুরআনের এ আয়াতের বক্তব্য এবং হযরত ইবরাহীমের সাথে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের বিতর্কের বিবরণ আরো যে সমস্ত আয়াতে এসেছে সেগুলো ভালভাবে অনুধাবন করতে হলে হযরত ইবরাহীমের নিজ এলাকার সমকালীন জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। আধুনিক

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও খনন কার্যের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম যে শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কেবলমাত্র সেই শহরটিই আবিষ্কৃত হয়নি বরং ইবরাহীমের যুগে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক অবস্থা কেমন ছিল তার ওপরও যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। স্যার লিওনার্ড উলী (SIR LEONARD WOOLLEY) তাঁর 'আব্রাহাম' (Abraham, London, 1935) গ্রন্থে এ গবেষণার যে ফল প্রকাশ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত সার নীচে দেয়া হলো।

আধুনিক ইতিহাস গবেষকগণ সাধারণভাবে এ মত প্রকাশ করেছেন যে, খৃষ্টপূর্ব ২১০০ সালের কাছাকাছি সময়ে হযরত ইবরাহীমের আবির্ভাব হয়। অনুমান করা হয়, এ সময় "উর" শহরের জনসংখ্যা ছিল আড়াই লাখ। পাঁচ লাখ থাকাটাও অসম্ভব নয়। এটি ছিল বৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। একদিকে পামীর ও নীলগিরি পর্যন্ত এলাকা থেকে সেখানে পণ্য সম্ভার আমদানী হতো এবং অন্যদিকে আনাতোলিয়া পর্যন্ত তার বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিস্তৃত ছিল। উর্ যে রাজ্যটির কেন্দ্রীয় শহর হিসেবে পরিচিত ছিল তার সীমানা বর্তমান ইরাক রাষ্ট্রের উত্তর এলাকায় কিছু কম এবং পশ্চিম দিকে কিছু বেশীদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দেশের অধিকাংশ জনবসতি শিল্প ও ব্যবসায়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এ যুগের যে শিলালিপিগুলো পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায়, সেখানকার অধিবাসীদের জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভংগী ছিল সম্পূর্ণ বস্তুবাদী। অর্থ উপার্জন করা এবং আরাম, আয়েশ ও বিলাস উপকরণ সংগ্রহ করাই ছিল তাদের জীবনের প্রধানতম লক্ষ। সুদী কারবার সারা দেশে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল। জনগণ ছিল কঠোর ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন। প্রত্যেকে অন্যকে সন্দেহের চোখে দেখতো এবং পরস্পরের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমার প্রচলন ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। নিজেদের উপাস্য দেবতা ও 'ইলাহ'দের কাছে তারা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দীর্ঘায়ু, আর্থিক সচ্ছলতা ও ব্যবসায়িক উন্নতি লাভের জন্য দোয়া করতো। দেশের জনগোষ্ঠী তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

(এক) আমীলু ঃ এরা ছিল উচ্চ শ্রেণীভুক্ত। এদের অন্তরভুক্ত ছিল পূজারী পুরোহিত, পদস্থ সরকারী কর্মচারীবৃন্দ, সেনাবাহিনীর অফিসারবৃন্দ এবং এ পর্যায়ের অন্যান্য লোকেরা।

(দুই) মিশকীনু ঃ ব্যবসায়ী, শিল্পী, কারিগর ও কৃষিজীবীরা এর অন্তরভুক্ত।

(তিন) আরদূ ঃ অর্থাৎ দাস।

এদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীটি অর্থাৎ আমীলুরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল। তাদের ফৌজদারী ও দেওয়ানী অধিকার ছিল অন্যদের তুলনায় স্বতন্ত্র। তাদের অর্থ-সম্পদ ও প্রাণের মূল্যও ছিল অন্যদের চাইতে বেশী।

এহেন নাগরিক ও সামাজিক পরিবেশে হযরত ইবরাহীমের জন্ম হয়। তালমূদে আমরা হযরত ইবরাহীম ও তার পরিবারের অবস্থার যে বর্ণনা পাই তা থেকে জানা যায়, তিনি আমীলু শ্রেণীর অন্তরভুক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন রাজ্যের সবচেয়ে বড় সরকারী অফিসার। (সূরা বাকারা, ২৯০ টীকা দেখুন)

উর নগরীর শিলালিপিতে প্রায় পাঁচ হাজার উপাস্য দেবতা ও খোদার নাম পাওয়া যায়। দেশের বিভিন্ন শহরের খোদা ছিল বিভিন্ন। প্রত্যেক শহরের একজন বিশেষ রক্ষক খোদার

আসনে বসেছিল। তাকে নগরীর প্রভু, মহাদেব বা খোদাদের প্রধান মনে করা হতো। অন্যান্য মাবুদদের তুলনায় তার মর্যাদা হতো অনেক বেশী। উরের 'নগর প্রভু' ছিল 'নান্নার' (চন্দ্র দেব)। এ সম্পর্কের কারণে পরবর্তীকালের লোকেরা এ শহরের নাম দিয়েছে 'কামরীনা' বা 'চান্দ্র' শহর। দ্বিতীয় বড় শহর ছিল 'লারসা'। পরবর্তীকালে উরের পরিবর্তে এ শহরটি রাজধানী শহরে পরিণত হয়। এর 'নগর প্রভু' ছিল 'শামাস' (সূর্য দেব)। এসব বড় বড় খোদার অধীনে ছিল অনেক ছোট ছোট খোদা। এদের বেশীর ভাগ নেয়া হয়েছিল আকাশের গ্রহ–নক্ষত্র থেকে এবং কম সংখ্যক নেয়া হয়েছিল যমীন থেকে। লোকেরা নিজেদের বিভিন্ন ছোটখাট প্রয়োজন এদের আওতাধীন মনে করতো। পৃথিবী ও আকাশের এসব দেবতার প্রতীকী প্রতিমূর্তি নির্মাণ করা হয়েছিল। বন্দনা, পূজাপাঠ, আরাধনা ও উপাসনার সমস্ত অনুষ্ঠান তাদের সামনে সম্পন্ন করা হতো।

উর নগরীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের ওপর একটি বিশাল সুরম্য প্রাসাদে 'নান্নার' দেবতার প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর কাছেই ছিল নান্নারের স্ত্রী 'নানগুল' এর মন্দির। নান্নার–এর মন্দির ছিল একটি রাজপ্রাসাদের মতো। একজন করে পূজারিনী প্রতি রাতে বিয়ের কণে সেজে তার শয়নগৃহে যেতো। মন্দিরে অসংখ্য নারী দেবতার নামে উৎসর্গীত ছিল। তারা ছিল দেবদাসী (RELIGIOUS PROSTITUTES)। দেবতার নামে নিজের কুমারীত্ব বিসর্জনকারী মহিলাকে অত্যন্ত সম্মানীয়া মনে করা হতো। অন্ততপক্ষে একবার "দেবতার উদ্দেশ্যে" নিজেকে কোন পর পুরুষের হাতে সোপর্দ করে দেয়া নারীর জন্য মুক্তির উপায় মনে করা হতো। অতপর একথা বলার তেমন কোন প্রয়োজন নেই যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পূজারীরাই এ ধর্মীয় বেশ্যাবৃত্তির ফায়দা লুটতো।

নান্নার কেবল দেবতাই ছিল না বরং ছিল দেশর সবচেয়ে বড় জমিদার, সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী, সবচেয়ে বড় শিল্পপতি এবং দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক শাসকও। বিপুল সংখ্যক বাগান, গৃহ ও বিপুল পরিমাণ জমি এই মন্দিরে নামে ওয়াকফ ছিল। এই বিরাট সম্পত্তির আয় ছাড়াও কৃষক, জমিদার, জোতদার, ব্যবসায়ী সবাই সব ধরনের শস্য, দুধ, সোনা, কাপড় এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র মন্দিরে নজরানা দিতো। এগুলো আদায় ও গ্রহণ করার জন্য মন্দিরে একটি কর্মচারী বাহিনী নিযুক্ত ছিল। মন্দিরের আওতাধীনে বহু কারখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরের পক্ষ থেকে ব্যবসায়–বাণিজ্যেরও বিরাট কারবার চলতো। দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে পূজারীরাই এসব কাজ সম্পাদন করতো। এ ছাড়া দেশের বৃহত্তম আদালত মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। পূজারী ছিল তার প্রধান বিচারপতি। তার ফায়সালাকে আল্লাহর ফায়সালা মনে করা হতো। দেশে রাজপরিবারের শাসনও ছিল নান্নার–এর অনুগ্রহ পুষ্ট। আসল বাদশাহ ছিল নান্নার আর দেশের শাসনকর্তা তার পক্ষ থেকে দেশ শাসন করতো। এ সম্পর্কের কারণে বাদশাহ নিজেও মাবুদদের অন্তরভুক্ত হয়ে যেতো এবং অন্যান্য খোদা ও দেবতাদের মতো তারও পূজা করা হতো।

হযরত ইবরাহীমের সময় উরের যে রাজপরিবারটি ক্ষমতাসীন ছিল তার প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল উরনাম্মু। খৃষ্টপূর্ব ২৩০০ অব্দে তিনি একটি বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তার রাজ্যের সীমানা পূর্বে সোসা থেকে শুরু করে পশ্চিমে লেবানন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তার নাম থেকেই এ পরিবারের নামকরণ হয় 'নাম্মু'। এটিই আরবীতে এসে 'নমরূদ'–এ পরিণত হয়। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের হিজরতের পর এ পরিবার ও এ জাতির ওপর

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ۝٧٦ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ۝٧٧ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝٧٨ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝٧٩

অতপর যখন রাত তাকে আচ্ছন্ন করলো তখন একটি নক্ষত্র দেখে সে বললো ঃ এ আমার রব। কিন্তু যখন তা ডুবে গেলো, সে বললো ঃ যারা ডুবে যায় আমি তো তাদের ভক্ত নই। তারপর যখন চাঁদকে আলো বিকীরণ করতে দেখলো, বললো ঃ এ আমার রব। কিন্তু যখন তাও ডুবে গেলো তখন বললো ঃ আমার রব যদি আমাকে পথ না দেখাতেন তাহলে আমি পথভ্রষ্টদের অন্তরভুক্ত হয়ে যেতাম। এরপর যখন সূর্যকে দীপ্তিমান দেখলো তখন বললো ঃ এ আমার রব, এটি সবচেয়ে বড়। কিন্তু তাও যখন ডুবে গেলো তখন ইবরাহীম চীৎকার করে বলে উঠলো ঃ "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করো তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।[৫৩] আমি তো একনিষ্ঠভাবে নিজের মুখ সেই সত্তার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছি যিনি যমীন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কখখনো মুশরিকদের অন্তরভুক্ত নই।"

ধ্বংস নেমে আসে এবং এর ধারা ক্রমাগত চলতে থাকে। প্রথমে ঈলামীরা উরকে ধ্বংস করে। তারা নান্নারের মূর্তি সহকারে নমরূদকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তারপর লারসায় একটি ঈলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে উর এলাকা এর অধীনে শাসিত হতে থাকে। অবশেষে একটি আরব বংশজাত পরিবারের অধীনে ব্যাবিলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং উর ও লারসা তাদের শাসনাধীনে চলে যায়। এ ধ্বংসলীলার পর নান্নারের সাথে সাথে উরের অধিবাসীদের বিশ্বাসেও ধস নামে। করণ নান্নার তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি।

নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না, পরবর্তীকালে হযরত ইবরাহীমের শিক্ষা এ দেশের লোকেরা কি পরিমাণ গ্রহণ করেছিল। তবে খৃষ্টপূর্ব ১৯১০ সালে ব্যাবিলনের বাদশাহ 'হামুরাবি' (বাইবেলে উল্লেখিত আমুরাফীল) যে আইন সংকলন করেন তা থেকে প্রমাণ হয় যে, এ আইন রচনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নবুওয়াতের প্রদীপ থেকে নির্গত কিছুটা আলো অবশ্যই ক্রিয়াশীল ছিল। এ আইন সংক্রান্ত বিস্তারিত শিলালিপি আবিষ্কার করেন

খৃষ্টপূর্ব ১৯০২ সালে একজন ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানী এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে C. H. W. John এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন The oldest code of law নামে। এ আইনের বহু মূলনীতি ও খুঁটিনাটি ধারা–উপধারা হযরত মূসার শরীয়াতের সাথে সামঞ্জস্য রাখে।

এ পর্যন্তকার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার উপরোক্ত ফলাফল যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে এ থেকে একথা একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, হযরত ইবরাহীমের জাতির মধ্যে শিরক নিছক একটি ধর্মীয় বিশ্বাস এবং একটি পৌত্তলিক উপাসনা ও পূজাপাঠের সমষ্টি ছিল না বরং এ জাতির সমগ্র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ব্যবস্থাপনা শিরকের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। এর মোকাবিলায় হযরত ইবরাহীম তাওহীদের যে দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন তার প্রভাব কেবল মূর্তিপূজার ওপরই পড়তো না বরং রাজ পরিবারের উপাস্য ও পূজনীয় হওয়া, তাদের শাসন কর্তৃত্ব, পূজারী ও উচ্চ শ্রেণীর লোকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা এবং সমগ্র দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা এর আক্রমণের লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করে নেয়ার অর্থ ছিল নীচে থেকে ওপর পর্যন্ত সমাজের সমগ্র ইমারতটি গুড়িয়ে ফেলে তাকে নতুন করে তাওহীদের ভিত্তিতে গড়ে তোলা। এ জন্য হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আওয়াজ বুলন্দ হবার সাথে সাথেই সমাজের বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী ও সাধারণ মানুষ এবং পূজারী ও নমরূদ সবাই একই সংগে একই সময়ে তাঁকে থামিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে আসে।

৫৩. নবুওয়াতের দায়িত্বে সমাসীন হবার আগে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যে প্রাথমিক চিন্তাধারার সাহায্যে মহাসত্যে পৌছে গিয়েছিলেন এখানে তার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, সুস্থ মস্তিষ্ক, নির্ভুল চিন্তা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তির অধিকারী এক ব্যক্তি যখন এমন এক পরিবেশে চোখ মেললেন যেখানে চারদিকে শিরকের ছড়াছড়ি, কোথাও থেকে তাওহীদের শিক্ষা লাভ করার মতো অবস্থা তাঁর নেই, তখন তিনি কিভাবে বিশ্ব প্রকৃতির নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ এবং সেগুলোর মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা করে তা থেকে সঠিক ও নির্ভুল যুক্তি–প্রমাণ সংগ্রহের মাধ্যমে প্রকৃত সত্যে উপনীত হতে সক্ষম হলেন। ইতিপূর্বে ইবরাহীমের জাতির যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তার ওপর একটু চোখ বুলালেই জানা যায় যে, ছোট বেলায় জ্ঞান হবার পর হযরত ইবরাহীম দেখেন তাঁর চারদিকে চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজির পূজার ধুম চলছে। তাই সত্যি এদের কেউ রব কিনা—এই প্রশ্নটি থেকে হযরত ইবরাহীমের সত্য অনুসন্ধানের সূচনা হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। এ কেন্দ্রীয় প্রশ্নটি নিয়ে তিনি চিন্তা–ভাবনা করেন। অবশেষে নিজের জাতির সমস্ত রবকে একটি অমোঘ বিধানের আওতায় বন্দী দাসানুদাসের মতো আবর্তন করতে দেখে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যাদের রব হওয়ার দাবী করা হয় তাদের কারোর মধ্যে রব হবার যোগ্যতার লেশমাত্রও নেই। রব মাত্র একজনই, যিনি এদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর বন্দেগী করতে সবাইকে বাধ্য করেছেন।

যে ধরনের বাচনভংগী প্রয়োগের মাধ্যমে এ ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে তাতে সাধারণ লোকদের মনে এক প্রকার সন্দেহ জাগে। বলা হয়েছে ঃ যখন রাত হয়ে গেলো, সে একটি তারকা দেখলো আবার যখন তা ডুবে গেলো তখন একথা বললো। তারপর যখন

চাঁদ দেখলো এবং পরে তা ডুবে গেলো তখন একথা বললো। এরপর সূর্য দেখলো এবং যখন তাও ডুবে গেলো তখন এ কথা বললো। ঘটনা বর্ণনার এ পদ্ধতি একজন সাধারণ পাঠকের মনে এ প্রশ্ন সৃষ্টি করে যে, ছোটবেলায় জ্ঞান চক্ষু উন্মেলিত হবার পর থেকেই কি প্রতিদিন হযরত ইবরাহীম দিনের পরে রাত হতে দেখতেন না? তিনি কি প্রতিদিন সূর্য, চন্দ্র ও তারকাদের উদিত ও অস্তমিত হতে দেখতেন না? আর একথা তো সুস্পষ্ট যে, এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পরই করেছেন। তাহলে এ ঘটনাটি এভাবে বলা হয়েছে কেন যে, রাত হলে এই দেখলেন এবং দিন হলে এই দেখলেন? যেন মনে হচ্ছে, এ বিশেষ ঘটনাটির আগে তাঁর এসব দেখার সুযোগ হয়নি। অথচ একথা মোটেই সত্য নয়। অনেকের কাছে এ সন্দেহের নিরসন এমনই অসাধ্য মনে হয়েছে যে, তারা এর জবাব দেবার জন্য হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্ম ও প্রতিপালন সম্পর্কে একটি অস্বাভাবিক গল্প ফেঁদে বসা ছাড়া আর কোন উপায়ই দেখেননি। তাদের সেই গল্পে বলা হয়েছে ঃ হযরত ইবরাহীমের জন্ম ও প্রতিপালন হয় একটি গুহার মধ্যে। সেখানে প্রাপ্ত বয়স্ক হবার আগে পর্যন্ত তাঁকে চন্দ্র, সূর্য, তারকার দর্শন থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। অথচ কথা এখানে দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। একথা বোঝার জন্য এ ধরনের গল্প তৈরী করার কোন প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞানী নিউটন সম্পর্কে বহুল প্রচলিত ঘটনা, তিনি একদিন একটি বাগানে গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখেন অকস্মাত তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, আপেলটি আকাশে না উঠে মাটিতে পড়লো কেন? এর ওপর চিন্তা-ভাবনা করতে করতে তিনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার করেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ঘটনাটির পূর্বে নিউটন কি কখনো কোন জিনিস ওপর থেকে নীচে পড়তে দেখেন নি? অবশ্যই দেখেছেন। বহুবার দেখেছেন। তাহলে কি কারণে সেই একটি বিশেষ দিনে বিশেষ সময়ে আপেলটি মাটিতে পড়ার ঘটনা নিউটনের মনে এমন প্রশ্ন সৃষ্টি করে, যা ইতিপূর্বে প্রতিদিনে শত শত বার এ ধরনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেও তার মনে সৃষ্টি হয়নি? এর একমাত্র জওয়াব এই যে, চিন্তা-ভাবনাকারী ও অনুসন্ধানী মন সবসময় এক ধরনের পর্যবেক্ষণ থেকে একইভাবে আলোড়িত হয় না। অনেক সময়ই এমন হতে দেখা গেছে, একটি জিনিস মানুষ ক্রমাগতভাবে দেখতে থাকে কিন্তু তা তার মনকে কোনভাবে নাড়া দেয় না। কিন্তু অন্য এক সময় সেই একই জিনিস দেখে তার মনে হঠাৎ একটি প্রশ্ন জাগে এবং তার ফলে তার চিন্তাশক্তিগুলো একটি বিশেষ বিষয়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। অথবা প্রথম থেকে কোন একটি বিষয়ের অনুসন্ধানে মনে খট্‌কা বা জটিলতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু হঠাৎ একদিন প্রতিদিনকার বারবার দেখা একটি জিনিসের ওপর নজর পড়ার সাথে সাথেই জটিল গ্রন্থী উন্মোচনের সূত্র হাতে এসে যায় আর তারপর সবকিছু পানির মত তরল মনে হয়। হযরত ইবরাহীমের ঘটনাটিও এ ধরনেরই। রাত প্রতিদিন আসতো এবং চলেও যেতো। সূর্য, চন্দ্র, তারকা প্রতিদিন চোখের সামনে উদিত ও অস্তমিত হতো। কিন্তু সেটি ছিল একটি বিশেষ দিন যেদিন একটি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ হযরত ইবরাহীমের চিন্তা ও দৃষ্টিকে এমন একটি পথে পরিচালিত করে যার ফলে অবশেষে তিনি মহান আল্লাহর একত্বের (তাওহীদ) কেন্দ্রীয় সত্যে পৌঁছতে সক্ষম হন। হতে পারে হযরত ইবরাহীম (আ) প্রথম থেকে এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে আসছিলেন যে, যে বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাঁর জাতির সমগ্র জীবন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে তার মধ্যে কতটুকু সত্যতা আছে? আর এ অবস্থায় অকস্মাত আকাশের একটি নক্ষত্রের উদয়াস্ত তাঁর চিন্তার সমস্ত জট খুলে দিয়ে

وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۚ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ۚ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِ
كُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۗ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾
وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ
عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ۚ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ الَّذِينَ
آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো। তাতে সে তার সম্প্রদায়কে বললো ঃ তোমারা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে বিতর্ক করছো? অথচ তিনি আমাকে সত্য–সরল পথ দেখিয়ে দিয়েছেন এবং তোমরা যাদেরকে তাঁর সাথে শরীক করছো তাদেরকে আমি ভয় করি না, তবে আমার রব যদি কিছু চান তাহলে অবশ্যি তা হতে পারে। আমার রবের জ্ঞান সকল জিনিসের ওপর পরিব্যাপ্ত। এরপরও কি তোমাদের চেতনার উদয় হবে না?[৫৪] আর তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করেছো তাদেরকে আমি কেমন করে ভয় করবো যখন তোমরা এমন সব জিনিসকে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক করতে ভয় করো না যাদের জন্য তিনি তোমাদের কাছে কোন সনদ অবতীর্ণ করেননি? আমাদের এ দু'দলের মধ্যে কে বেশী নিরাপত্তালাভের অধিকারী? বলো, যদি তোমরা কিছু জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকো। আসলে তো নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা তাদেরই জন্য এবং সত্য–সরল পথে তারাই পরিচালিত যারা ঈমান এনেছে এবং যারা নিজেদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশিয়ে ফেলেনি।[৫৫]

যায়। প্রকৃত সত্য তাঁর সামনে দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আবার এও হতে পারে, নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের ফলেই তাঁর মনে প্রথম চিন্তার উন্মেষ ঘটে।

এ প্রসংগে আর একটি প্রশ্নও দেখা দেয়। সেটি হচ্ছে, হযরত ইবরাহীম (আ) যখন তারকা দেখে বলেন, এ আমার রব আবার যখন চাঁদ ও সূর্য দেখে তাদেরকেও নিজের রব বলে ঘোষণা দেন, সে সময় কি তিনি সাময়িকভাবে হলেও শিরকে লিপ্ত হননি? এর জওয়াব হচ্ছে, একজন সত্যসন্ধানী তাঁর সত্য অনুসন্ধানের পথে পরিভ্রমণকালে মাঝপথে যেসব মনযিলে চিন্তা–ভাবনা করার জন্য থামে, আসল গুরুত্ব সে মনযিলগুলোর নয় বরং আসল গুরুত্ব হচ্ছে সে গন্তব্যের, যে দিকে তিনি অগ্রসর হচ্ছেন এবং যেখানে গিয়ে তিনি অবস্থান করেন। মাঝখানের এ মনযিলগুলো অতিক্রম করা প্রত্যেক সত্যসন্ধানীর জন্য অপরিহার্য। সেখানে অবস্থান হয় অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে, অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সেখানে অবস্থান করা হয় না। মূলত এ অবস্থান হয় জিজ্ঞাসা সূচক ও প্রশ্নবোধক,

সিদ্ধান্তমূলক নয়। অনুসন্ধানী যখন এ মনযিলগুলোর কোনটিতে অবস্থান করে বলেন, "ব্যাপারটি এমন" তখন এটি মূলত তার শেষ সিদ্ধান্ত হয় না বরং তার একথা বলার উদ্দেশ্য হয়, জিজ্ঞাসা মূলক। অর্থাৎ "ব্যাপারটি কি এমন?" তারপর পরবর্তী অনুসন্ধানে এর নেতিবাচক জবাব পেয়ে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে যান। তাই পথের মাঝখানে যেখানে যেখানে থামেন সেখানেই তিনি সাময়িকভাবে কুফরী বা শিরক করেন একথা সম্পূর্ণ ভুল। কাজেই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর সত্য অনুসন্ধানের পথে কোন প্রকার শিরকে লিপ্ত হননি।

৫৪. কুরআনের মূল আয়াতে 'তাযাক্কুর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি গাফলতি ও ভুলের মধ্যে ডুবে ছিল তার হঠাৎ গাফলতি থেকে জেগে ওঠে যে জিনিস থেকে গাফেল হয়ে ছিল তার স্মরণ করা। তাই আমি أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ এর অনুবাদ করেছি ঃ "এরপরও কি তোমাদের চেতনার উদয় হবে না" হযরত ইবরাহীমের বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, তোমরা যা কিছু করছো তোমাদের আসল ও যথার্থ রব সে সম্পর্কে মোটেই অনবহিত নন। তিনি সব জিনিসের বিস্তারিত জ্ঞান রাখেন। কাজেই এ সত্য অবগত হয়েও কি তোমরা সচেতন হবে না?

৫৫. এ সমগ্র ভাষণটি একথার সাক্ষ্য বহন করে যে, হযরত ইবরাহীমের জাতি পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না বরং তাদের আসল অপরাধ ছিল তারা আল্লাহর গুণাবলী এবং তার প্রভুত্বের অধিকারে অন্যদের শরীক করতো। প্রথমত হযরত ইবরাহীম নিজেই বলছেন ঃ তোমরা আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক করছো। দ্বিতীয়ত নিজের জাতিকে সম্বোধন করে আল্লাহর কথা বলার জন্য হযরত ইবরাহীম যে বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন এ ধরনের পদ্ধতি একমাত্র এমন লোকদের জন্য অবলম্বিত হয় যারা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। কাজেই কুরআনের যেসব তাফসীরকার এখানে এবং কুরআনের অন্যান্য জায়গায় হযরত ইবরাহীম প্রসংগে কুরআনের বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একথা বলেছেন যে, হযরত ইবরাহীমের জাতি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী বা আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে অনবহিত ছিল এবং কেবলমাত্র নিজেদের মাবুদদেরকেই ইলাহী ক্ষমতার পূর্ণাঙ্গ অধিকারী মনে করতো, তাদের বক্তব্য সঠিক নয়।

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে, "যারা নিজেদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশিয়ে ফেলেনি।" এর মধ্যে জুলুম শব্দটি থেকে কোন কোন সাহাবীর ভুল ধারণা হয়েছিল যে, বোধ হয় এর অর্থ গোনাহ, তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ আসলে এখানে জুলুম মানে শিরক। কাজেই এ আয়াতের অর্থ দাঁড়ালো ঃ যারা আল্লাহকে মেনে নেবে এবং নিজেদের এ মেনে নেবার মধ্যে কোন প্রকার মুশরিকী বিশ্বাস ও কর্মের অনুপ্রবেশ ঘটাবে না, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি একমাত্র তারাই লাভ করবে এবং একমাত্র তারাই সত্য সরল পথে অধিষ্ঠিত থাকবে।

এ প্রসঙ্গে আর একটি মজার কথা জানাও প্রয়োজন। এ ঘটনাটি হচ্ছে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মহান নবুওয়াতী জীবনের সূচনা বিন্দু। কিন্তু বাইবেলে এটি স্থান পেতে পারেনি। তবে তালমূদে এর উল্লেখ আছে। সেখানে এমন দু'টি কথা আছে, যা কুরআন থেকে ভিন্ন। একটি হচ্ছে, সেখানে হযরত ইবরাহীমের সত্য অনুসন্ধানের সূচনা করা হয়েছে

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿٨٣﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ؕ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٨٧﴾

১০ রুকূ'

ইবরাহীমকে তার জাতির মোকাবিলায় আমি এ যুক্তি–প্রমাণ প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে চাই উন্নত মর্যাদা দান করি। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, তোমার রব প্রজ্ঞাময় ও জ্ঞানী।

তারপর আমি ইবরাহীমকে ইসহাক ও ইয়াকূবের মতো সন্তান দিয়েছি এবং সবাইকে সত্য পথ দেখিয়েছি, (সে সত্য পথ যা) ইতিপূর্বে নূহকে দেখিয়েছিলাম। আর তারই বংশধরদের থেকে দাউদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুণকে (হোদায়াত দান করেছি)। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে তাদের সৎ–কাজের বদলা দিয়ে থাকি। (তারই সন্তানদের থেকে) যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকে (সত্য পথের পথিক বানিয়েছি)। তাদের প্রত্যেকে ছিল সৎ। (তারই বংশ থেকে) ইসমাঈল, আল ইয়াসা, ইউনুস ও লূতকে (পথ দেখিয়েছি)। তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেককে আমি সমস্ত দুনিয়াবাসীর ওপর মর্যাদাসম্পন্ন করেছি। তাছাড়া তাদের বাপ–দাদা, সন্তান সন্ততি ও ভ্রাতৃ সমাজ থেকে অনেককে আমি সম্মানিত করেছি, নিজের খেদমতের জন্য তাদেরকে নির্বাচিত করেছি এবং সত্য–সরল পথের দিকে তাদেরকে পরিচালিত করেছি।

সূর্য থেকে এবং তারকা পর্যন্ত পৌছার পর তাকে আল্লাহতে পৌছিয়ে শেষ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তালমূদের বর্ণনা মতে হযরত ইবরাহীম সূর্যকে "এ আমার রব" বলার সাথে সাথে তার বন্দনাও করে ফেলেন। আর এভাবে চাঁদকে "এ আমার রব" বলার পর তারও বন্দনা করেন।

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٨٨ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ۝٨٩ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ۝٩٠

এটি হচ্ছে আল্লাহর হেদায়াত, নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে তিনি যাকে চান তাকে এর সাহায্যে হেদায়াত দান করেন। কিন্তু যদি তারা কোন শির্ক করে থাকতো তাহলে তাদের সমস্ত কৃতকর্ম ধ্বংস হয়ে যেতো।[৫৬] তাদেরকে আমি কিতাব, হুকুম ও নবুওয়াত দান করেছিলাম।[৫৭] এখন যদি এরা তা মানতে অস্বীকার করে তাহলে (কোন পরোয়া নেই) আমি অন্য এমন কিছু লোকের হাতে এ নিয়ামত সোপর্দ করে দিয়েছি যারা এগুলো অস্বীকার করে না।[৫৮] হে মুহাম্মাদ! তারাই আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত প্রাপ্ত ছিল, তাদেরই পথে তুমি চল এবং বলে দাও, এ (তাবলীগ ও হেদায়াতের) কাজে আমি তোমাদের কাছ থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না। এটি সারা দুনিয়াবাসীর জন্য একটি সাধারণ উপদেশমালা।

৫৬. অর্থাৎ যে শিরকের মধ্যে তোমরা লিপ্ত রয়েছো তারাও যদি কোন পর্যায়ে এর মধ্যে লিপ্ত হতো তাহলে এ মর্যাদা তারা কোনক্রমেই লাভ করতে পারতো না। কোন ব্যক্তির পক্ষে দস্যুতা ও রাহাজানির কাজে সফলতা লাভ করে দুনিয়ায় একজন বিজেতা হিসেবে খ্যাত হওয়া সম্ভবপর ছিল। অথবা চরম অর্থলিপ্সার মাধ্যমে কারূনের সমান খ্যাতি অর্জন বা অন্য কোন উপায়ে দুনিয়ার অসৎ ও দুশ্চরিত্র লোকদের মধ্যে নামজাদা দুশ্চরিত্র হয়ে যাওয়াটাও সম্ভব ছিল। কিন্তু শিরক থেকে দূরে অবস্থান না করে এবং নির্ভেজাল আল্লাহ প্রীতির পথে অবিচল না থেকে কোন ব্যক্তিই এ হেদায়াতের ইমাম ও সৎলোকদের নেতা হবার মর্যাদা এবং সারা দুনিয়ার জন্য কল্যাণ, সততা ও সৎ বৃত্তির উৎস হিসেবে পরিগণিত হতে পারতো না।

৫৭. এখানে নবীদেরকে তিনটি জিনিস দেবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক, কিতাব অর্থাৎ আল্লাহর হেদায়াতনামা। দুই, হুকুম অর্থাৎ এ হেদায়াতনামার সঠিক জ্ঞান, তার মূলনীতিগুলোকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন ব্যাপারে প্রয়োগ করার যোগ্যতা এবং বিভিন্ন জীবন সমস্যার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তকর মত প্রতিষ্ঠিত করার আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা। তিন, নবুওয়াত অর্থাৎ তিনি এ হেদায়াতনামা অনুযায়ী আল্লাহর সৃষ্টিকে পথ দেখাতে পারেন এমন একটি দায়িত্বশীল পদ ও মর্যাদা।

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾

১১ রুকূ'

তারা আল্লাহ সম্পর্কে বড়ই ভুল অনুমান করলো যখন তারা বললো, আল্লাহ কোন মানুষের ওপর কিছুই নাযিল করেননি।[৫৯] তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তাহলে মূসা যে কিতাবটি এনেছিল, যা ছিল সমস্ত মানুষের জন্য আলো ও পথনির্দেশনা, যাকে তোমরা খণ্ড বিখণ্ড করে রাখছো, কিছু দেখাও আর কিছু লুকিয়ে রাখো এবং যার মাধ্যমে তোমাদের এমন জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা তোমাদেরও ছিল না, তোমাদের বাপ–দাদাদেরও ছিল না।—কে তা নাযিল করেছিল[৬০] কেবল এতটুকুই বলে দাও ঃ আল্লাহ, তারপর তাদেরকে তাদের যুক্তিবাদের খেলায় মেতে থাকতে দাও।

৫৮. এর অর্থ হচ্ছে, এ কাফের ও মুশরিকরা যদি আল্লাহর হেদায়াত ও পথ–নির্দেশনা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাহলে করুক। আমি ঈমানদারদের এমন একটি দল সৃষ্টি করে দিয়েছি যারা এ নিয়ামতের যথার্থ কদর করে ও মর্যাদা দেয়।

৫৯. আগের ধারাবাহিক বর্ণনা ও পরবর্তী জওয়াবী ভাষণ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটি ছিল ইহুদীদের উক্তি। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাবী ছিল, আমি নবী এবং আমার কাছে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাই স্বাভাবিকভাবে কুরাইশ কাফের সম্প্রদায় এবং আরবের অন্যান্য মুশরিকরা এ দাবীর যথার্থতা অনুসন্ধান করার জন্য ইহুদী ও খৃষ্টানদের কাছে যেতো এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করতো, তোমরাও তো নবী–রসূলদের মানো, বলো সত্যিই কি এ ব্যক্তির কাছে আল্লাহর কালাম নাযিল হয়েছে? এর জওয়াবে তারা যা বলতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কট্টর বিরোধী পক্ষ বিভিন্ন জায়গায় সে কথাগুলো বলে বলে লোকদেরকে বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত করতো। তাই ইসলাম বিরোধীরা ইহুদীদের যে উক্তিটিকে প্রমাণ হিসেবে খাড়া করেছিল সেটি এখানে উদ্ধৃত করে তার জওয়াব দেয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, তাওরাতকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা কিতাব বলে মানে, এমন একজন ইহুদী কেমন করে বলতে পারে যে, আল্লাহ কোন মানুষের কাছে কিছুই নাযিল করেননি? কিন্তু এখানে এ প্রশ্নটি যথার্থ নয়। কারণ গোয়ার্তুমি ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে অনেক সময় মানুষ অন্যের সত্য বক্তব্য অস্বীকার করতে গিয়ে

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٩٢﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِىَ اِلَىَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَىْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٩٣﴾

(সে কিতাবের মতো) এটি একটি কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি, বড়ই কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ, এর পূর্বে যা এসেছিল তার সত্যতা প্রমাণকারী এবং এর সাহায্যে তুমি জনপদসমূহের এ কেন্দ্র (অর্থাৎ মক্কা) ও তার চারপাশের অধিবাসীদেরকে সতর্ক করবে। যারা আখেরাত বিশ্বাস করে তারা এ কিতাবের ওপর ঈমান আনে এবং নিজেদের নামাযগুলো নিয়মিত যথাযথভাবে হেফাজত করে।[৬১] আর সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে যে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রটায় অথবা বলে আমার কাছে অহী এসেছে অথচ তার ওপর কোন অহী নাযিল করা হয়নি অথবা যে আল্লাহর নাযিল করা জিনিসের মোকাবিলায় বলে, আমিও এমন জিনিস নাযিল করে দেখিয়ে দেবো? হায়! তুমি যদি জালেমদেরকে সে অবস্থায় দেখতে পেতে যখন তারা মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকবে এবং ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে থাকবে। "নাও, তোমাদের প্রাণ বের করে দাও।" তোমরা আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করে যেসব অন্যায় ও অসত্য কথা বলতে এবং তাঁর আয়াতের বিরুদ্ধে যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে তারি শাস্তি স্বরূপ আজ তোমাদের অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে।

এমন সব কথাও বলে ফেলে যা তার নিজের স্বীকৃত সত্যের পরিপন্থী হয়। তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রত্যাখ্যান করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। ফলে বিরোধিতার জোশে তারা এমনই অন্ধ হয়ে পড়েছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের প্রতিবাদ করতে করতে তারা এক সময় মূল রিসালাতকেই অস্বীকার করে বসে।

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

(আর আল্লাহ বলবেনঃ) "দেখো এবার তোমরা ঠিক তেমনি নিসংগ ও একাকী আমার সামনে হাযির হয়ে গেছো যেমনটি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, যা কিছু তোমাদের দুনিয়ায় দিয়েছিলাম তা সব তোমরা পেছনে রেখে এসেছো এবং এখন তোমাদের সাথে তোমাদের সে সব সুপারিশকারীদেরকেও দেখছি না যাদের সম্পর্কে তোমরা মনে করতে তোমাদের কার্য সম্পাদন করার ব্যাপারে তাদেরও কিছুটা অবদান আছে। তোমাদের মধ্যকার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যেসব ধারণা করতে তা সবই তোমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে।"

আর এখানে যে বলা হয়েছে, "তারা আল্লাহ সম্পর্কে বড়ই ভুল অনুমান করলো যখন তারা বললো", এর অর্থ হচ্ছে, তারা আল্লাহর কুশলতা বিচক্ষণতা ও ক্ষমতার মূল্যায়ণে ভুল করেছে। যে ব্যক্তি একথা বলে যে, আল্লাহ কোন মানুষের কাছে সত্যের জ্ঞান ও জীবন যাপনের জন্য পথ নির্দেশনা নাযিল করেননি, সে মানুষের কাছে অহী নাযিল হওয়াকে অসম্ভব মনে করে এবং এটি আল্লাহর ক্ষমতার অবমূল্যায়ণ ও ভুল অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। অথবা সে মনে করে, আল্লাহ তো মানুষকে বুদ্ধির অস্ত্র ও তা ব্যবহারের ক্ষমতা দিয়েছেন কিন্তু তার সঠিক পথপ্রদর্শনের কোন ব্যবস্থা করেননি বরং তাকে দুনিয়ার বুকে অন্ধের মতো কাজ করার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন এবং এটি আল্লাহর কুশলতা ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে ভুল অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬০. এ জওয়াবটি যেহেতু ইহুদীদেরকে দেয়া হচ্ছে তাই মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি তাওরাত নাযিলকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। কারণ তারা নিজেরাই এটা মানতো। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ওপর তাওরাত নাযিল হয়েছিল একথা যখন তারা স্বীকার করতো তখন তাদের একথাটিই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের এ বক্তব্যকে খণ্ডন করে যে, আল্লাহ কোন মানুষের ওপর কিছুই নাযিল করেননি। তাছাড়া এ থকে কমপক্ষে এতটুকু কথা তো অবশ্যি প্রমাণ হয়ে যায় যে, মানুষের ওপর আল্লাহর কালাম নাযিল হতে পারে এবং ইতিপূর্বে হয়েছে।

৬১. মানুষের ওপর আল্লাহর কালাম নাযিল হতে পারে এবং কার্যত হয়েছেও—এরি স্বপক্ষে দেয়া হয়েছে প্রথম যুক্তিটি। এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যে কালামটি নাযিল হয়েছে সেটি আল্লাহরই কালাম, এর স্বপক্ষে দেয়া হচ্ছে এ দ্বিতীয় যুক্তিটি। এ সত্যটি প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ হিসেবে চারটি কথা পেশ করা হয়েছে।

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ
مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ
سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾ وَهُوَ الَّذِي
جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ
وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾

১২ রুকূ'

আল্লাহই শস্যবীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী।[৬২] তিনিই জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং তিনিই বের করেন মৃতকে জীবিত থেকে।[৬৩] এ সমস্ত কাজ তো আল্লাহই করেন, তাহলে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে কোন্ দিকে ছুটে চলছো? রাতের আবরণ দীর্ণ করে তিনিই ফোটান উষার আলো। তিনিই রাতকে করেছেন প্রশান্তিকাল। চন্দ্র ও সূর্যের উদয়াস্তের হিসেব তিনিই নির্দিষ্ট করেছেন। এসব কিছুই সেই জবরদস্ত ক্ষমতা ও জ্ঞানের অধিকারীর নির্ধারিত পরিমাপ। আর তিনিই তারকাগুলোকে বানিয়েছেন তোমাদের জন্য পৃথিবী ও সমুদ্রের গভীর অন্ধকারে পথের দিশা জানার মাধ্যম। দেখো, আমি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি তাদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।[৬৪] আর তিনিই একটি মাত্র প্রাণসত্তা থেকে তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন।[৬৫] তারপর প্রত্যেকের জন্য রয়েছে একটি অবস্থান স্থল এবং তাকে সোপর্দ করার একটি জায়গা। এ নিদর্শনগুলো সুস্পষ্ট করে দিয়েছি তাদের জন্য যারা জ্ঞান বুদ্ধি রাখে।[৬৬]

এক ঃ এ কিতাবটি বড়ই কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ। অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য এর মধ্যে সর্বোত্তম মূলনীতি পেশ করা হয়েছে। এখানে নির্ভুল ও সঠিক আকীদা–বিশ্বাসের শিক্ষা দেয়া হয়েছে, সৎকাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, উন্নত নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টির উপদেশ দেয়া হয়েছে, পাক–পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের পথ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং অন্যদিকে মূর্খতা, অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণ মনতা, জুলুম, চরিত্রহীনতা, অশ্লীলতা ও অন্যান্য যেসব অসৎকর্ম তোমরা পবিত্র আসমানী কিতাবসমূহে স্তূপীকৃত করে রেখেছো সেগুলো থেকে এ কিতাবটিকে মুক্ত রাখা হয়েছে।

وَهُوَ الَّذِىٓ اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخۡرَجۡنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَىۡءٍ فَاَخۡرَجۡنَا
مِنۡهُ خَضِرًا نُّخۡرِجُ مِنۡهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخۡلِ مِنۡ طَلۡعِهَا قِنۡوَانٌ
دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنۡ اَعۡنَابٍ وَّالزَّيۡتُوۡنَ وَالرُّمَّانَ مُشۡتَبِهًا وَّغَيۡرَ مُتَشَابِهٍ ؕ اُنۡظُرُوۡۤا
اِلٰى ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثۡمَرَ وَيَنۡعِهٖ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكُمۡ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يُّؤۡمِنُوۡنَ ﴿۹۹﴾ وَجَعَلُوۡا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ
الۡجِنَّ وَخَلَقَهُمۡ وَخَرَقُوۡا لَهٗ بَنِيۡنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيۡرِ عِلۡمٍ ؕ سُبۡحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا
يَصِفُوۡنَ ﴿۱۰۰﴾

আর তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। তারপর তার সাহায্যে সব ধরনের উদ্ভিদ উৎপাদন করেছেন। এরপর তা থেকে সবুজ শ্যামল ক্ষেত ও বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন। তারপর তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করেছেন। আর খেজুর গাছের মাথি থেকে খেজুরের কাঁদির পর কাঁদি সৃষ্টি করেছেন, যা বোঝার ভারে নুয়ে পড়ে। আর সজ্জিত করেছেন আংগুর, যয়তুন ও ডালিমের বাগান। এসবের ফলগুলো পরস্পরের সাথে সাদৃশ্যও রাখে আবার প্রত্যেকে পৃথক বৈশিষ্টেরও অধিকারী। এ গাছ যখন ফলবান হয় তখন এর ফল ধরা ও ফল পাকার অবস্থাটি একটু গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করো এসব জিনিসের মধ্যে ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। এসব সত্ত্বেও লোকেরা জ্বিনদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করলো,[৬৭] অথচ তিনি তাদের সৃষ্টিকর্তা। আর তারা না জেনে বুঝে তাঁর জন্য পুত্র ও কন্যা তৈরী করে ফেললো,[৬৮] অথচ এরা যেসব কথা বলে তা থেকে তিনি পবিত্র এবং তার উর্ধে।

দুই ঃ এর আগে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব হেদায়াতনামা এসেছিল এ কিতাব সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে অন্য কোন হেদায়াত পেশ করে না বরং সেগুলোয় যা কিছু পেশ করা হয়েছিল তার সত্যতা প্রমাণ করে এবং তার প্রতি সমর্থন যোগায়।

তিন ঃ প্রত্যেক যুগে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে উদ্দেশ্যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে এ কিতাবটিও সে একই উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে গাফলতির নিঁদ থেকে জাগিয়ে সতর্ক করা এবং বিপথগামী লোকদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করাই এর উদ্দেশ্য।

চার ঃ মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা দুনিয়া পূজারী ও প্রবৃত্তির লালসার দাসত্বে জীবন উৎসর্গকারী, এ কিতাব তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে সমবেত করেনি বরং নিজের চারদিকে এমন সব লোককে সমবেত করেছে যাদের দৃষ্টি দুনিয়ার সংকীর্ণ সীমানা ছাড়িয়ে আরো আগে চলে যায়। তারপর এ কিতাবের দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে তাদের জীবনে যে বিপ্লব আসে তার সবচেয়ে সুস্পষ্ট আলামত হচ্ছে এই যে, তারা নিজেদেব আল্লাহ প্রীতির কারণে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে বিশিষ্টতা অর্জন করে। কোন মিথ্যাচারী ব্যক্তি যে কিতাব রচনা করেছে এবং নিজের রচনাকে আল্লাহর রচনা বলে চালিয়ে দেবার চরম ধৃষ্ঠতা দেখিয়েছে তার সে কিতাব কি এহেন বৈশিষ্ট ও সুফলের অধিকারী হতে পারে?

৬২. অর্থাৎ জমির অভ্যন্তরে শস্যবীজ ফাটিয়ে তার মধ্য থেকে অংকুর গজান।

৬৩. জীবিতকে মৃত থেকে বের করার অর্থ প্রাণহীন বস্তু থেকে জীবন্ত সৃষ্টির উদ্ভব ঘটানো। আর মৃতকে জীবিত থেকে বের করার অর্থ জীবন্ত দেহ থেকে প্রাণহীন বস্তু বের করা।

৬৪. অর্থাৎ আল্লাহ যে মাত্র একজনই তার নিদর্শন। অন্য কেউ আল্লাহর গুণাবলীরও অধিকারী নয়, আল্লাহর ক্ষমতায়ও অংশীদার নয় এবং তাঁর প্রভূত্বের অধিকার লাভেরও যোগ্য নয়। কিন্তু মূর্খ ও অজ্ঞদের পক্ষে এ সমস্ত নিদর্শন ও আলামাতের সাহায্যে প্রকৃত ও মূল সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

৬৫. অর্থাৎ এক ব্যক্তি থেকেই মানব বংশ ধারার উৎপত্তি হয়।

৬৬. অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি, তার মধ্যে আবার নারী–পুরুষের পার্থক্য, সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে তাদের বংশ বৃদ্ধি এবং মাতৃগর্ভাশয়ে বীর্যের মাধ্যমে মানব ভ্রূণের অস্তিত্ব সঞ্চারের পর থেকে পৃথিবীতে তার পদার্পণ পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার মধ্যে অসংখ্য সুস্পষ্ট নিদর্শন মানুষের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। এগুলোর মাধ্যমে সে ওপরে বর্ণিত প্রকৃত সত্যটি চিনতে পারবে। কিন্তু যারা যথার্থ বুদ্ধি–জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র তারাই এসব নিশানী থেকে সত্য জ্ঞান লাভ করতে পারে। দুনিয়ায় যারা পশুর মতো জীবন যাপন করে, যারা শুধুমাত্র নিজেদের পাশবিক প্রবৃত্তির পূজা এবং তার চাহিদা পূরণেই ব্যস্ত থাকে সারাক্ষণ, তারা এ নিদর্শনগুলোর সাহায্যে কিছুই পাবে না।

৬৭. অর্থাৎ তারা নিজেদের কল্পনা ও আন্দাজ অনুমানের সাহায্যে এ সিদ্ধান্ত করে বসেছে যে, এ বিশ্ব–জাহান পরিচালনা এবং মানুষের ভাগ্যের ভাঙ্গাগড়ায় আল্লাহর সাথে আরো অনেক গোপন সত্তার শরীকানা আছে। তাদের মধ্যে কেউ বৃষ্টির দেবতা, কেউ ফসল উৎপাদনের দেবতা, কেউ ধন–দৌলতের দেবী, কেউ রোগের দেবী এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ ধরনের আরো বিভিন্ন দেবদেবী বিরাজ করছে। ভূত, প্রেত, শয়তান, রাক্ষস ও দেবদেবী সম্পর্কিত এ ধরনের নানান অর্থহীন বিশ্বাস দুনিয়ার বিভিন্ন মুশরিক জাতির মধ্যে গড়ে উঠেছে।

৬৮. আরবের মূর্খ লোকরা ফেরেশতাদেরকে বলতো আল্লাহর মেয়ে। এভাবে দুনিয়ার অন্যান্য মুশরিক জাতিরাও আল্লাহর বংশধারা চালিয়ে দিয়েছে। তারপর কল্পনার সাহায্যে তারা দেবদেবীদের একটি পূর্ণাঙ্গ বংশ তালিকা তৈরী করে ফেলেছে।

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾ قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾

১৩ রুকূ'

তিনি তো আসমান ও যমীনের উদ্ভাবক। তাঁর কোন সন্তান হতে পারে কেমন করে, যখন তাঁর কোন জীবন সংগিনী নেই? তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সবকিছুর জ্ঞান রাখেন। এ তো আল্লাহ তোমাদের রব। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। সবকিছুর তিনিই স্রষ্টা। কাজেই তোমরা তাঁরই বন্দেগী করো। তিনি সবকিছুর তত্বাবধায়ক। দৃষ্টিশক্তি তাঁকে দেখতে অক্ষম কিন্তু তিনি দৃষ্টিকে আয়ত্ব করে নেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।

দেখো, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে অন্তরদৃষ্টির আলো এসে গেছে। এখন যে ব্যক্তি নিজের দৃষ্টিশক্তিকে কাজে লাগাবে, সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করবে। আর যে অন্ধ সাজবে, সে নিজেই নিজের ক্ষতি করবে। আমি তো তোমাদের পাহারাদার নই।[৬৯]

৬৯. এ বাক্যটি আল্লাহর কালাম হলেও নবীর পক্ষ থেকে উচ্চারিত হয়েছে। কুরআন মজীদে বক্তার লক্ষ ও সম্বোধন বারবার পরিবর্তিত হয়। কখনো নবীকে সম্বোধন করা হয়, কখনো মুমিনদেরকে, কখনো আহলি কিতাবদেরকে, কখনো কাফের ও মুশরিকদেরকে, কখনো কুরাইশদেরকে, কখনো আরববাসীদেরকে আবার কখনো সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করা হয়। অথচ আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র মানব জাতির হেদায়াত। অনুরূপভাবে সম্বোধনকারী ও বক্তাও বারবার পরিবর্তিত হয়। কোথাও বক্তা হন আল্লাহ নিজেই, কোথাও অহী বহনকারী ফেরেশতা, কোথাও ফেরেশতাদের দল, কোথাও নবী আবার ঈমানদাররা। অথচ এসব অবস্থায়ই সমস্ত কালামই একমাত্র আল্লাহরই কালাম হয়ে থাকে।

"আমি তো তোমাদের পাহারাদার নই"—এ বাক্যের মানে হচ্ছে, তোমাদের কাছে আলো পৌছে দেয়াই শুধু আমার কাজ। তারপর চোখ খুলে দেখা বা না দেখা তোমাদের কাজ। যারা চোখ বন্ধ করে রেখেছে জোরপূর্বক তাদের চোখ খুলে দেবো এবং যা কিছু তারা দেখছে না তা তাদেরকে দেখিয়ে ছাড়বো, এটা আমার দায়িত্ব নয়।

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿١٠٥﴾
اِتَّبِعْ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٦﴾
وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ مَاۤ اَشْرَكُوْا ۗ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٧﴾
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا
لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۖ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٨﴾

এভাবে আমার আয়াতকে আমি বার বার বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করে থাকি। এ জন্য বর্ণনা করি যাতে এরা বলে, তুমি কারোর কাছ থেকে শিখে এসেছো এবং যারা জ্ঞানের অধিকারী তাদের কাছে প্রকৃত সত্যকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরতে চাই।[৭০] হে মুহাম্মাদ! সে অহীর অনুসরণ করো, যা তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, কারণ সে একক রব ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং এ মুশরিকদের পেছনে লেগে থেকো না। যদি আল্লাহর ইচ্ছা হতো, তাহলে (তিনি নিজেই এমন ব্যবস্থা করতে পারতেন যাতে) এরা শিরক করতো না। তোমাকে এদের ওপর পাহারাদার নিযুক্ত করিনি এবং তুমি এদের অভিভাবকও নও।[৭১] আর (হে ঈমানদারগণ!) এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে তোমরা তাদেরকে গালি দিয়ো না। কেননা, এরা শিরক থেকে আরো খানিকটা অগ্রসর হয়ে অজ্ঞতাবশত যেন আল্লাহকে গালি দিয়ে না বসে।[৭২] আমি তো এভাবে প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের কার্যক্রমকে সুশোভন করে দিয়েছি।[৭৩] তারপর তাদের ফিরে আসতে হবে তাদের রবের দিকে। তখন তিনি তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদেরকে জানিয়ে দেবেন।

৭০. সূরা বাকারার তৃতীয় রুকূতে যে কথা বলা হয়েছে সে একই কথা এখানেও বলা হয়েছে। অর্থাৎ মশা, মাকড়শা ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতংগের উপমা শুনে এগুলোর মাধ্যমে যে মহাসত্য উদঘাটন করা হয়েছে সত্য সন্ধানীরা তার নাগাল পেয়ে যায়। কিন্তু অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতার রোগে যারা আক্রান্ত হয়ে পড়েছে তারা বিদ্রূপের সূরে বলতে থাকে, আল্লাহর কালামে এ তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসগুলোর উল্লেখের কী প্রয়োজন হতে পারে! এ বিষয়বস্তুটিকে এখানে অন্য একভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর এ কালামটি লোকদের জন্য একটি পরীক্ষার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ফলে এর মাধ্যমে খাঁটি ও অখাঁটি মানুষের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়ে যাচ্ছে। এক দল লোক এ কালাম শুনে বা পড়ে এর উদ্দেশ্য ও মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করে এবং এর

মধ্যে যেসব জ্ঞান ও উপদেশের কথা বলা হয়েছে তা থেকে লাভবান হয়। অন্যদিকে এগুলো শুনার পর আর একদল লোকের চিন্তা কালামের মূল বক্তব্যের দিকে না গিয়ে আর এক ভিন্নধর্মী অনুসন্ধানের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। তারা অনুসন্ধান করতে থাকে, এ নিরক্ষর ব্যক্তি এ ধরনের রচনা আনলো কোথা থেকে? আর যেহেতু বিরোধিতাসুলভ বিদ্বেষে তাদের অন্তর আগে থেকে আচ্ছন্ন থাকে, তাই একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হবার সম্ভাবনা বাদ দিয়ে বাকি সকল প্রকার সম্ভাবনাই তাদের মনে উঁকি দিতে থাকে। এগুলোকে তারা এমনভাবে বর্ণনা করতে থাকে যেন মনে হয় তারা এ কিতাবের উৎস সন্ধানে সফলকাম হয়ে গেছে।

৭১. এর অর্থ হচ্ছে, তোমাকে আহবায়ক ও প্রচারকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, কোতোয়ালের দায়িত্ব নয়। লোকদের সামনে এ আলোকবর্তিকাটি তুলে ধরা এবং সত্যের পূর্ণ প্রকাশের ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে কোন প্রকার ত্রুটি না রাখাই তোমার কাজ। এখন কেউ এ সত্যটি গ্রহণ না করতে চাইলে না করুক। লোকদেরকে সত্যপন্থী বানিয়েই ছাড়তে হবে, এ দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়নি। তোমার নবুওয়াতের প্রভাবাধীন এলাকার মধ্যে মিথ্যার অনুসারী কোন এক ব্যক্তিও থাকতে পারবে না, একথাটিকে তোমার দায়িত্ব ও জবাবদিহির অন্তরভুক্ত করা হয়নি। কাজেই অন্ধদেরকে কিভাবে চক্ষুষ্মান করা যায় এবং যারা চোখ খুলে দেখতে চায় না তাদেরকে কিভাবে দেখানো যায়—এ চিন্তায় তুমি খামখা নিজের মন-মস্তিষ্ককে পেরেশান করো না। দুনিয়ায় একজনও বাতিলপন্থী থাকতে না দেয়াটাই যদি যথার্থই আল্লাহর উদ্দেশ্য হতো তাহলে এ কাজটি তোমাদের মাধ্যমে করাবার আল্লাহর কি প্রয়োজন ছিল? তাঁর একটি মাত্র প্রাকৃতিক ইংগিতেই কি দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে সত্যপন্থী করার জন্য যথেষ্ট ছিল না? কিন্তু সেখানে এটা আদতে উদ্দেশ্যের অন্তরভুক্তই নয়। সেখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের জন্য সত্য ও মিথ্যার মধ্য থেকে কোন একটিকে বাছাই করে নেবার স্বাধীনতা বজায় রাখা, তারপর সত্যের আলো তার সামনে তুলে ধরে উভয়ের মধ্য থেকে কোনটিকে সে গ্রহণ করে তার পরীক্ষা করা। কাজেই যে আলো তোমাকে দেখানো হয়েছে তার উজ্জ্বল আভায় তুমি নিজে সত্য-সরল পথে চলতে থাকো এবং অন্যদেরকে সে পথে চলার জন্য আহবান জানাও। এটিই হচ্ছে তোমার জন্য সঠিক কর্মপদ্ধতি। যারা এ দাওয়াত গ্রহণ করে তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরো এবং দুনিয়ার দৃষ্টিতে তারা যতই নগণ্য হোক না কেন তাদেরকে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন করো না। আর যারা এ দাওয়াত গ্রহণ করেনি তাদের পেছনে লেগে থেকো না। তারা যে অশুভ পরিণামের দিকে নিজেরাই চলে যেতে চায় এবং যাবার জন্য অতি মাত্রায় উদগ্রীব, সেদিকে তাদেরকে যেতে দাও।

৭২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদেরকে এ উপদেশ দেয়া হয়েছিল। তাদেরকে বলা হয়েছিল, নিজেদের ইসলাম প্রচারের আবেগে তারা যেন এমনই লাগামহীন ও বেসামাল হয়ে না পড়ে যার ফলে তর্ক-বিতর্ক ও বিরোধের ব্যাপারে এগিয়ে যেতে যেতে তারা অমুসলিমদের আকীদা-বিশ্বাসের কঠোর সমালোচনা করতে গিয়ে তাদের নেতৃবৃন্দ ও উপাস্যদেরকে গালিগালাজ করে না বসে। কারণ, এগুলো তাদেরকে সত্যের নিকটবর্তী করার পরিবর্তে তা থেকে আরো দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে।

وَاَقۡسَمُوۡا بِاللّٰهِ جَهۡدَ اَيۡمَانِهِمۡ لَئِنۡ جَآءَتۡهُمۡ اٰيَةٌ لَّيُؤۡمِنُنَّ بِهَا ؕ قُلۡ اِنَّمَا الۡاٰيٰتُ عِنۡدَ اللّٰهِ وَمَا يُشۡعِرُكُمۡ ۙ اَنَّهَاۤ اِذَا جَآءَتۡ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۱۰۹﴾ وَنُقَلِّبُ اَفۡـِٕدَتَهُمۡ وَاَبۡصَارَهُمۡ كَمَا لَمۡ يُؤۡمِنُوۡا بِهٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمۡ فِىۡ طُغۡيَانِهِمۡ يَعۡمَهُوۡنَ ﴿۱۱۰﴾

এরা শক্ত কসম খেয়ে বলছে, যদি কোন নিদর্শন[৭৪] আমাদের সামনে এসে যায় তাহলে আমরা তার প্রতি ঈমান আনবো। হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলে দাও, "নিদর্শন তো রয়েছে আল্লাহর কাছে"।[৭৫] আর তোমাদের কিভাবে বুঝানো যাবে যে, নিদর্শন এসে গেলেও এরা বিশ্বাস করবে না।[৭৬] প্রথম বারে যেমন তারা এর প্রতি ঈমান আনেনি ঠিক তেমনিভাবেই আমি তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি।[৭৭] আমি এদেরকে এদের বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার মধ্যে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দিচ্ছি।

৭৩. এখানে আবার সে সত্যটিকে সামনে রাখতে হবে যেদিকে ইতিপূর্বে ব্যাখ্যার মধ্যে আমি ইশারা করেছি। অর্থাৎ যেসব ঘটনা প্রাকৃতিক আইনের আওতাধীনে সংঘটিত হয় আল্লাহ সেগুলোকে নিজের কর্মকাণ্ড হিসেবে গণ্য করে থাকেন। কারণ এ আইনগুলো তিনিই প্রবর্তন করেছেন এবং এগুলোর সাহায্যে যা কিছু ঘটে তাঁর হুকুমেই ঘটে। এগুলো বর্ণনা করার সময় তিনি বলে থাকেন ঃ আমি এমন করেছি আর অন্যদিকে আমরা মানুষেরা এগুলো বর্ণনা করার সময় বলি ঃ প্রকৃতিগতভাবে এমনটিই হয়ে থাকে।

৭৪. নিদর্শন মানে এমন কোন সুস্পষ্ট মু'জিযা, যা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা এবং তাঁর আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্তিকে মেনে না নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

৭৫. অর্থাৎ নিদর্শনসমূহ পেশ করার ও নিদর্শন তৈরী করে আনার ক্ষমতা আমার নেই। একমাত্র আল্লাহ এ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি চাইলে দেখাতে পারেন, না চাইলে নাও দেখাতে পারেন।

৭৬. এখানে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা অস্থির হয়ে এ আকাংখা পোষণ করতো এবং কখনো কখনো মুখেও এ ইচ্ছা প্রকাশ করতো যে, এমন কোন নিদর্শন প্রকাশ হয়ে যাক যা দেখে তাদের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ভাইয়েরা সত্য–সঠিক পথ অবলম্বন করতে পারে। তাদের এ আকাংখা ও ইচ্ছার জবাবে বলা হচ্ছে ঃ তোমাদের কেমন করে বুঝানো যাবে যে, এদের ঈমান আনা কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটার ওপর নির্ভরশীল নয়।

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ﴿١١١﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ؕ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٢﴾

১৪ রুকূ'

যদি আমি তাদের কাছে ফেরেশতাও নাযিল করতাম, মৃতেরাও তাদের সাথে কথা বলতে থাকতো এবং সারা দুনিয়ার সমস্ত জিনিসও তাদের চোখের সামনে একসাথে তুলে ধরতাম, তাহলেও তারা ঈমান আনতো না। তবে তারা ঈমান আনুক এটা যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয়, তাহলে অবশ্যি অন্য কথা[৭৮] কিন্তু বেশীর ভাগ লোক অজ্ঞের মতো কথা বলে থাকে। আর এভাবে আমি সবসময় মনুষ্য জাতীয় শয়তান ও জিন জাতীয় শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর দুশমনে পরিণত করেছি, তারা ধোঁকা ও প্রতারণার ছলে পরস্পরকে চমকপ্রদ কথা বলতো।[৭৯] তোমার রব চাইলে তারা এমনটি কখনো করতো না।[৮০] কাজেই তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও, তারা মিথ্যা রচনা করতে থাকুক।

৭৭. অর্থাৎ যে মানসিকতার কারণে প্রথমবার তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত শুনে তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল সে একই মানসিকতা তাদের মধ্যে এখনো কাজ করছে। তাদের দৃষ্টিভংগীর মধ্যে এখনো কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। যে বুদ্ধির প্যাঁচে পড়ে ও দৃষ্টির স্থূলতার শিকার হয়ে তারা সেদিন সত্যকে দেখতে ও বুঝতে পারেনি সে একই অবস্থা আজো তাদের ওপর চেপে বসে আছে।

৭৮. অর্থাৎ তারা নিজেদের স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা ব্যবহার করে মিথ্যার মোকাবিলায় সত্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে গ্রহণ করার ইচ্ছা পোষণ করে না। এমতাবস্থায় তাদের সত্যপন্থী হবার কেবলমাত্র একটি পথ বাকি থাকে। সেটি হচ্ছে, সৃষ্টিগত ও প্রকৃতিগতভাবে যেমন প্রতিটি স্বাধীন ক্ষমতাহীন সৃষ্টিকে সত্যপন্থী হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে ঠিক তেমনি তাদের থেকেও স্বাধীন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে প্রকৃতিগত ও জন্মগতভাবে তাদেরকে সত্যপন্থী বানিয়ে দেয়া। কিন্তু আল্লাহ যে কর্মকৌশলের ভিত্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এটি তার পরিপন্থী। কাজেই আল্লাহ সরাসরি তাঁর প্রকৃতিগত ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদেরকে মুমিন বানিয়ে দেবেন, তোমাদের এ ধরনের আশা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৭৯. অর্থাৎ আজ যদি মানুষ ও জিন সম্প্রদায়ের শয়তানরা একজোট হয়ে তোমার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে থাকে তাহলে আশংকার কোন কারণ নেই। কারণ এটা কোন নতুন কথা নয়। শুধুমাত্র তোমার একার ব্যাপারে এমনটি ঘটছে না। প্রত্যেক যুগে এমনটি হয়ে এসেছে। যখনই কোন নবী দুনিয়াবাসীকে সত্য পথ দেখাতে এগিয়ে এসেছেন তখনই সমস্ত শয়তানী শক্তি তাঁর মিশনকে ব্যর্থ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

"চমকপ্রদ কথা" বলতে সত্যের আহবায়ক ও তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত ও বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তোলার জন্য তারা যেসব কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বন এবং যে সমস্ত সন্দেহ সংশয় ও আপত্তি উত্থাপন করতো সেগুলোর কথা বলা হয়েছে। তারপর এ সমস্ত কথাকে সামষ্টিকভাবে ধোঁকা ও প্রতারণা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। কারণ সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সত্য বিরোধীরা যেসব অস্ত্রই ব্যবহার করে বাহ্যত সেগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী ও সফল অস্ত্র মনে হলেও তা কেবল অন্যদের জন্যই নয়, তাদের নিজেদের জন্যও প্রকৃতপক্ষে একটি ধোঁকা ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই হয় না।

৮০. এ ব্যাপারে আমরা আগে যেসব ব্যাখ্যা দিয়ে এসেছি সেগুলো ছাড়াও এখানে এ সত্যটি ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর ইচ্ছা ও চাওয়া এবং তাঁর সন্তুষ্টির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এটিকে উপেক্ষা করতে গেলে সাধারণভাবে অনেক বিভ্রান্তি দেখা দেয়। কোন জিনিস আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর অনুমোদনক্রমে আত্মপ্রকাশ করার অর্থ অবশ্যই এ নয় যে, আল্লাহ তাতে সন্তুষ্ট আছেন এবং তাকে পছন্দও করেন। আল্লাহ কোন ঘটনা সংঘটিত হবার অনুমতি না দিলে, তাঁর মহাপরিকল্পনায় তার সংঘটিত হবার অবকাশ না রাখলে এবং কার্যকারণসমূহকে সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি সংঘটিত করার অনুকূলে সক্রিয় না করলে দুনিয়ায় কোন ঘটনা সংঘটিত হয় না। আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমোদন ছাড়া কোন চোরের চুরি, হত্যাকারীর হত্যা, জালেম ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর বিপর্যয় এবং কাফের ও মুশরিকের কুফরী ও শিরক সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে কোন মুমিন ও মুত্তাকী ব্যক্তির ঈমান ও তাকওয়াও আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া সম্ভব নয়। দু' ধরনের ঘটনাই একইভাবে আল্লাহর ইচ্ছায়ই সংঘটিত হয়। কিন্তু প্রথম ধরনের ঘটনায় আল্লাহ সন্তুষ্ট নন। আর দ্বিতীয় ধরনের ঘটনা তিনি পছন্দ করেন, ভালবাসেন এবং এর প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। যদিও কোন বৃহত্তর কল্যাণের জন্যই বিশ্ব-জাহানের মালিকের ইচ্ছা কাজ করছে তবুও আলো ও আঁধার, ভাল ও মন্দ এবং সংস্কার ও বিপর্যয়ের বিপরীতমুখী শক্তিগুলোর পরস্পরের সাথে সংঘর্ষশীল হবার ফলেই এ কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হয়। তাই এ বৃহত্তর কল্যাণের ভিত্তিতেই তিনি আনুগত্য ও অবাধ্যতা, ইবরাহিমী প্রকৃতি ও নমরূদী প্রকৃতি, মূসার স্বভাব ও ফেরাউনী স্বভাব এবং মানবিক স্বভাব ও শয়তানী স্বভাব উভয়কেই কাজ করার সুযোগ দেন। তিনি নিজের স্বাধীন চেতনা ও ক্ষমতা সম্পন্ন সৃষ্টিকে (জিন ও মানুষ) ভাল ও মন্দের মধ্য থেকে কোন একটি বাছাই করে নেবার স্বাধীনতা দান করেছেন। পৃথিবীর এ কর্মশালায় প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো ভাল কাজ করতে পারে এবং খারাপ কাজও করতে পারে। আল্লাহর মর্জী ও ইচ্ছা যত দূর সুযোগ দেয়, যতদূর তিনি অনুমোদন দান করেন ততদূর পর্যন্ত উভয় ধরনের কর্মীরা পার্থিব উপায়-উপকরণসমূহের

وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿١١٣﴾ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ؕ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١١٤﴾

(এসব কিছু আমি তাদেরকে এ জন্য করতে দিচ্ছি যে) যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর এ (সুদৃশ্য) প্রতারণার প্রতি ঝুঁকে পড়ুক, তারা এর প্রতি তুষ্ট থাকুক এবং যেসব দুষ্কর্ম তারা করতে চায় সেগুলো করতে থাকুক। এমতাবস্থায় আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মীমাংসাকারীর সন্ধান করবো? অথচ তিনি পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণসহ তোমাদের কাছে কিতাব নাযিল করেছেন।[৮১] আর যাদেরকে আমি (তোমার আগে) কিতাব দিয়েছিলাম তারা জানে এ কিতাবটি তোমার রবেরই পক্ষ থেকে সত্য সহকারে নাযিল হয়েছে। কাজেই তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তরভুক্ত হয়ো না।[৮২]

সমর্থন লাভ করে থাকে। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে একমাত্র তারাই যারা ভাল ও কল্যাণের জন্য কাজ করে আর আল্লাহর বান্দা তাঁর প্রদত্ত নির্বাচনের স্বাধীনতা ব্যবহার করে মন্দকে নয়, ভাল ও কল্যাণকে অবলম্বন করুক, এটাই আল্লাহ ভালবাসেন।

এ সংগে একথাটিও বুঝে নিতে হবে যে, সত্যের দুশমনদের বিরোধিতামূলক কার্যকলাপের উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ বারবার নিজের ইচ্ছার বরাত দেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তাঁর মাধ্যমে মুমিনদেরকে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, তোমাদের কাজের ধরন ফেরেশতাদের মতো নয়। ফেরেশতারা কোন প্রকার বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই আল্লাহর হুকুম তামিল করছে। অন্যদিকে দুষ্কৃতিকারী ও বিদ্রোহীদের মোকাবিলায় আল্লাহর পছন্দনীয় পদ্ধতিকে বিজয়ী করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানোই হচ্ছে তোমাদের আসল কাজ। আল্লাহ নিজের ইচ্ছায় তাদেরকেও কাজ করার সুযোগ দিচ্ছেন, যারা নিজেদের প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মাধ্যমে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করে যাচ্ছে। আবার তোমরা যারা আনুগত্য ও বন্দেগীর পথ অবলম্বন করেছো তাদেরকেও একইভাবে কাজ করার পূর্ণ সুযোগ দিচ্ছেন। অবশ্য তাঁর সন্তুষ্টি, হেদায়াত, সমর্থন ও সাহায্য–সহায়তার হাত প্রসারিত হয়েছে তোমাদের দিকেই, কারণ তিনি যে কাজ পছন্দ করেন তোমরা তাই করে যাচ্ছো। কিন্তু তোমরা এ আশা করো না যে, আল্লাহ তাঁর অতি প্রাকৃতিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে যারা ঈমান আনতে চায় না তাদেরকে ঈমান গ্রহণে বাধ্য করবেন অথবা মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়ের

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۱۵﴾ وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿۱۱۶﴾

সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে তোমার রবের কথা পূর্ণাংগ, তাঁর ফরমানসমূহ পরিবর্তন করার কেউ নেই এবং তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।

আর হে মুহাম্মাদ! যদি তুমি দুনিয়ায় বসবাসকারী অধিকাংশ লোকের কথায় চলো তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে। তারা তো চলে নিছক আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে এবং তারা কেবল আন্দাজ-অনুমানই করে থাকে।[৮৩]

এমন সব শয়তানকে জোরপূর্বক সমস্ত পথ থেকে সরিয়ে দেবেন, যারা নিজেদের মন-মস্তিষ্ক ও হাত-পায়ের শক্তি এবং নিজেদের সমস্ত উপায়-উপকরণ সত্যের পথ রোধ করার জন্য ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেটা কখনো হবার নয়। যদি সত্যিই তোমরা সত্য, সততা, সৎবৃত্তি ও কল্যাণের জন্য কাজ করার সংকল্প করে থাকো, তাহলে অবশ্যি তোমাদের মিথ্যা ও বাতিলপন্থীদের মোকাবিলায় কঠোর প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে নিজেদের সত্যপ্রিয়তার প্রমাণ পেশ করতে হবে। অন্যথায় মুজিযা, কারামতি ও অলৌকিক ক্ষমতার জোরে যদি বাতিলকে নির্মূল ও হককে বিজয়ী করাই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে তো তোমাদের কোন প্রয়োজন ছিল না। আল্লাহ নিজেই দুনিয়ার সমস্ত শয়তানকে নির্মূল করে কুফরী ও শিরকের সম্ভাবনার সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করতে পারতেন।

৮১. এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি এবং এখানে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এখানে এ বক্তব্যের মর্ম হচ্ছে, আল্লাহ নিজের কিতাবে সুস্পষ্টভাবে এ সত্যগুলো ব্যক্ত করে দিয়েছেন এবং এ সিদ্ধান্তও জানিয়ে দিয়েছেন যে, অতি প্রাকৃতিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই সত্যপন্থীদেরকে স্বাভাবিক পথেই সত্যের বিজয়ের জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমি কি আল্লাহ ছাড়া এমন কোন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীর সন্ধান করবো, যে আল্লাহর এ সিদ্ধান্ত পুনরবিবেচনা করবে এবং এমন কোন মুজিযা পাঠাবে যার বদৌলতে এরা ঈমান আনতে বাধ্য হবে?

৮২. অর্থাৎ ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করার জন্য এসব কথাবার্তা আজ নতুন করে রচনা করা হয়নি যারা আসমানী কিতাবসমূহের জ্ঞান রাখে এবং নবীদের মিশন সম্পর্কে যারা অবগত তারা একথার সাক্ষ প্রদান করবে যে, যা কিছু কুরআনে বর্ণনা করা হচ্ছে তা সবই অকাট্য, আদি, অকৃত্রিম ও চিরন্তন সত্য এবং তার মধ্যে কখনো কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾
فَكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِـَٔايَٰتِهِۦ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

আসলে তোমার রবই ভাল জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে আছে আর কে সত্য–সরল পথে অবিচল রয়েছে।

এখন যদি তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ বিশ্বাস করে থাকো, তাহলে যে পশুর ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তার গোশ্‌ত খাও।[৮৪]

৮৩. অর্থাৎ দুনিয়ার অধিকাংশ লোক নির্ভুল জ্ঞানের পরিবর্তে কেবলমাত্র আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাদের আকীদা–বিশ্বাস, দর্শন, চিন্তাধারা, জীবন যাপনের মূলনীতি ও কর্মবিধান সবকিছুই ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে আল্লাহর পথ অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী দুনিয়ায় জীবন যাপন করার পথ মাত্র একটিই। সেটি হচ্ছে, আল্লাহ নিজে যে পথটি জানিয়ে দিয়েছেন—লোকেরা নিজেদের আন্দাজ–অনুমান ও ধারণা–কল্পনার ভিত্তিতে নিজেরাই যে পথটি তৈরী করেছে, সেটি নয়। কাজেই দুনিয়ার বেশীর ভাগ লোক কোন্ পথে যাচ্ছে, কোন সত্য সন্ধানীর এটা দেখা উচিত নয়। বরং আল্লাহ যে পথটি তৈরী করে দিয়েছেন তার ওপরই তার দৃঢ় পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলা উচিত। এ পথে চলতে গিয়ে দুনিয়ায় যদি সে নিসংগ হয়ে পড়ে তাহলেও তাকে একাকীই চলতে হবে।

৮৪. দুনিয়ার বেশীর ভাগ মানুষ নিজেদের ধারণা, কল্পনা ও আন্দাজ–অনুমানের ভিত্তিতে যেসব ভুল কর্মপন্থা অবলম্বন করেছে এবং যেগুলো ধর্মীয় বিধি–নিষেধের পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে পানাহার সামগ্রী সম্পর্কিত। বিভিন্ন জাতির মধ্যে এ জাতীয় বিধি–নিষেধের প্রচলন রয়েছে। অনেক জিনিসকে লোকেরা নিজেরাই হালাল গণ্য করেছে। অথচ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সেগুলো হারাম। আবার অনেক জিনিসকে লোকেরা নিজেরাই হারাম করে নিয়েছে। অথচ আল্লাহ সেগুলো হালাল করে দিয়েছেন। বিশেষ করে আল্লাহর নাম নিয়ে যেসব পশু যবেহ করা হবে সেগুলোকে হারাম ঠাওরানো হয়েছে এবং আল্লাহর নাম না নিয়ে যেগুলো যবেহ করা হবে সেগুলোকে একেবারেই হালাল মনে করা হয়েছে। এ ধরনের নিদারুণ অজ্ঞতাপ্রসূত দৃষ্টিভংগীর ওপর অতীতেও কোন কোন দল জোর দিয়েছিল এবং বর্তমানেও দুনিয়ার একদল লোক জোর দিয়ে চলছে। এরি প্রতিবাদে আল্লাহ এখানে মুসলমানদেরকে বলছেন, যদি সত্যি তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাকো এবং তাঁর বিধানসমূহ মেনে নিয়ে থাকো, তাহলে কাফের ও মুশরিকদের মধ্যে যেসব কুসংস্কার ও বিদ্বেষমূলক রীতি–প্রথার প্রচলন রয়েছে সেগুলো পরিহার করো, আল্লাহর বিধানের পরোয়া না করে মানুষ নিজেই যেসব বিধি–নিষেধের প্রাচীর তৈরী করেছে সেগুলো ভেঙ্গে ফেলো এবং আল্লাহ যে জিনিস হারাম করেছেন কেবল তাকেই হারাম মনে করো আর আল্লাহ যে জিনিস হালাল করেছেন কেবল তাকেই হালাল মনে করো।

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ
عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ
إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا
تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ
لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ
لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

যে জিনিসের ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে সেটি না খাওয়ার তোমাদের কি কারণ থাকতে পারে? অথচ যেসব জিনিসের ব্যবহার আল্লাহ নিরূপায় অবস্থা ছাড়া অন্য সব অবস্থায় হারাম করে দিয়েছেন সেগুলোর বিশদ বিবরণও তিনি তোমাদের জানিয়ে দিয়েছেন।[৮৫] *অধিকাংশ লোকের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা জ্ঞান ছাড়া নিছক নিজেদের খেয়াল খুশী অনুযায়ী বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলে থাকে। তোমার রব এ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে খুব ভাল করেই জানেন। তোমরা প্রকাশ্য গোনাহসমূহ থেকে বাঁচো এবং গোপন গোনাহসমূহ থেকেও। যারা গোনাহে লিপ্ত হয়, তাদেরকে নিজেদের সব কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করতেই হবে। আর যে পশুকে আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়নি তার গোশ্‌ত খেয়ো না। এটা অবশ্যি মহাপাপ। শয়তানরা তাদের সাথীদের অন্তরে সন্দেহ ও আপত্তির উদ্ভব ঘটায়, যাতে তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া করতে পারে।*[৮৬] *কিন্তু যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো তাহলে অবশ্যি তোমরা মুশরিক হবে।*[৮৭]

৮৫. সূরা নাহ্‌লের ১১৫ আয়াত দেখুন। এ ইংগিত থেকে পরোক্ষভাবে একথাও প্রমাণিত হলো যে, সূরা নাহ্‌ল এ সূরাটির আগে নাযিল হয়েছিল।

৮৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, ইহুদী আলেমরা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করার জন্য আরবের অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকদেরকে যেসব প্রশ্ন শেখাতো তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল ঃ "আল্লাহ যেগুলো হত্যা করেন সেগুলো হারাম হয়ে যায় আর তোমরা যেগুলো হত্যা করো সেগুলো

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾

১৫ রুকূ'

যে ব্যক্তি প্রথমে মৃত ছিল, পরে আমি তাকে জীবন দিয়েছি[৮৮] এবং তাকে এমন আলো দিয়েছি যার উজ্জ্বল আভায় সে মানুষের মধ্যে জীবন পথে চলতে পারে, সেকি এমন ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে অন্ধকারের বুকে পড়ে আছে এবং কোনক্রমেই সেখান থেকে বের হয় না?[৮৯] কাফেরদের জন্য তো এভাবেই তাদের কর্মকাণ্ডকে সুদৃশ্য বানিয়ে দেয়া হয়েছে।[৯০] আর এভাবে প্রতিটি লোকালয়ে আমি অপরাধীদের লাগিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা নিজেদের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার জাল ছড়াতে পারে। আসলে নিজেদের প্রতারণার জালে তারা নিজেরাই আবদ্ধ হয় কিন্তু তারা এর চেতনা রাখে না।

হালাল হয়ে যায় এর কারণ কি?" তথাকথিত আহলি কিতাবদের কুটিল ও বক্র মানসিকতার এটি একটি নমুনা মাত্র। সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করার এবং সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে ইহুদী আলেমরা এ ধরনের প্রশ্ন তৈরী করে তাদেরকে সরবরাহ করতো।

৮৭. অর্থাৎ একদিকে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দেয়া এবং অন্যদিকে আল্লাহ বিমুখ লোকদের বিধান অনুযায়ী চলা এবং তাদের নির্ধারিত পদ্ধতির অনুসরণ করাই হচ্ছে শিরক। আর জীবনের সমগ্র বিভাগে আল্লাহর পূর্ণাংগ আনুগত্য কায়েম করার নামই তাওহীদ। আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে যদি আকীদাগতভাবে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আনুগত্যলাভের অধিকারী বলে মনে করা হয়, তাহলে তা হবে আকীদাগত শিরক। আর যদি কার্যত এমন লোকদের আনুগত্য করা হয়, যারা আল্লাহর বিধানের পরোয়া না করে নিজেরাই হুকুমকর্তা ও বিধি-নিষেধের মালিক হয়ে বসে তাহলে তা হবে কর্মগত শিরক।

৮৮. এখানে মৃত্যু বলা হয়েছে অজ্ঞতা, মূর্খতা ও চেতনাবিহীন অবস্থাকে। আর জীবন বলতে জ্ঞান, উপলব্ধি ও প্রকৃত সত্যকে চিনতে পারার অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তির মধ্যে ভুল ও নির্ভুলের পার্থক্যবোধ নেই এবং যার সত্য-সরল পথের স্বরূপ জানা নেই, জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সে জীবন সম্পন্ন হলেও প্রকৃত সত্যের বিচারে সে মনুষ্য পদবাচ্য নয়। সে অবশ্যি জীবন্ত প্রাণী কিন্তু জীবন্ত মানুষ নয়। জীবন্ত মানুষ একমাত্র তাকেই বলা যাবে যে সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও ভুল-নির্ভুলের চেতনা রাখে।

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۘ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾

তাদের সামনে কোন আয়াত এলে তারা বলে, "আল্লাহর রসূলদেরকে যে জিনিস দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তা আমাদের দেয়া হয় ততক্ষণ আমরা মানবো না।"[৯১] আল্লাহ নিজের রিসালাতের কাজ কাকে দিয়ে কিভাবে নেবেন তা তিনি নিজেই ভাল জানেন। এ অপরাধীরা নিজেদের প্রতারণা ও কূটকৌশলের অপরাধে আল্লাহর কাছে অচিরেই লাঞ্ছনা ও কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যাকে সত্যপথ দেখাবার সংকল্প করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।[৯২] আর যাকে তিনি গোমরাহীতে নিক্ষেপ করার সংকল্প করেন তার বক্ষদেশ সংকীর্ণ করে দেন এবং এমনভাবে তাকে সংকুচিত করতে থাকেন যে, (ইসলামের কথা চিন্তা করতেই) তার মনে হতে থাকে যেন তার আত্মা আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। এভাবে আল্লাহ (সত্য থেকে দূরে পলায়ন ও সত্যের প্রতি ঘৃণার) আবিলতা ও অপবিত্রতা বেঈমানদের ওপর চাপিয়ে দেন।

৮৯. অর্থাৎ যে মানুষটি মানবিক চেতনা লাভ করেছে এবং জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোয় বাঁকা পথগুলোর মাঝখানে পড়ে থাকা সত্যের সোজা রাজপথটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, তার ব্যাপারে কেমন করে আশা করা যেতে পারে যে, সে এমনসব চেতনাবিহীন লোকদের মতো দুনিয়ায় জীবন যাপন করবে, যারা অজ্ঞতা ও মূর্খতার অন্ধকারে পথ হারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

৯০. অর্থাৎ যাদেরকে আলো দেখানো হয় এবং তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে আর যাদেরকে সত্য–সরল পথের দিকে আহবান জানানো হয় এবং তারা সে আহবানে কর্ণপাত না করে নিজেদের বাঁকা পথেই চলতে থাকে, তাদের জন্য এটিই আল্লাহর বিধান যে, এরপর অন্ধকারই তাদের কাছে ভাল মনে হতে থাকবে। তারা অন্ধের মতো পথ হাতড়ে চলা এবং এখানে সেখানে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়া পছন্দ করবে। ঝোপ–ঝাড়

وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿۱۲۶﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۷﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ۗ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۗ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۲۸﴾ وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۱۲۹﴾

অথচ এ পথটিই তোমাদের রবের সোজা পথ। আর তার নিদর্শনগুলো তাদের জন্য সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যারা উপদেশ গ্রহণ করে। তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে শান্তির আবাস[৯৩] এবং তিনি তাদের অভিভাবক। কারণ, তারা সঠিক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে ঘেরাও করে একত্র করবেন সেদিন তিনি জিনদের[৯৪] সম্বোধন করে বলবেন, "হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা তো মানুষদেরকে অনেক বেশী তোমাদের অনুগামী করেছো।" মানুষদের মধ্য থেকে যারা তাদের বন্ধু ছিল তারা বলবে, "হে আমাদের রব! আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকে প্রত্যেককে খুব বেশী ব্যবহার করেছে[৯৫] এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছিলে এখন আমরা সেখানে পৌঁছে গেছি।" আল্লাহ বলবেন, "বেশ, এখন আগুনই তোমাদের আবাস। সেখানে তোমরা থাকবে চিরকাল।" তা থেকে রক্ষা পাবে একমাত্র তারাই যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করতে চাইবেন। নিসন্দেহে তোমাদের রব জ্ঞানময় ও সবকিছু জানেন।[৯৬] দেখো এভাবে আমি (আখেরাতে) জালেমদেরকে পরস্পরের সাথী বানিয়ে দেবো (দুনিয়ায় তারা এক সাথে মিলে) যা কিছু উপার্জন করেছিল তার কারণে।[৯৭]

তাদের চোখে বাগান এবং কাঁটা তাদের দৃষ্টিতে ফুল হয়ে দেখা দেবে। সব রকমের অন্যায়, অসৎকাজ ও ব্যভিচারে তারা আনন্দ পায়। প্রত্যেকটি নির্বুদ্ধিতাকে তারা গবেষণা ও অনুসন্ধানলব্ধ কীর্তি মনে করে। প্রত্যেকটি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী পরীক্ষা–নিরীক্ষার পর তারা

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿١٣٠﴾

১৬ রুকূ'

(এ সময় আল্লাহ তাদেরকে একথাও জিজ্ঞেস করবেন) "হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে কি রসূলরা আসেনি, যারা তোমাদেরকে আমার আয়াত শোনাতো এবং এ দিনটির পরিণাম সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করতো?" তারা বলবে, "হাঁ, আমরা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দিচ্ছি।[৯৮] *আজ দুনিয়ার জীবন এদেরকে প্রতারণা জালে আবদ্ধ করে রেখেছে কিন্তু সেদিন এরা কাফের ছিল বলে নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে।*[৯৯]

এ আশায় আরো বড় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী পরীক্ষা–নিরীক্ষার জন্য তৈরী হয়ে যায় যে, প্রথমবারে তো ঘটনাক্রমে জ্বলন্ত অংগারে হাত লেগেছিল কিন্তু এবারে আর কোন অনিশ্চয়তা নেই, এবারে একেবারে নির্ঘাৎ মনি–মুক্তো হাতে ঠেকবে।

৯১. অর্থাৎ রসূলদের কাছে ফেরেশতা এসেছে এবং তারা আল্লাহর পয়গাম এনেছে, রসূলদের এ দাবী আমরা মানি না। যতক্ষণ ফেরেশতারা সরাসরি আমাদের কাছে না আসে এবং "এটি আল্লাহর বাণী" একথা সরাসরি আমাদের না বলে ততক্ষণ আমরা ঈমান আনতে পারি না।

৯২. বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে দেয়ার মানে হচ্ছে, ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে হৃদয়ে পূর্ণ নিসংশয়তা ও নিশ্চিন্ততা সৃষ্টি করা এবং যাবতীয় সন্দেহ, সংশয় ও দোদুল্যমানতা দূর করে দেয়া।

৯৩. শান্তির ঘর মানে জান্নাত, যেখানে মানুষ সব রকমের বিপদ আপদ থেকে সংরক্ষিত এবং সব রকমের ক্ষতির হাত থেকে নিরাপদ থাকবে।

৯৪. এখানে জিন বলতে শয়তান জিন বুঝানো হয়েছে।

৯৫. অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকে প্রত্যেককে অবৈধভাবে কাজে লাগিয়েছে এবং তার দ্বারা লাভবান হয়েছে। প্রত্যেকে অন্যকে প্রতারণা করে নিজের কামনা বাসনা চরিতার্থ করেছে।

৯৬. অর্থাৎ যদিও আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবার এবং যাকে ইচ্ছা মাফ করার ইখতিয়ার রাখেন কিন্তু এ শাস্তি দেয়া ও মাফ করা যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া নিছক খেয়াল খুশীর ভিত্তিতে হবে না। বরং এর পেছনে থাকবে জ্ঞান ও ন্যায়সংগত কারণ। আল্লাহ সেই অপরাধীকে মাফ করবেন যার সম্পর্কে তিনি জানেন যে, তার অপরাধের জন্য সে

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ﴿١٣١﴾ وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٢﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَاۤ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ﴿١٣٣﴾

(একথা প্রমাণ করার জন্য তাদের কাছ থেকে এ সাক্ষ নেয়া হবে যে,) তোমাদের রব জনপদগুলোকে জুলুম সহকারে ধ্বংস করতেন না যখন সেখানকার অধিবাসীরা প্রকৃত সত্য অবগত নয়।[১০০]

প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা তার কার্য অনুযায়ী হয়। আর তোমার রব মানুষের কাজের ব্যাপারে বেখবর নন। তোমার রব কারোর মুখাপেক্ষী নন এবং দয়া ও করুণা তাঁর রীতি।[১০১] তিনি চাইলে তোমাদের সরিয়ে দিতে এবং তোমাদের জায়গায় তার পছন্দমত অন্য লোকদের এনে বসাতে পারেন, যেমন তিনি তোমাদের আবির্ভূত করেছেন অন্য কিছু লোকের বংশধারা থেকে।

নিজে দায়ী নয়। তিনি তাকেই শাস্তি দেবেন যাকে শাস্তি দেয়া তিনি যুক্তিসংগত মনে করবেন।

৯৭. অর্থাৎ যেভাবে দুনিয়ায় গোনাহ ও অসৎকাজ করার ব্যাপারে তারা পরস্পরের শরীক ছিল ঠিক তেমনি আখেরাতেও শাস্তি পাওয়ার ব্যাপারে তারা পরস্পরের শরীক হবে।

৯৮. অর্থাৎ আমরা স্বীকার করছি, আপনার পক্ষ থেকে রসূলের পর রসূল এসেছেন। তারা প্রকৃত সত্যের ব্যাপারে ক্রমাগতভাবে আমাদের অবহিত ও সতর্কও করেছেন। কিন্তু তাদের কথা না মেনে আমরা নিজেরাই ভুল করেছি।

৯৯. অর্থাৎ এরা বেখবর বা অজ্ঞ ছিল না বরং অস্বীকারকারী কাফের ছিল। তারা নিজেরাই স্বীকার করবে, সত্য তাদের কাছে পৌঁছেছিল কিন্তু আমরা নিজেরাই তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলাম।

১০০. অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর মোকাবিলায় এ মর্মে প্রতিবাদ জানাবার সুযোগ দিতে চান না যে, আপনি প্রকৃত সত্য সম্পর্কে আমাদের অবগত করেননি এবং আমাদের সঠিক পথ জানাবার কোন ব্যবস্থাও করেননি। ফলে অজ্ঞতাবশত আমরা যখন ভুল পথে চলতে শুরু করেছি অমনি আমাদের পাকড়াও করতে শুরু করেছেন। এ যুক্তি প্রদর্শনের পথ রোধ করার জন্য আল্লাহ নবী পাঠিয়েছেন, কিতাব নাযিল করেছেন। এভাবে জিন ও মানব জাতিকে সত্যপথ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবগত করেছেন। এরপর লোকেরা ভুল পথে চললে এবং আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিলে এর যাবতীয় দায়–দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তায়, আল্লাহর ওপর নয়।

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ۙ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٤﴾ قُلْ يَـٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ
مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۙ مَن تَكُونُ لَهُۥ عَـٰقِبَةُ
ٱلدَّارِ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿١٣٥﴾ وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ
وَٱلْأَنْعَـٰمِ نَصِيبًا فَقَالُوا۟ هَـٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَـٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۖ فَمَا كَانَ
لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ
شُرَكَآئِهِمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾

তোমাদের কাছে যে জিনিসের ওয়াদা করা হচ্ছে তা নিশ্চিতভাবেই আসবে।[১০২] আর তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করে দেবার ক্ষমতা রাখো না। হে মুহাম্মাদ! বলে দাও, হে লোকেরা, তোমরা নিজেদের জায়গায় কাজ করে যেতে থাকো এবং আমিও নিজের জায়গায় কাজ করে যেতে থাকি,[১০৩] শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে পরিণাম কার জন্য মংগলজনক হবে। তবে জালেম কখনো সফলকাম হতে পারে না, এটি একটি চিরন্তন সত্য।

এ লোকেরা[১০৪] আল্লাহর জন্য তাঁরই সৃষ্ট ক্ষেত–খামার ও গবাদি পশুর মধ্য থেকে একটি অংশ নির্দিষ্ট করেছে আর নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলছে, এটি আল্লাহর জন্য এবং এটি আমাদের বানানো আল্লাহর শরীকদের জন্য।[১০৫] তারপর যে অংশ তাদের বানানো শরীকদের জন্য, তা তো আল্লাহর কাছে পৌঁছে না কিন্তু যে অংশ আল্লাহর জন্য তা তাদের বানানো শরীকদের কাছে পৌঁছে যায়।[১০৬] কতই না খারাপ ফায়সালা করে এরা!

১০১. "তোমাদের রব কারো মুখাপেক্ষী নন।" অর্থাৎ তাঁর কোন কাজ তোমাদের জন্য আটকে নেই। তোমাদের সাথে তাঁর কোন স্বার্থ জড়িত নেই। কাজেই তোমাদের নাফরমানীর ফলে তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। অথবা তোমাদের আনুগত্যের ফলে তিনি লাভবানও হবেন না। তোমরা সবাই মিলে কঠোরভাবে তাঁর হুকুম অমান্য করলে তাঁর বাদশাহী ও সার্বভৌম কর্তৃত্বে এক বিন্দু পরিমাণ কমতি দেখা দেবে না। আবার সবাই মিলে তাঁর হুকুম মেনে চললে এবং তাঁর বন্দেগী করতে থাকলেও তাঁর সাম্রাজ্যে এক বিন্দু পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটবে না। তিনি তোমাদের সেলামীর মুখাপেক্ষী নন। তোমাদের মানত–নযরানারও তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর বিপুল ভাণ্ডার তোমাদের জন্য অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছেন এবং এর বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে কিছুই চান না।

"দয়া ও করুণা তাঁর রীতি।" পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এখানে এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হয়। একটি অর্থ হচ্ছে, তোমাদের রব তোমাদেরকে সত্য–সরল পথে চলার নির্দেশ দেন এবং প্রকৃত ও বাস্তব সত্যের বিপরীত পথে চলতে নিষেধ করেন। তাঁর এ আদেশ–নিষেধের অর্থ এ নয় যে, তোমরা সঠিক পথে চললে তাঁর লাভ এবং তোমরা ভুল পথে চললে তাঁর ক্ষতি। বরং এর আসল অর্থ হচ্ছে এই যে, সঠিক পথে চললে তোমাদের লাভ এবং ভুল পথে চললে তোমাদের ক্ষতি। কাজেই তিনি তোমাদের সঠিক কর্মপদ্ধতি শিক্ষা দেন। তার সাহায্যে তোমরা উচ্চতম পর্যায়ে উন্নীত হবার যোগ্যতা লাভ করতে পার। তিনি তোমাদের ভুল কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখেন। এর ফলে তোমরা নিম্ন পর্যায়ে নেমে যাওয়া থেকে রক্ষা পাও। এগুলো তাঁর করুণা ও মেহেরবানী ছাড়া আর কিছুই নয়। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমাদের রব কঠোরভাবে পাকড়াও করেন না। তোমাদের শাস্তি দেবার মধ্যে তাঁর কোন আনন্দ নেই। তোমাদের পাকড়াও করার ও আঘাত দেবার জন্য তিনি ওঁৎ পেতে বসে নেই। তোমাদের সামান্য ভুল হলেই অমনি তিনি তোমাদের ওপর চড়াও হবেন, তা নয়। আসলে নিজের সকল সৃষ্টির প্রতি তিনি বড়ই মেহেরবান। নিজের সার্বভৌম কর্তৃত্ব পরিচালনার ব্যাপারে তিনি চরম দয়া, করুণা, অনুগ্রহ ও অনুকম্পার পরিচয় দিয়ে চলেছেন। মানুষের ব্যাপারেও তিনি এ নীতিই অবলম্বন করছেন। তাই তিনি একের পর এক তোমাদের ভুল–ত্রুটি ক্ষমা করে যেতে থাকেন। তোমরা নাফরমানী করে যেতে থাকো, গোনাহ করতে থাকো, অপরাধ করতে থাকো, তাঁর দেয়া জীবিকায় প্রতিপালিত হয়ে তাঁরই বিধান অমান্য করতে থাকো। কিন্তু তিনি ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার আশ্রয় নেন এবং তোমাদের উপলব্ধি করার ও সংশোধিত হবার জন্য ছাড় ও অবকাশ দিয়ে যেতে থাকেন। অন্যথায় তিনি যদি কঠোরভাবে পাকড়াও করতেন, তাহলে তোমাদের এ দুনিয়া থেকে বিদায় দিয়ে তোমাদের জায়গায় অন্য একটি জাতির উত্থান ঘটানো অথবা সমগ্র মানব জাতিকে ধ্বংস করে দিয়ে আর একটি নতুন প্রজাতির জন্ম দেয়া তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না।

১০২. অর্থাৎ কিয়ামত। তখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষকে আবার নতুন করে জীবিত করা হবে। শেষ বিচারের জন্য তাদেরকে তাদের রবের সামনে পেশ করা হবে।

১০৩. অর্থাৎ আমার বুঝাবার পরও যদি তোমরা না বুঝতে চাও এবং নিজেদের ভ্রান্ত পদক্ষেপ থেকে বিরত না হও, তাহলে যে পথে তোমরা চলছো সে পথে চলে যেতে থাকো আর আমাকে আমার পথে চলতে দাও। এর পরিণাম যা কিছু হবে তা তোমাদের সামনেও আসবে এবং আমার সামনেও।

১০৪. ওপরের ভাষণটি এ বলে শেষ করা হয়েছিল যে, এরা যদি উপদেশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত না হয় এবং নিজেদের মূর্খতার ওপর জিদ চালিয়ে যেতেই থাকে, তাহলে তাদেরকে বলে দাও ঃ ঠিক আছে, তোমরা তোমাদের পথে চলো এবং আমি আমার পথে চলি, তারপর একদিন কিয়ামত অবশ্যি আসবে, সে সময় এ কর্মনীতির ফল তোমরা অবশ্যি জানতে পারবে, তবে একথা ভালভাবে জেনে রাখো, সেখানে জালেমদের ভাগ্যে কোন সফলতা লেখা নেই। তারপর যে জাহেলিয়াতের ওপর তারা জোর দিয়ে আসছিল এবং যাকে কোনক্রমেই ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত ছিল না, তার কিছুটা ব্যাখ্যা এখন

এখানে করা হচ্ছে। তাদের সামনে তাদের সে "জুলুমের" স্বরূপ তুলে ধরা হচ্ছে যার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তারা কোন সফলতার মুখ দেখার আশা করতে পারে না।

১০৫. তারা একথা স্বীকার করতো, পৃথিবীর মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। তিনিই গাছপালা ও শস্যাদি উৎপন্ন করেন। তাছাড়া যেসব গবাদি পশুকে তারা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে তাদের স্রষ্টাও আল্লাহ। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের ধারণা ছিল, তাদের প্রতি আল্লাহ এই যেসব অনুগ্রহ করেছেন এগুলো তাদের প্রতি স্নেহ মমতা ও করুণার ধারা বর্ষণকারী দেবদেবী, ফেরেশতা, জিন, তারকা ও পূর্ববর্তী সৎব্যক্তিবর্গের পবিত্র আত্মার বদৌলতেই সম্ভব হয়েছে। এ জন্য তারা নিজেদের ক্ষেতের ফসল ও গৃহপালিত পশু থেকে দু'টি অংশ উৎসর্গ করতো। একটি অংশ উৎসর্গ করতো আল্লাহর নামে। যেহেতু তিনিই এ ফসল ও পশু তাদেরকে দান করেছেন। তাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় অংশটি উৎসর্গ করতো নিজেদের গোত্র বা পরিবারের অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোশক উপাস্যদের নযরানা হিসেবে। তাদের করুণা ও অনুগ্রহের ধারা অব্যাহত রাখাই ছিল এর উদ্দেশ্য। আল্লাহ সর্বপ্রথম তাদের এ জুলুমের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। আল্লাহ বলেন, এসব গবাদি পশু আমিই সৃষ্টি করেছি এবং আমিই এগুলো তোমাদের দান করেছি, তাহলে এ জন্য অন্যদের কাছে নযরানা পেশ করছো কেন? যিনি তোমাদের প্রতি সরাসরি অনুগ্রহ ও করুণা করেছেন, তোমাদের সে মহান অনুগ্রহকারী সত্তার অনুগ্রহকে অন্যদের হস্তক্ষেপ, সহায়তা ও মধ্যস্থতার ফল গণ্য করা এবং এ জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে সে মহান অনুগ্রহকারীর অধিকারের মধ্যে তাদেরকে শরীক করা কি নিমকহারামী নয়? তারপর ইংগিতে এ বলে তাদের পুনরায় সমালোচনা করেছেন যে, তারা আল্লাহর এই যে অংশ নির্ধারণ করেছে এও তাদের নিজেদের নির্ধারিত, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নয়। তারা নিজেরাই নিজেদের বিধায়কে পরিণত হয়েছে। নিজেরাই ইচ্ছামতো যে অংশটা চাচ্ছে আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করছে আবার যে অংশটা চাচ্ছে অন্যদের জন্য নির্ধারণ করছে। অথচ এ দানের আসল মালিক ও সর্বময় অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এ দান থেকে কি পরিমাণ তাঁর জন উৎসর্গ করতে হবে এবং বাকি অংশের মধ্যে আর কার কার অধিকার আছে তা নির্ধারিত হতে হবে আল্লাহর দেয়া শরীয়াতের মাধ্যমে। কাজেই তারা নিজেরা নিজেদের মনগড়া বাতিল পদ্ধতিতে আল্লাহর জন্য যে অংশ উৎসর্গ করে এবং যে অংশ গরীব ও অভাবীদের মধ্যে দান করে দেয়, তাও কোন সৎকাজ হিসেবে গণ্য হবে না। আল্লাহর দরবারে তার গৃহীত হবার কোন কারণ নেই।

১০৬. তারা আল্লাহর নামে যে অংশ নির্ধারণ করতো নানা ধরনের চালবাজীর আশ্রয় নিয়ে তার মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার কমতি করতে থাকতো এবং প্রত্যেকবার নিজেদের মনগড়া শরীকদের অংশ বাড়াবার প্রচেষ্টা চালাতো, তাদের কর্মনীতির প্রতি এখানে সূক্ষ্ম বিদ্রূপ করা হয়েছে। এ থেকে একথা প্রকাশ হতো যে, নিজেদের মনগড়া উপাস্যদের সাথে তাদের যে মানসিক যোগ আছে তা আল্লাহর সাথে নেই। যেমন আল্লাহর নামে যেসব শস্য বা ফল নির্ধারণ করা হতো তার মধ্য থেকে কিছু পড়ে গেলে তা মনগড়া মাবুদদের অংশে শামিল করা হতো। আর মনগড়া মাবুদদের অংশ থেকে কিছু পড়ে গেলে বা আল্লাহর অংশে পাওয়া গেলে তা আবার মনগড়া মাবুদদের অংশে ফেরত দেয়া হতো। শস্য ক্ষেত্রের যে অংশ মনগড়া মাবুদদের নযরানার জন্য নির্দিষ্ট ছিল সেদিক থেকে যদি আল্লাহর

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾

আর এভাবেই বহু মুশরিকের জন্য তাদের শরীকরা নিজেদের সন্তান হত্যা করাকে সুশোভন করে দিয়েছে,[১০৭] যাতে তাদেরকে ধ্বংসের আবর্তে নিক্ষেপ করতে[১০৮] এবং তাদের দীনকে তাদের কাছে সংশয়িত করে তুলতে পারে।[১০৯] আল্লাহ চাইলে তারা এমনটি করতো না। কাজেই তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা নিজেদের মিথ্যা রচনায় ডুবে থাক।[১১০]

নযরানার জন্য নির্দিষ্ট অংশের দিকে পানির ধারা প্রবাহিত হতো তাহলে তার সমস্ত ফসল মনগড়া মাবুদদের অংশে দিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু এর বিপরীত ঘটনা ঘটলে আল্লাহর অংশে কোন বৃদ্ধি করা হতো না। কোন বছর দুর্ভিক্ষের কারণে যদি নযরানার ফসল খেয়ে ফেলার প্রশ্ন দেখা দিতো, তাহলে আল্লাহর ভাগের ফসল খেয়ে ফেলা হতো। কিন্তু মনগড়া শরীকদের ভাগের ফসলে হাত লাগানো হতো না। ভয় করা হতো, এ অংশে হাত দিলে কোন বালা-মুসিবত নাযিল হয়ে যাবে। কোন কারণে শরীকদের অংশ কম হয়ে গেলে আল্লাহর অংশ থেকে কেটে তা পূরণ করে দেয়া হতো। কিন্তু আল্লাহর অংশ কম হয়ে গেলে শরীকদের অংশ থেকে একটি দানাও সেখানে ফেলা হতো না। এ কর্মনীতির সমালোচনা করা হলে নানা ধরনের মুখরোচক ও চিত্তাকর্ষক ব্যাখ্যার অবতারণা করা হতো। যেমন বলা হতো, আল্লাহ তো কারোর মুখাপেক্ষী নন। তাঁর অংশ কিছু কম হয়ে গেলেও তাঁর কোন পরোয়া নেই। আর শরীকরা তো আল্লাহর বান্দা। তারা আল্লাহর মতো অভাবহীন নয়। কাজেই তাদের ওখানে সামান্য কমবেশী হলেও তারা আপত্তি জানায়।

এ কাল্পনিক ধারণা ও কুসংস্কারগুলোর মূল কোথায় প্রোথিত ছিল তা বুঝার জন্য এটা জানা প্রয়োজন যে, আরবের মূর্খ ও অজ্ঞ লোকেরা নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে আল্লাহর জন্য যে অংশ নির্ধারণ করতো তা গরীব মিসকীন, মুসাফির, এতীম ইত্যাদির সাহায্যের কাজে ব্যয়িত হতো। আর মনগড়া শরীকদেরকে নযরানা দেবার জন্য যে অংশ নির্ধারণ করতো তা হয় সরাসরি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পেটে চলে যেতো অথবা পূজার বেদীমূলে অর্ঘরূপে পেশ করা হতো এবং এভাবে তাও পরোক্ষভাবে পূজারী ও সেবায়েতদের ঝুলিতে গিয়ে পড়তো। এ জন্যই শত শত বছর ধরে এ স্বার্থ শিকারী ধর্মীয় নেতারা ক্রমাগতভাবে উপদেশ দানের মাধ্যমে অজ্ঞ জনতার মনে একথা বসিয়ে দিয়েছিল যে, আল্লাহর অংশে কিছু কম হয়ে গেলে ক্ষতি নেই কিন্তু "আল্লাহর প্রিয়পাত্রদের" অংশে কিছু কম হওয়া উচিত নয় বরং সম্ভব হলে সেখানে কিছু বেশী হতে থাকাটাই ভালো।

১০৭. এখানে শরীকরা শব্দটি আগের অর্থ থেকে পৃথক অন্য একটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ওপরের আয়াতে "শরীক" শব্দটি থেকে তাদের এমন সব মাবুদদেরকে বুঝানো

হয়েছিল যাদের বরকত, সুপারিশ বা মাধ্যমকে তারা নিয়ামত ও অনুগ্রহলাভের কাজে সাহায্যকারী মনে করতো এবং তাদের নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতালাভের অধিকারের ক্ষেত্রে তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করতো। অন্যদিকে এ আয়াতে শরীক বলতে মানুষ ও শয়তানদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা সন্তান হত্যাকে তাদের দৃষ্টিতে একটি বৈধ ও পছন্দনীয় কাজে পরিণত করেছিল। তাদেরকে শরীক বলার কারণ হচ্ছে এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে যেভাবে পূজা ও উপাসনালাভের একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ অনুরূপভাবে বান্দাদের জন্য আইন প্রণয়ন এবং বৈধ ও অবৈধের সীমা নির্ধারণ করার অধিকারও একমাত্র আল্লাহর। কাজেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর সামনে পূজা ও উপাসনার কোন অনুষ্ঠান করা যেমন তাকে আল্লাহর সাথে শরীক করার সমার্থক ঠিক তেমনি কারোর মনগড়া আইনকে সত্য মনে করে তার আনুগত্য করা এবং তার নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করাকে অপরিহার্য মনে করাও তাকে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে শরীক গণ্য করারই শামিল। এ দু'টি কাজ অবশ্যি শিরক। যে ব্যক্তি এ কাজটি করে, সে যাদের সামনে মানত ও নযরানা পেশ করে অথবা যাদের নির্ধারিত আইনকে অপরিহার্যভাবে মেনে চলে, তাদেরকে মুখে ইলাহ বা রব বলে ঘোষণা করুক বা না করুক তাতে এর শিরক হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য সূচিত হয় না।

আরববাসীদের মধ্যে সন্তান হত্যা করার তিনটি পদ্ধতির প্রচলন ছিল। কুরআনে এ তিনটির দিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

এক ঃ মেয়ের কারণে কোন ব্যক্তিকে জামাই হিসেবে গ্রহণ করতে হবে অথবা গোত্রীয় যুদ্ধে শত্রুরা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে বা অন্য কোন কারণে তার জন্য পিতামাতাকে লজ্জার সম্মুখীন হতে হবে—এসব চিন্তায় মেয়েদের হত্যা করা হতো।

দুই ঃ সন্তানদের লালন পালনের বোঝা বহন করা যাবে না এবং অর্থনৈতিক উপাদান ও সুযোগ-সুবিধার অভাবের দরুন তারা দুর্বিসহ বোঝায় পরিণত হবে—এ ভয়ে সন্তানদের হত্যা করা হতো।

তিন ঃ নিজেদের উপাস্যদের সন্তুষ্টির জন্য সন্তানদের বলি দেয়া হতো।

১০৮. এ "ধ্বংস" শব্দটি এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ ঃ নৈতিক ধ্বংসও হয়। যে ব্যক্তি নির্মমতা ও হৃদয়হীনতার এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যার ফলে নিজের সন্তানকে নিজের হাতে হত্যা করতে থাকে, তার মধ্যে মানবিক গুণ তো দূরের কথা পাশবিক গুণেরও অস্তিত্ব থাকে না। আবার এর অর্থ ঃ সম্প্রদায়গত ও জাতীয় ধ্বংসও হয়। সন্তান হত্যার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে বংশ হ্রাস ও জনসংখ্যা কমে যেতে থাকে। এর ফলে মানব সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সংশ্লিষ্ট জাতিও ধ্বংসের আবর্তে নেমে যেতে থাকে। কারণ এ জাতি নিজেদের সাহায্য, সহায়তা ও সমর্থন দানকারী, নিজেদের তামাদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী এবং নিজেদের উত্তরাধিকারীদের জন্মের পথ রুদ্ধ করে অথবা জন্মের পরপরই নিজেরাই নিজেদের হাতে তাদেরকে খতম করে দেয়। এ ছাড়া এর অর্থ পরিণামগত ধ্বংসও হয়। যে ব্যক্তি নিরপরাধ-নিষ্পাপ শিশুদের ওপর এ ধরনের জুলুম করে, নিজের মনুষ্যত্বকে এমনকি প্রাণী-সুলভ প্রকৃতিকেও এভাবে জবাই করে এবং মানব সম্প্রদায়ের সাথে ও নিজের জাতির সাথেও এ ধরনের শত্রুতা করে, সে নিজেকে আল্লাহর কঠিনতম আযাবের উপযোগী করে তোলে।

وَقَالُوا هَٰذِهِۦٓ أَنْعَٰمٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَآ إِلَّا مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَٰمٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَٰمٌ لَّا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾

তারা বলে, এ পশু ও এ ক্ষেত-খামার সুরক্ষিত। এগুলো একমাত্র তারাই খেতে পারে যাদেরকে আমরা খাওয়াতে চাই। অথচ এ বিধি-নিষেধ তাদের মনগড়া।[১১১] তারপর কিছু পশুর পিঠে চড়া ও তাদের পিঠে মাল বহন করা হারাম করে দেয়া হয়েছে আবার কিছু পশুর ওপর তারা আল্লাহর নাম নেয় না[১১২] আর এসব কিছু আলাহ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা রটনা।[১১৩] শীঘ্রই আল্লাহ তাদেরকে এ মিথ্যা রটনার প্রতিফল দেবেন।

১০৯. জাহেলী যুগের আরবরা নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিমাস সালামের অনুসারী মনে করতো এবং এ হিসেবে নিজেদের পরিচয়ও দিতো। এ জন্য তাদের ধারণা ছিল, তারা যে ধর্মের অনুসরণ করছে সেটি আল্লাহর পছন্দনীয় ধর্ম। কিন্তু হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের কাছ থেকে যে জীবন বিধানের শিক্ষা তারা নিয়েছিল তার মধ্যে পরবর্তী বিভিন্ন শতকে বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা, গোত্রীয় সরদার, পরিবারের বয়োবৃদ্ধ এবং অন্যান্য লোকেরা নানান ধরনের বিশ্বাস ও কর্মের সংযোজন ঘটিয়েছে। পরবর্তী বংশধরেরা সেগুলোকেই আসল দীন ও জীবন বিধানের অংশ মনে করেছে এবং ভক্তি সহকারে সেগুলো মেনে চলেছে। যেহেতু জাতীয় ঐতিহ্যে, ইতিহাসে বা কোন গ্রন্থে এমন কোন রেকর্ড সংরক্ষিত ছিল না, যা থেকে আসল ধর্ম কি ছিল এবং পরবর্তীকালে কোন্ সময় কে কোন্ বিষয়টি তাতে বৃদ্ধি করেছিল, তা জানা যেতে পারে, তাই আরববাসীদের জন্য তাদের সমগ্র দীনটিই সন্দেযুক্ত হয়ে পড়েছিল। কোন বিষয় সম্পর্কে তারা নিশ্চয়তার সাথে একথা বলতে পারতো না যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আসল দীনটি এসেছিল এটি তার অংশ এবং এ বিদআত ও ভুল রসম-রেওয়াজ- অনুষ্ঠানগুলো পরবর্তীকালে এর সাথে সংযুক্ত ও বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ বাক্যটির মধ্যে এ অবস্থারই প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।

১১০. অর্থাৎ যদি আল্লাহ চাইতেন তারা এমনটি না করুক তাহলে তারা কখনই এমনটি করতে পারতো না। কিন্তু যেহেতু যে ব্যক্তি যে পথে চলতে চায় তাকে সে পথে চলতে দেয়াটাই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা তাই এসব কিছু হয়েছে। কাজেই যদি তোমাদের বুঝাবার পর এরা না মানে এবং নিজেদের মিথ্যাচার ও মিথ্যা রচনার ওপর তারা জোর দিয়ে যেতে থাকে, তাহলে তারা যা করতে চায় করতে দাও। তাদের পেছনে লেগে থাকার কোন প্রয়োজন নেই।

১১১. আরববাসীদের রীতি ছিল, তারা কোন কোন পশু বা কোন কোন ক্ষেতের উৎপন্ন ফসল এভাবে মানত করতো ঃ এটি অমুক মন্দির, অমুক আস্তানা বা অমুক হযরতের নযরানা। এ নযরানা সবাই খেতে পারতো না। বরং এর সম্পর্কিত একটি বিস্তারিত বিধান

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٩﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

আর তারা বলে, এ পশুদের পেটে যা কিছু আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের স্ত্রীদের জন্য সেগুলো হারাম। কিন্তু যদি তা মৃত হয় তাহলে উভয়েই তা খাবার ব্যাপারে শরীক হতে পারে।[১১৪] তাদের এ মনগড়া কথার প্রতিফল আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যি দেবেন। অবশ্যি তিনি প্রজ্ঞাময় ও সবকিছু জানেন।

নিসন্দেহে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা নিজেদের সন্তানদেরকে নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতাবশত হত্যা করেছে এবং আল্লাহর দেয়া জীবিকাকে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা ধারণাবশত হারাম গণ্য করেছে নিসন্দেহে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা কখনোই সত্য পথ লাভকারীদের অন্তরভুক্ত ছিল না।[১১৫]

তাদের কাছে ছিল। এ বিধান অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের লোকের জন্য বিভিন্ন নযরানা নির্দিষ্ট ছিল। তাদের এ কাজটিকে আল্লাহ কেবল মুশরিকী কাজ বলেই ক্ষান্ত হননি বরং এ ব্যাপারেও তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এটি তাদের একটি মনগড়া বিধান। অর্থাৎ যে আল্লাহর প্রদত্ত রিযিকের মধ্যে এ নযরানাগুলো নির্দিষ্ট করা হয় এবং মানত মানা হয় তিনি এ নযরানা দেবার ও মানত মানার হুকুম দেননি এবং তিনি এগুলো ব্যবহার করার ওপর এ ধরনের কোন বিধি–নিষেধও আরোপ করেননি। এসব কিছুই এ অহংকারী ও বিদ্রোহী বান্দাদের মনগড়া রচনা।

১১২. হাদীস থেকে জানা যায়, আরববাসীরা কিছু কিছু বিশেষ নযরানা ও মানতের পশুর ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা জায়েয মনে করতো না। এ পশুগুলোর পিঠে চড়ে হজ্জ করাও নিষিদ্ধ ছিল। কারণ হজ্জের জন্য লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা বলতে হতো। অনুরূপভাবে এগুলোর পিঠে সওয়ার হবার সময়, এদের দুধ দোয়ার সময়, যবেহ করার সময় অথবা এদের গোশ্‌ত খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম যাতে উচ্চারিত না হয় তার ব্যবস্থা করা হতো।

وَهُوَ الَّذِىٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖؗ وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٤١﴾ وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ؕ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٤٢﴾

১৭ রুকূ'

তিনি আল্লাহই নানা প্রকার লতাগুল্ম[১১৬] ও বাগান সৃষ্টি করেছেন। খেজুর বীথি সৃষ্টি করেছেন। শস্য উৎপাদন করেছেন, তা থেকে নানা প্রকার খাদ্য সংগৃহিত হয়। যাইতুন ও ডালিম বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন, এদের ফলের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকলেও স্বাদ বিভিন্ন। এগুলোর ফল খাও যখন ফলবান হয় এবং এগুলোর ফসল কাটার সময় আল্লাহর হক আদায় করো আর সীমা অতিক্রম করো না। কারণ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। আবার তিনিই গবাদি পশুর মধ্যে এমন পশুও সৃষ্টি করেছেন, যাদের সাহায্যে যাত্রী ও ভারবহনের কাজ নেয়া হয় এবং যাদেরকে খাদ্য ও বিছানার কাজেও ব্যবহার করা হয়।[১১৭] খাও এ জিনিসগুলো থেকে, যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন এবং শয়তানের অনুসরণ করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[১১৮]

১১৩. অর্থাৎ এ নিয়মগুলো আল্লাহ নির্ধারিত নয়। কিন্তু এগুলো আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন এ মনে করেই তারা এগুলো মেনে চলছে। কিন্তু এ ধরনের কথা মনে করার স্বপক্ষে তাদের কাছে আল্লাহর হুকুমের কোন প্রমাণ নেই বরং কেবল বাপ-দাদাদের থেকে এমনটি চলে আসছে, এ সনদই আছে তাদের কাছে।

১১৪. মানত ও নযরানার পশুর ব্যাপারে যে মন গড়া বিধান আরববাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তার একটি ধারা এও ছিল যে, এ পশুগুলোর পেট থেকে যেসব বাচ্চা জন্মায় কেবলমাত্র পুরুষরাই তাদের গোশ্‌ত খেতে পারে। মেয়েদের জন্য তাদের গোশ্‌ত খাওয়া নাজায়েয। তবে যদি সে বাচ্চা মৃত হয় অথবা মরে যায় তাহলে পুরুষরা ও মেয়েরা সবাই তার গোশ্‌ত খেতে পারে।

১১৫. অর্থাৎ যদিও এ রীতি-পদ্ধতিগুলো যারা রচনা করেছিল তারা ছিল তোমাদের বাপ-দাদা, তোমাদের ধর্মীয় বুযর্গ, তোমাদের নেতা ও সরদার কিন্তু এ সত্ত্বেও সত্য যা

তা চিরকালই সত্য। তারা তোমাদের পূর্বপুরুষ এবং তোমাদের ধর্মীয় বুযর্গ ছিল বলেই তাদের উদ্ভাবিত ভুল পদ্ধতিগুলো সঠিক ও পবিত্র হয়ে যাবে না। যেসব জালেম সন্তান হত্যার মতো জঘন্য ও নিষ্ঠুর কাজকে রেওয়াজে পরিণত করেছিল, যারা আল্লাহ প্রদত্ত রিযিককে খামখা আল্লাহর বান্দাদের জন্য হারাম করেছিল এবং যারা আল্লাহর দীনের মধ্যে নিজেদের পক্ষ থেকে নতুন নতুন কথা শামিল করে সেগুলোকে আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিয়েছিল তারা কেমন করে সঠিক পথ পেতে ও সফলকাম হতে পারে? তারা তোমাদের পূর্বপুরুষ ও বুযর্গ হলেও আসলে তারা গোমরাহ ছিল। তাদের অবশ্যি নিজেদের গোমরাহীর অশুভ পরিণতির মুখোমুখি হতেই হবে।

১১৬. আয়াতের মূল শব্দ হচ্ছে جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ । এর অর্থ হচ্ছে দু' ধরনের বাগান। এক ধরনের বাগান হচ্ছে লতানো গাছের, যেগুলো মাচানের ওপর বা কোন কিছুকে আশ্রয় করে বিস্তার লাভ করে। আর দ্বিতীয় ধরনের বাগান হচ্ছে এমন সব গাছের যেগুলো অন্যের সাহায্য ছাড়াই নিজের কাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। আমাদের ভাষায় বাগান শব্দটি কেবলমাত্র এ দ্বিতীয় ধরনের বাগানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাই এখানে কেবল جنت غير معروشت এর অনুবাদ করা হয়েছে বাগান। আর جنت معروشت এর অর্থ করা হয়েছে লতাগুল্ম।

১১৭. মূল আয়াতে فرش শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এক ধরনের পশুকে ফর্‌শ বলা হয়েছে। এ অর্থে যে, তারা আকারে ছোট এবং যমীনের সাথে মিশে চলাফেরা করে। অথবা তাদেরকে এ জন্য ফর্‌শ বলা হয়েছে যে, যবেহ করার সময় তাদেরকে যমীনের ওপর শোয়ানো হয়। অথবা তাদের চামড়া ও লোম থেকে ফরশ্‌ বা বিছানা বানানো হয় তাই তাদেরকে ফর্‌শ বলা হয়েছে।

১১৮. বক্তব্য বিষয়টির ধারাবাহিক বর্ণনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে জানা যায়, এখানে মহান আল্লাহ তিনটি কথা হৃদয়ংগম করাতে চান। এক, তোমরা এই যে বাগান, ক্ষেত–খামার ও গবাদি পশু লাভ করেছো, এগুলো সবই আল্লাহর দান। এ দানে অন্য কারোর কোন অংশ নেই। তাই এ দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপারেও কারোর কোন অংশ থাকতে পারে না। দুই, এগুলো যেহেতু আল্লাহর দান তাই এগুলোর ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করতে হবে। এগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিজের পক্ষ থেকে কোন সীমা নির্ধারণ করে দেবার অধিকার কারোর নেই। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নির্ধারিত রীতি ও নিয়মের অনুসরণ করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর সামনে অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে নযরানা পেশ করাই সীমা অতিক্রম করার নামান্তর এবং এটিই শয়তানের অনুসৃতি। তিন, এসব জিনিস আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মানুষের পানাহার ও ব্যবহার করার জন্য। এগুলোকে অযথা নিজের জন্য হারাম করে নেবার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি। নিজেদের আন্দাজ–অনুমান ও কুসংস্কারের ভিত্তিতে লোকেরা আল্লাহর দেয়া রিযিক এবং তাঁর প্রদত্ত বিভিন্ন জিনিসের ব্যবহারের ওপর যেসব বিধি–নিষেধ আরোপ করেছে সেগুলো সবই আল্লাহর উদ্দেশ্য বিরোধী।

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ
ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ
نَبِّـُٔوْنِىْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٤٣﴾ وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ
الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ
عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ
فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٤﴾

এ আটটি নর ও মাদী, দু'টি মেষ শ্রেণীর ও দুটি ছাগল শ্রেণীর। হে মুহাম্মাদ! এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আল্লাহ এদের নর দু'টি হারাম করেছন, না মাদী দু'টি অথবা মেষ ও ছাগলের পেটে যে বাচ্চা আছে সেগুলো? যথার্থ জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাকে জানাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।[১১৯] আর এভাবে দু'টি উট শ্রেণীর ও দুটি গাভী শ্রেণীর মধ্য থেকে। জিজ্ঞেস করো, আল্লাহ এদের নর দু'টি হারাম করেছেন, না মাদী দু'টি, না সেই বাচ্চা যা উটনী ও গাভীর পেটে রয়েছে?[১২০] তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ তোমাদেরকে এদের হারাম হবার হুকুম দিয়েছিলেন? কাজেই তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে যে আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা বলে? তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সঠিক জ্ঞান ছাড়াই মানুষকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করা। নিসন্দেহে আল্লাহ এহেন জালেমদের সত্য–সঠিক পথ দেখাননা।

১১৯. অর্থাৎ আন্দাজ, অনুমান, ধারণা বা পৈত্রিক ঐতিহ্য ও সংস্কার পেশ করো না। বরং যথার্থ ও সুনিশ্চিত তথ্য ও জ্ঞান পেশ করো, যদি তা তোমাদের কাছে থাকে।

১২০. তাদের নিজেদের ধারণা, অনুমান ও কুসংস্কার যাতে তাদের নিজেদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে সে উদ্দেশ্যেই এ প্রশ্নগুলো এমন বিস্তারিতভাবে তাদের কাছে পেশ করা হয়েছে। একই শ্রেণীর পশুর নর হালাল ও মাদী হারাম অথবা মাদী হালাল ও নর হারাম বা পশুটি হালাল কিন্তু তার গর্ভস্থিত বাচ্চাটি হারাম—এগুলো এমন সুস্পষ্ট অযৌক্তিক কথা যে, কোন সুস্থ বিবেক একথা মেনে নিতে অস্বীকার করবে। আল্লাহ কখনো এ ধরনের অর্থহীন বাজে হুকুম দিতে পারেন তা কোন বুদ্ধিমান মানুষ কল্পনাও

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ
يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا
اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿١٤٥﴾ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ
وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ
اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۗ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿١٤٦﴾

১৮ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলে দাও, যে অহী আমার কাছে এসেছে তার মধ্যে তো আমি এমন কিছু পাই না যা খাওয়া কারো ওপর হারাম হতে পারে, তবে মরা, বহমান রক্ত বা শুয়োরের গোশ্‌ত ছাড়া। কারণ তা নাপাক। অথবা যদি অবৈধ হয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে যবেহ করার কারণে।[১২১] তবে অক্ষম অবস্থায় যে ব্যক্তি (তার মধ্য থেকে কোন জিনিস খেয়ে নেবে) নাফরমানীর ইচ্ছা না করে এবং প্রয়োজনের সীমা না পেরিয়ে, সে ক্ষেত্রে অবশ্যি তোমার রব ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। আর যারা ইহুদীবাদ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য নখরধারী প্রাণী হারাম করেছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও, তবে যা তাদের পিঠ, অন্ত্র বা হাড়ের সাথে লেগে থাকে তা ছাড়া। তাদের সীমালংঘনের দরুন তাদেরকে এ শাস্তিটি দিয়েছিলাম।[১২২] আর এই যা কিছু আমি বলছি সবই সত্য।

করতে পারে না। তাছাড়া কুরআন যে পদ্ধতিতে আরববাসীদেরকে তাদের এ সমস্ত ধারণা–কল্পনা ও কুসংস্কারের অযৌক্তিকতা বুঝাবার চেষ্টা করেছে ঠিক সে একই পদ্ধতিতে দুনিয়ার যেসব জাতির মধ্যে পানাহার দ্রব্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে হারাম–হালালের অযৌক্তিক বিধি–নিষেধ এবং অস্পৃশ্যতাবোধ ও ছোঁয়া–ছুঁয়ির নিয়ম প্রচলিত রয়েছে, তাদের সেই সমস্ত কুসংস্কার ও ধারণা–কল্পনার অযৌক্তিকতা সম্পর্কেও তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া যেতে পারে।

১২১. এ বিষয়টি সূরা আল বাকারার ১৭৩ আয়াতে এবং সূরা আল মায়েদাহর ৩ আয়াতে আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে সূরা আন নাহ্‌লের ১১৫ আয়াতেও এ আলোচনা আসবে।

সূরা আল বাকারার আয়াত এবং এ আয়াতটির মধ্যে বাহ্যত কেবলমাত্র এতটুকু বিরোধ দেখা যায় যে, সেখানে শুধু "রক্ত" বলা হয়েছে আর এখানে বলা হয়েছে "বহমান রক্ত"। অর্থাৎ কোন প্রাণীকে জখম বা জবাই করে যে রক্ত বের করা হয়। কিন্তু এটা আসলে কোন বিরোধ নয় বরং ঐ নির্দেশটির ব্যাখ্যা। অনুরূপভাবে সূরা আল মায়েদাহর আয়াতে এ চারটি জিনিস ছাড়াও আরো কয়েকটি জিনিসের হারাম হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ এমনসব প্রাণীকেও সেখানে হারাম গণ্য করা হয়েছে যারা কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে, আঘাত পেয়ে, ওপর থেকে পড়ে অথবা ধাক্কা খেয়ে মরে গেছে। অথবা কোন হিংস্র প্রাণী যাকে চিরে ফেড়ে ফেলেছে। কিন্তু আসলে এটাও কোন বিরোধ নয়। বরং এটাও একটা ব্যাখ্যা। এ থেকে জানা যায়, এভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাণীরাও 'মরা' বলে গণ্য হবে।

মুসলিম ফকীহগণের একটি দলের মতে আহারযোগ্য প্রাণীদের এ চারটি অবস্থায়ই মাত্র হারাম। এ ছাড়া আর সব ধরনের প্রাণী খাওয়া জায়েয। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত আয়েশা (রা)ও এমত পোষণ করতেন। কিন্তু একাধিক হাদীস থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন জিনিস খেতে মানা করেছেন অথবা সেগুলোর প্রতি নিজের ঘৃণা ও অপছন্দের ভাব প্রকাশ করেছেন। যেমন গৃহপালিত গাধা, নখরযুক্ত হিংস্র পশু ও পাঞ্জাধারী পাখি। এ কারণে অধিকাংশ ফকীহ হারামকে এ চারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁরা এর সীমারেখা আরো বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু এর পরও আবার বিভিন্ন জিনিসের হারাম ও হালাল হওয়ার ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে যেমন গৃহপালিত গাধা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈ হারাম গণ্য করেন। কিন্তু অন্যান্য কয়েকজন ফকীহ বলেন, গৃহপালিত গাধা হারাম নয় বরং কোন বিশেষ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সময় এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। হানাফীদের মতে হিংস্র পশু, শিকারী পাখি ও মৃত ভক্ষণকারী প্রাণী একেবারেই হারাম। কিন্তু ইমাম মালেক ও ইমাম আওযাঈর মতে শিকারী পাখি হালাল। ইমাম লাইসের মতে বিড়াল হালাল। ইমাম শাফেঈর মতে একমাত্র মানুষের ওপর আক্রমণকারী হিংস্র পশু যেমন বাঘ, সিংহ, নেকড়ে ইত্যাদি হারাম। ইকরামার মতে কাক ও চিল উভয়ই হালাল। অনুরূপভাবে হানাফীরা সব রকমের পোকামাকড় হারাম গণ্য করে। কিন্তু ইবনে আবী লাইলা, ইমাম মালেক ও আওযাঈর মতে সাপ হালাল।

এসব বিভিন্ন বক্তব্য ও এর পক্ষের বিপক্ষের যুক্তি প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কারভাবে একথা জানা যায় যে, আসলে কুরআনে যে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াতে সে চারটিই চূড়ান্ত ও অকাট্যভাবে হারাম। এ চারটি জিনিস যেখানে নেই সেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের মাকরূহ বা অপছন্দের ভাব রয়েছে। যেগুলোর মাকরূহ হবার বিষয়টি সহী হাদীসের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত সেগুলো হারাম হবার বেশী নিকটবর্তী। আর যেগুলোর ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে তাদের হারাম হবার ব্যাপারটি সন্দেহযুক্ত। তবে রুচিগতভাবে ও স্বভাবগতভাবে কেউ কেউ কোন কোন জিনিস খাওয়া পছন্দ করে না অথবা শ্রেণীগতভাবে কোন কোন শ্রেণীর মানুষ কোন কোন জিনিস অপছন্দ করে বা জাতিগতভাবে কোন কোন জাতি কোন কোন জিনিসকে ঘৃণা

করে,—এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর শরীয়াত কাউকে বাধ্য করে না যে, যে জিনিসটি হারাম করা হয়নি প্রয়োজন না হলেও অযথা তা তাকে খেতেই হবে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি নিজের অপছন্দকে আইনে পরিণত করবে এবং সে নিজে যা পছন্দ করে না অন্যেরা তা ব্যবহার করছে বলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবে, এ ধরনের কোন অধিকারও শরীয়াত কাউকে দেয়নি।

১২২. এ বিষয়টি কুরআন মজীদের তিনটি স্থানে বিবৃত হয়েছে। সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে ঃ "এ সমস্ত খাদ্যবস্তু (শরীয়াতে মুহাম্মাদীয়ায় যা হালাল হিসেবে গণ্য) বনী ইসরাঈলদের জন্যও হালাল ছিল। তবে কিছু জিনিস এমন ছিল যেগুলোকে তাওরাত নাযিলের পূর্বে ইসরাঈলীরা নিজেরাই নিজেদের ওপর হারাম করে নিয়েছিল। ওদেরকে বলো, তাওরাত আনো এবং তার কোন উদ্ধৃতি পেশ করো, যদি তোমরা (নিজেদের আপত্তির ব্যাপারে) সত্যবাদী হয়ে থাকো।" (৯৩ আয়াত) সূরা আন নিসায় বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈলদের অপরাধের কারণে "আমি এমন বহু পাক–পবিত্র বস্তু তাদের ওপর হারমা করে দিয়েছি, যা পূর্বে তাদের জন্য হালাল ছিল।" (১৬০ আয়াত) আর এখানে বলা হয়েছে ঃ এদের অবাধ্যতার কারণে আমি সমস্ত নখরধারী প্রাণী এদের জন্য হারাম করে দিয়েছি এবং ছাগল ও গরুর চর্বিও এদের জন্য হারাম গণ্য করেছি। এ তিনটি আয়াত একত্র করলে জানা যায়, শরীয়াতে মুহাম্মাদী ও ইহুদী ফিকাহর মধ্যে আহারযোগ্য প্রাণীদের হালাল ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে দুটি কারণে পার্থক্য দেখা যায়।

এক ঃ তাওরাত নাযিল হবার শত শত বছর আগে ইয়াকুব (ইসরাঈল) আলাইহিস সালাম কোন কোন জিনিসের ব্যবহার ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর পরে তাঁর সন্তানরাও সেগুলো ত্যাগ করেছিল। এমনকি ইহুদী ফকীহগণ এগুলোকে রীতিমত হারাম মনে করতে থাকে এবং এগুলোর হারাম হওয়ার বিষয়টি তাওরাতে লিখে নেয়। উট, খরগোশ ও শাফনও এ হারামের তালিকার অন্তরভুক্ত ছিল। বর্তমান বাইবেলে আমরা তাওরাতের যে অংশটুকু পাই তাতে এ তিনটিরই হারাম হবার বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। (লেবীয় পুস্তক ১১ঃ ৪–৬ এবং দ্বিতীয় বিবরণ ১৪ঃ ৭) কিন্তু কুরআন মজীদে ইহুদীদের যে এ বলে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল ঃ আনো তাওরাত এবং দেখাও কোথায় এ জিনিসগুলো হারাম বলে লেখা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, তাওরাতে এ বিধানগুলো বৃদ্ধি করা হয়েছে এ ঘটনার পর। কারণ তখন যদি তাওরাতে এ বিধানগুলো থাকতো, তাহলে বনী ইসরাঈল সংগে সংগেই তাওরাত এনে তা দেখিয়ে দিতো।

দুই ঃ দ্বিতীয় পার্থক্যটি সৃষ্টি হবার কারণ হচ্ছে এই যে, ইহুদীরা যখন আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়াতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো এবং নিজেদের আইন নিজেরাই প্রণয়ন করতে শুরু করলো তখন নিজেদের চুলচেরা আইনগত বিশ্লেষণ ও বাড়াবাড়ির মাধ্যমে তারা অনেক পাক–পবিত্র জিনিসকে নিজেরাই হারাম করে নিয়েছিল এবং এর শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তাদেরকে এ বিভ্রান্তির মধ্যে অবস্থান করতে দিয়েছিলেন। সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে নখরধারী প্রাণী। অর্থাৎ উটপাখি, বক, হাঁস ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, গরু ও ছাগলের চর্বি। এ দু' ধরনের হারামকে বাইবেলে তাওরাতের বিধানের অন্তরভুক্ত করা হয়েছে। (লেবীয় পুস্তক ১১ঃ১৬–১৮, দ্বিতীয় বিবরণ ১৪ঃ১৪–১৫–১৬, লেবীয় পুস্তক ৩ঃ১৭ এবং ৭ঃ২২–২৩) কিন্তু সূরা নিসা থেকে জানা যায়, এ জিনিসগুলো

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ
عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ
مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِ
جُوهُ لَنَا ۖ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ
فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾

এখন তারা যদি তোমার কথা না মানে তাহলে তাদেরকে বলে দাও, তোমাদের রবের অনুগ্রহ সর্বব্যাপী এবং অপরাধীদের ওপর থেকে তাঁর আযাব রদ করা যেতে পারে না।[১২৩]

এ মুশরিকরা (তোমাদের এসব কথার জবাবে) নিশ্চয়ই বলবে, "যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে আমরা শিরকও করতাম না, আমাদের বাপ-দাদারাও শিরক করতো না। আর আমরা কোন জিনিসকে হারামও গণ্য করতাম না।"[১২৪] *এ ধরনের উদ্ভট কথা তৈরী করে করে এদের পূর্ববর্তী লোকেরাও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, এভাবে তারা অবশেষে আমার আযাবের স্বাদ গ্রহণ করেছে। এদেরকে বলে দাও, "তোমাদের কাছে কোন জ্ঞান আছে কি? থাকলে আমার কাছে পেশ করো। তোমরা তো নিছক অনুমানের ওপর চলছো এবং শুধুমাত্র ধারণা ও আন্দাজ করা ছাড়া তোমাদের কাছে আর কিছুই নেই।" তাহলে বলো, (তোমাদের এ যুক্তির মোকাবিলায়) প্রকৃত সত্যে উপনীত অকাট্য যুক্তি তো আল্লাহর কাছে আছে। অবশ্যি যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তোমাদের সবাইকে সঠিক পথ দেখাতেন।*[১২৫]

তাওরাতে হারাম ছিল না। বরং হযরত ইসা আলাইহিস সালামের পর এগুলো হারাম হয়েছে। ইতিহাসও সাক্ষ দেয়, বর্তমান ইহুদী শরীয়াত লিপিবদ্ধ করার কাজ দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে রাব্বি ইয়াহুদার হাতে সম্পন্ন হয়।

এখন বাকি থাকে এ প্রশ্নটি, তাহলে মহান আল্লাহ এ জিনিসগুলো সম্পর্কে এখানে এবং সূরা নিসায় (আমি হারাম করেছি) শব্দ ব্যবহার করলেন কেন? এর জওয়াব হচ্ছে, আল্লাহ কেবলমাত্র নবী ও কিতাবের মাধ্যমে কোন জিনিস হারাম করেন না। বরং তিনি

কখনো তাঁর বিদ্রোহী বান্দাদের ওপর বানোয়াট বিধান রচয়িতা ও আইন প্রণেতাদের চাপিয়ে দেন এবং তারা পাক-পবিত্র জিনিসগুলো তাদের জন্য হারাম করে দেয়। প্রথম ধরনের হারামটি আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত হিসেবে প্রবর্তিত হয় এবং দ্বিতীয় ধরনের হারামটি প্রবর্তিত হয় তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি ও লানত হিসেবে।

১২৩. অর্থাৎ এখনো যদি তোমরা নিজেদের নাফরমানীর নীতি ও কার্যক্রম পরিহার করে বন্দেগীর সঠিক দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করো, তাহলে তোমাদের রবের অনুগ্রহের ক্ষেত্র নিজেদের জন্য অনেক বেশী বিস্তৃত পাবে। কিন্তু যদি তোমরা নিজেদের এই অপরাধ বৃত্তি ও বিদ্রোহী মানসিকতার ওপর অবিচল থাকো তাহলে ভালভাবে জেনে রাখো, তাঁর গযব থেকে তোমাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না।

১২৪. অর্থাৎ অপরাধী ও অসৎলোকেরা নিজেদের অপরাধ ও অসৎকাজের স্বপক্ষে হামেশা যে ধরনের ওজর পেশ করে এসেছে তারাও সে একই ওযর পেশ করতে থাকবে। তারা বলবে, আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ চান আমরা শিরক করি এবং যে জিনিসগুলোকে আমরা হারাম করে নিয়েছি সেগুলো আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাক। নয়তো আল্লাহ যদি চাইতেন আমরা এমনটি না করি তাহলে এ ধরনের কাজ করা আমাদের পক্ষে কেমন করে সম্ভবপর হতো? যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা এসব কিছু করছি তাই আমরা ঠিকই করছি। কাজেই এ ব্যাপারে কোন দোষ হয়ে থাকলে সে জন্য আমরা নই, আল্লাহ দায়ী। আর আমরা যা কিছু করছি এমনটি করতে আমরা বাধ্য। কারণ এ ছাড়া অন্য কিছু করা আমাদের সাধ্যের বাইরে।

১২৫. এটি তাদের ওজুহাতের পূর্ণাংগ জওয়াব। এ জওয়াবটি বুঝার জন্য এর যথার্থ বিশ্লেষণ করতে হবে ঃ

এখানে প্রথম কথা বলা হয়েছে, নিজেদের অন্যায় কাজ ও গোমরাহীর জন্য আল্লাহর ইচ্ছাকে ওযর হিসেবে পেশ করা এবং এর বাহানা বানিয়ে সঠিক হেদায়াত ও পথনির্দেশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানো অপরাধীদের প্রাচীন রীতি হিসেবে চলে আসছে। এর পরিণামে দেখা গেছে অবশেষে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সত্যের বিরুদ্ধে চলার অশুভ পরিণাম তারা স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, তোমরা যে ওযরটি পেশ করছো তার পেছনে প্রকৃত জ্ঞানগত ও তথ্যগত কোন ভিত্তি নেই। বরং আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে তোমরা এটি পেশ করছো। তোমরা নিছক কোথাও আল্লাহর ইচ্ছার কথা শুনতে পেয়েছো তারপর তার ওপর অনুমানের একটি বিরাট ইমারত দাঁড় করিয়ে দিয়েছো। মানুষের ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা কি, একথা বুঝার চেষ্টাই তোমরা করোনি। তোমরা আল্লাহর ইচ্ছা বলতে মনে করছো, চোর যদি আল্লাহর ইচ্ছার আওতাধীনে চুরি করে তাহলে সে অপরাধী নয়। কারণ সে তো আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে চুরি করেছে। অথচ মানুষের ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা হচ্ছে এই যে, সে কৃতজ্ঞতা ও কুফরী, হেদায়াত ও গোমরাহী এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতার মধ্য থেকে যে পথটিই নিজের জন্য নির্বাচিত করবে, আল্লাহ তার জন্য সে পথটিই উন্মুক্ত করে দেবেন। তারপর মানুষ ন্যায়-অন্যায় ও ভুল-নির্ভুল যে কাজটিই করতে চাইবে, আল্লাহ নিজের বিশ্বব্যাপী কার্যক্রমের দৃষ্টিতে যতটুকু সংগত মনে করবেন তাকে সে কাজটি করার অনুমতি ও সুযোগ দান করবেন। কাজেই তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা আল্লাহর ইচ্ছার আওতাধীনে যদি শিরক ও পবিত্র জিনিসগুলোকে হারাম গণ্য

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٠﴾

এদেরকে বলে দাও, "আনো তোমাদের সাক্ষী, যে এ সাক্ষ দেবে যে, আল্লাহই এ জিনিসগুলো হারাম করেছেন।" তারপর যদি তারা সাক্ষ দিয়ে দেয় তাহলে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ দিয়ো না।[১২৬] *এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে, যারা আখেরাত অস্বীকারকারী এবং অন্যদেরকে নিজেদের রবের সমকক্ষ দাঁড় করায় কখ্খনো তাদের খেয়াল খুশী অনুযায়ী চলো না।*

করার সুযোগ লাভ করে থাকো তাহলে এর অর্থ কখনোই এ নয় যে, তোমরা নিজেদের এসব কাজের জন্য দায়ী নও এবং এ জন্য তোমাদের জওয়াবদিহি করতে হবে না। তোমরা নিজেরাই নিজেদের ভুল পথ নির্বাচন, ভুল সংকল্প গ্রহণ ও ভুল প্রচেষ্টার জন্য দায়ী।

সবশেষে একটি বাক্যের মধ্যে আসল কথাটি বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ বলা হয়েছে ঃ

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ

নিজেদের ওযর পেশ করতে গিয়ে তোমরা এ মর্মে যে যুক্তিটির অবতারণা করেছো যে, "আল্লাহ চাইলে আমরা শির্ক করতাম না" এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ কথাটি ব্যক্ত হয়নি। সম্পূর্ণ কথাটি বলতে হলে এভাবে বলো ঃ "আল্লাহ চাইলে তোমাদের সবাইকে হেদায়াত দান করতেন।" অন্য কথায় তোমরা নিজেরা নিজেদের নির্বাচনের মাধ্যমে সঠিক পথ গ্রহণ করতে প্রস্তুত নও। বরং তোমরা চাও, আল্লাহ যেভাবে ফেরেশতাদেরকে জন্মগতভাবে সত্যানুসারী বানিয়েছেন সেভাবে তোমাদেরকেও বানাতেন। মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ এ ইচ্ছা করলে অবশ্যি করতে পারতেন। কিন্তু এটি তাঁর ইচ্ছা নয়। কাজেই নিজেদের জন্য তোমরা নিজেরাই যে গোমরাহীটি পছন্দ করে নিয়েছো আল্লাহ তার মধ্যেই তোমাদের ফেলে রাখবেন।

১২৬. অর্থাৎ যদি তারা সাক্ষ দানের দায়িত্ব অনুধাবন করে এবং যে বিষয়ের জ্ঞান মানুষের আছে সে বিষয়ের সাক্ষই তার দেয়া উচিত, এ সম্পর্কে অবহিত থাকে, তাহলে তাদের সমাজে পানাহারের ওপর বিধি–নিষেধের যে মনগড়া নিয়ম–রীতি প্রচলিত রয়েছে, অমুক জিনিসটি অমুক ব্যক্তি খেতে পারবে না এবং অমুক জিনিসটি অমুক ব্যক্তি স্পর্শ করতে পারবে না, এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা যে আল্লাহ কর্তৃক আরোপিত হয়েছে, সেরূপ সাক্ষ দেবার সাহসই কখনো তারা করবে না। কিন্তু যদি তারা সাক্ষ দানের দায়িত্ব অনুধাবন না করেই আল্লাহর নামে মিথ্যা সাক্ষ দেবার মতো নির্লজ্জতার পরিচয় দিতে

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٥١﴾

১৯ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, এসো আমি তোমাদের শুনাই তোমাদের রব তোমাদের ওপর কি বিধি–নিষেধ আরোপ করেছেন।[১২৭]

(১) তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না[১২৮]

(২) পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।[১২৯]

(৩) দারিদ্রের ভয়ে নিজের সন্তানদেরকে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে জীবিকা দিচ্ছি এবং তাদেরকেও দেবো।

(৪) প্রকাশ্যে বা গোপনে অশ্লীল বিষয়ের ধারে কাছেও যাবে না।[১৩০]

(৫) আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন ন্যায়সংগতভাবে ছাড়া তাকে ধ্বংস করো না।[১৩১]

তিনি তোমাদের এ বিষয়গুলোর নির্দেশ দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা ভেবে–চিন্তে কাজ করবে।

ইতস্তত না করে, তাহলে তাদের এ মিথ্যাচারে তুমি তাদের সহযোগী হয়ো না। কারণ তাদের কাছ থেকে এ সাক্ষ এ জন্য চাওয়া হচ্ছে না যে, তারা যদি এ সাক্ষ দিয়ে দেয়, তাহলে তুমি তাদের কথা মেনে নেবে। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের মধ্য থেকে যাদের মধ্যে কিছুমাত্র সত্যনিষ্ঠা আছে তাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হবে, সত্যই কি এ নিয়ম–কানুন ও বিধি–নিষেধগুলো আল্লাহ নির্ধারিত কিনা এবং তোমরা কি যথার্থ ঈমানদারীর সাথে এর সত্যতার সাক্ষ দিতে পারো? তখন তারা নিজেদের এ নিয়ম–রীতিগুলোর স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করবে এবং যখন এগুলোর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হবার কোন প্রমাণই পাবে না তখন তারা এ অর্থহীন রীতিনীতি ও নিয়ম–কানুনগুলোর আনুগত্য পরিহার করবে।

১২৭. অর্থাৎ তোমরা যেসব বিধি–নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আছো সেগুলো তোমাদের রবের পক্ষ থেকে আরোপিত বিধি–নিষেধ নয়। বরং মানুষের জীবনকে সুসংগঠিত ও সুসংবদ্ধ করার জন্য আল্লাহ যেসব বিধি–নিষেধ আরোপ করেছেন এবং যেগুলো সর্বকালে ও সর্বদেশে আল্লাহর দেয়া শরীয়াতের মৌল বিষয় হিসেবে পরিচিত হয়ে এসেছে সেগুলোই হচ্ছে আসল বিধি–নিষেধ। (তুলনামূলক আলোচনার জন্য বাইবেলের যাত্রা পুস্তক ২০ অধ্যায় দেখুন)।

১২৮. অর্থাৎ আল্লাহর সত্তায়, তাঁর গুণাবলীতে, তাঁর ক্ষমতা–ইখতিয়ারে বা তাঁর অধিকারে কোন ক্ষেত্রে কাউকে শরীক করো না।

আল্লাহর সত্তায় শরীক করার অর্থ হচ্ছে, ইলাহী সত্তার মৌল উপাদানে কাউকে অংশীদার করা। যেমন খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদের আকীদা, আরব মুশরিকদের ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা গণ্য করা এবং অন্যান্য মুশরিকদের নিজেদের দেবদেবীদেরকে এবং নিজেদের রাজ পরিবারগুলোকে আল্লাহর বংশধর বা দেবজ ব্যক্তিবর্গ হিসেবে গণ্য করা—এসবগুলোই আল্লাহর সত্তায় শরীক করার অন্তরভুক্ত।

আল্লাহর গুণাবলীতে শরীক করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর গুণাবলী আল্লাহর জন্য যে অবস্থায় থাকে ঠিক তেমনি অবস্থায় সেগুলোকে বা তার কোনটিকে অন্য কারোর জন্য নির্ধারিত করা। যেমন কারোর সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করা যে, সমস্ত অদৃশ্য সত্য তার কাছে দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট। অথবা সে সবকিছু দেখে ও সবকিছু শোনে। অথবা সে সবরকমের দোষ–ত্রুটি ও দুর্বলতা মুক্ত একটি পবিত্র সত্তা।

ক্ষমতা–ইখতিয়ারের ক্ষেত্রে শিরক করার অর্থ হচ্ছে, সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন ইলাহ হবার কারণে যে সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত সেগুলোকে বা সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটিকে আল্লাহ ছাড়া আর কারোর জন্য স্বীকার করে নেয়া। যেমন অতিপ্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কাউকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করা, কারোর অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণ করা, কাউকে সাহায্য করা, কারোর হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, কারোর প্রার্থনা শোনা, ভাগ্য ভাঙ্গাগড়া করা। এ ছাড়া হারাম–হালাল ও জায়েয–নাজায়েযের সীমানা নির্ধারণ করা এবং মানব জীবনের জন্য আইন–বিধান রচনা করা। এসবই আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতা ও ইখতিয়ার। এর মধ্য থেকে কোন একটিকেও আল্লাহ ছাড়া আর কারোর জন্য স্বীকার করা শিরক।

অধিকারের ক্ষেত্রে শিরক করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ হবার কারণে বান্দাদের ওপর আল্লাহর বিশেষ অধিকার রয়েছে। সে অধিকারসমূহ বা তার মধ্য থেকে কোন একটি অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারোর জন্য মেনে নেয়া। যেমন রুকূ ও সিজদা করা, বুকে হাত বেঁধে বা হাত জোড় করে দাঁড়ানো, সালামী দেয়া ও আস্তানা চুম্বন করা, নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ নযরানা ও কুরবানী পেশ করা, প্রয়োজন পূরণ ও সংকট দূর করার জন্য মানত করা, বিপদ–আপদে সাহায্যের জন্য আহবান করা এবং এভাবে পূজা–অর্চনা, সম্মান ও মর্যাদা দান করার জন্য অন্যান্য যাবতীয় পদ্ধতি একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত অধিকার। অনুরূপভাবে কাউকে এমন প্রিয় জ্ঞান করা যে, তার প্রতি ভালবাসার মোকাবিলায় অন্য সমস্ত ভালবাসাকে উৎসর্গ করে দেয়া হয় এবং কাউকে এমন ভয় করা যে, গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় তার

অসন্তোষকে ভীতির নজরে দেখা—এসবও একমাত্র আল্লাহর অধিকার। আল্লাহর শর্তহীন আনুগত্য করা, তাঁর নির্দেশকে ভুল ও নির্ভুলের মানদণ্ড মনে করা এবং এমন কোন আনুগত্যের শৃংখল নিজের গলায় পরিধান না করা যা আল্লাহর আনুগত্যের শৃংখলমুক্ত একটি স্বতন্ত্র আনুগত্য এবং যার নির্দেশের পেছনে আল্লাহর নির্দেশের সনদ নেই—এসবও আল্লাহর অধিকার। এ অধিকারগুলোর মধ্য থেকে যে কোন একটি অধিকারও কাউকে দেয়া হলে, তাকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট নামগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি নাম না দিলেও তাকে আল্লাহর সাথে শরীক করা হবে।

১২৯. আদব, সম্মান, আনুগত্য, সন্তুষ্টি বিধান, সেবা সবকিছুই সদ্ব্যবহারের অন্তরভূক্ত। কুরআনের সর্বত্র পিতামাতার এ অধিকারকে তাওহীদের বিধানের পরপরই বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর পর বান্দার অধিকারের দিক দিয়ে মানুষের ওপর তার পিতামাতার অধিকার সর্বাগ্রগণ্য।

১৩০. এখানে আসল শব্দ হচ্ছে فواحش । এ শব্দটি এমন সব কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যেগুলো সুস্পষ্ট খারাপ কাজ হিসেবে পরিচিত। কুরআনে ব্যভিচার, সমকাম (পুরুষ কামিতা), উলংগতা, মিথ্যা দোষারোপ এবং পিতার বিবাহিত স্ত্রীকে বিয়ে করাকে ফাহেশ কাজের অন্তরভুক্ত করা হয়েছে। হাদীসে চুরি ও মদপানের সাথে সাথে ভিক্ষাবৃত্তিকেও ফাহেশ ও অশ্লীল কাজের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য সমস্ত নির্লজ্জতার কাজও ফাহেশের অন্তরভুক্ত। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে, এ ধরনের কাজ প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনভাবেই করা যাবে না।

১৩১. অর্থাৎ মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের প্রাণকে হারাম ও মর্যাদা সম্পন্ন ঘোষণা করা হয়েছে। তাকে ন্যায় ও সত্যের খাতিরে ছাড়া কোনক্রমেই ধ্বংস করা যাবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ "ন্যায়সংগতভাবে" বা "ন্যায় ও সত্যের খাতিরে" এর অর্থ কি? কুরআনে এর তিনটি পর্যায় বর্ণিত হয়েছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর আরো দু'টি পর্যায় বৃদ্ধি করেছেন। কুরআন বর্ণিত তিনটি পর্যায় হচ্ছে ঃ

(১) যখন এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে জেনে বুঝে হত্যা করার অপরাধ করে এবং হত্যাকারীর ওপর কিসাস বা রক্তপণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

(২) যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর সত্য দীন প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এবং তার সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

(৩) যখন কোন ব্যক্তি দারুল ইসলামের সীমানার মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে অথবা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার পতন ঘটাবার চেষ্টা করে।

হাদীসে বর্ণিত অন্য পর্যায় দু'টি হচ্ছে ঃ

(৪) কোন ব্যক্তি বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যিনা করলে।

(৫) কোন ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে গেলে এবং মুসলিম সমাজ ত্যাগ করলে। এ পাঁচটি পর্যায় ও অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় একজন মানুষ আর একজন মানুষকে হত্যা করতে পারে না। সে মুমিন, যিম্মী বা সাধারণ কাফের যেই হোক না কেন, কোন ক্ষেত্রেই তার রক্ত হালাল নয়।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ
ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا
فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي
أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ
يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾

(৬) আর তোমরা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত এতীমের সম্পদের ধারে কাছেও যেয়ো না, তবে উত্তম পদ্ধতিতে যেতে পারো।[১৩২]

(৭) ওজন ও পরিমাপে পুরোপুরি ইনসাফ করো, প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর আমি ততটুকু দায়িত্বের বোঝা রাখি যতটুকু তার সামর্থের মধ্যে রয়েছে।[১৩৩]

(৮) যখন কথা বলো, ন্যায্য কথা বলো, চাই তা তোমার আত্মীয়–স্বজনের ব্যাপারই হোক না কেন।

(৯) আল্লাহর অংগীকার পূর্ণ করো।[১৩৪]

এ বিষয়গুলোর নির্দেশ আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা নসীহত গ্রহণ করবে।

(১০) এ ছাড়াও তাঁর নির্দেশ হচ্ছে এই ঃ এটিই আমার সোজা পথ। তোমরা এ পথেই চলো এবং অন্য পথে চলো না। কারণ তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে সরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে।[১৩৫] এ হেদায়াত তোমাদের রব তোমাদেরকে দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা বাঁকা পথ অবলম্বন করা থেকে বাঁচতে পারবে।

তারপর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যা সৎকর্মশীল মানুষের প্রতি নিয়ামতের পূর্ণতা এবং প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় জিনিসের বিশদ বিবরণ, সরাসরি পথ নির্দেশ ও রহমত ছিল, (এবং তা এ জন্য বনী ইসরাঈলকে দেয়া হয়েছিল যে,) সম্ভবত লোকেরা নিজেদের রবের সাথে সাক্ষাতের প্রতি ঈমান আনবে।[১৩৬]

১৩২. অর্থাৎ এমন পদ্ধতিতে, যা হবে সর্বাধিক নিঃস্বার্থপরতা, সদুদ্দেশ্য ও এতীমের প্রতি সদিচ্ছা ও কল্যাণকামিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যার বিরুদ্ধে আল্লাহর অসন্তোষ বা মানুষের আপত্তি উত্থাপন করার কোন অবকাশই না থাকে।

১৩৩. এটি যদিও আল্লাহর শরীয়াতের একটি স্থায়ী ও স্বতন্ত্র নীতি তবুও এটি বর্ণনার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজস্ব পরিসরে ওজন–পরিমাপ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে সততা ও ইনসাফের পরিচয় দেবার চেষ্টা করবে সে নিজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কিছু ভুল–চুক বা অজ্ঞাতসারে কমবেশী হয়ে গেলে সে জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

১৩৪. "আল্লাহর অংগীকার" বলতে এমন অংগীকারও বুঝায় যা মানুষ তার সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন ইলাহর তথা আল্লাহর সাথে করে। আবার এমন অংগীকারও বুঝায় যা আল্লাহর নামে বান্দার সাথে করে। একটি মানব শিশু এ আল্লাহর যমীনে মানব সমাজে চোখ মেলে তাকাবার সাথে সাথেই আল্লাহ ও মানুষ এবং মানুষ ও মানুষের মধ্যে স্বতস্ফূর্তভাবে যে অংগীকারের বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাও এ অংগীকারের অন্তরভুক্ত।

প্রথম অংগীকার ও চুক্তি দু'টি হয় সচেতন ও ইচ্ছাকৃত। অন্যদিকে তৃতীয়টি হয় একটি প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত (Natural Contact) অংগীকার ও চুক্তি। এ তৃতীয় চুক্তিটি সম্পাদনে মানুষের ইচ্ছা ও সংকল্পের কোন হাত না থাকলেও পরিপূর্ণ মর্যাদা সম্পন্ন হবার দিক দিয়ে প্রথম দু'টির তুলনায় এটি কোন অংশে খাটো নয়। আল্লাহ মানুষকে যে অস্তিত্ব দান করেছেন, তাকে যে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি দান করেছেন, তাকে দেহের অভ্যন্তরে যে যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা দান করেছেন, যমীনে তার জন্য সৃষ্ট উপায়–উপকরণ ও জীবিকা ব্যবহারের যে ব্যবস্থা করেছেন এবং প্রাকৃতিক বিধি–ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন যাপনের যে সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয় তা থেকে লাভবান হবার যে সুযোগ তাকে দিয়েছেন–এসবগুলোই স্বতস্ফূর্ত ও স্বাভাবিকভাবে তার ওপর আল্লাহর কিছু অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। অনুরূপভাবে মানব শিশুর একটি মানব জননীর পেটে তার রক্তে প্রতিপালিত হওয়া, একটি পিতার পরিশ্রমলব্ধ কুটীরে জন্মগ্রহণ করা এবং একটি সমাজবদ্ধ অংগনে অসংখ্য সংগঠন সংস্থা থেকে বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য–সহায়তা লাভ করার কারণে মর্যাদা ও গুরুত্বের ক্রমানুসারে তার ওপর বহু ব্যক্তি ও সমাজ সংস্থার অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহর সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে মানুষের কৃত এই অংগীকার অবশ্যি কোন কাগজে লিখিত হয়নি ঠিকই কিন্তু এ অংগীকার ও চুক্তির বাণী মানুষের শিরা উপশিরায় ও তার শরীরের প্রতিটি লোমকূপে মোহরাংকিত হয়ে আছে। মানুষ সচেতনভাবে এ চুক্তিবদ্ধ হয়নি ঠিকই কিন্তু তার সমগ্র সত্তা এ চুক্তি ও অংগীকারের ফসল। এ চুক্তি ও অংগীকারের দিকে সূরা বাকারার ২৭ আয়াতে ইংগিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ফাসেক হচ্ছে তারা যারা "আল্লাহর সাথে অংগীকার করার পর তা ভেঙে ফেলে, আল্লাহ যাকে সংযুক্ত করার হুকুম দিয়েছেন তাকে কেটে ফেলে এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে।" পরবর্তী পর্যায়ে সূরা আ'রাফের ১৭২ আয়াতেও এরি উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, সৃষ্টির আদি পর্বে আল্লাহ আদমের পিঠ থেকে তার সন্তানদের বের করে তাদেরকে এ মর্মে সাক্ষ দিতে বলেছিলেন—আমি কি তোমাদের রব নই? এর জবাবে তারা স্বীকৃতি দিয়ে বলেছিল, হাঁ আমরা এর সাক্ষী।

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٥٥﴾ اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۪ وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿١٥٦﴾ اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿١٥٧﴾

২০ রুকূ'

আর এভাবেই এ কিতাব আমি নাযিল করেছি একটি বরকতপূর্ণ কিতাব হিসেবে। কাজেই তোমরা এর অনুসরণ করো এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করো, হয়তো তোমাদের প্রতি রহম করা হবে। এখন তোমরা আর একথা বলতে পারো না যে, কিতাব তো দেয়া হয়েছিল আমাদের পূর্বের দু'টি দলকে[১৩৭] এবং তারা কি পড়তো পড়াতো তাতো আমরা কিছুই জানি না। আর এখন তোমরা এ ওজুহাতও দিতে পারো না যে, যদি আমাদের ওপর কিতাব নাযিল করা হতো তাহলে আমরা তাদের চাইতে বেশী সত্য পথানুসারী প্রমাণিত হতাম। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ, পথনির্দেশ ও রহমত এসে গেছে। এখন তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে, যে আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে এবং তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়?[১৩৮] যারা আমার আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের এ সত্য বিমুখতার কারণে তাদেরকে আমি নিকৃষ্টতম শাস্তি দেবো।

১৩৫. যে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক অংগীকারের কথা উল্লেখিত হয়েছে তার অনিবার্য দাবী হচ্ছে এই যে, মানুষ তার রবের দেখানো পথে চলবে। কারণ তার রবের নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং আত্মম্ভরিতা, স্বেচ্ছাচার ও অন্যের দাসত্বের পথে পা বাড়ানো মানুষের পক্ষ থেকে সে অংগীকারের প্রাথমিক বিরুদ্ধাচরণ হিসেবে পরিগণিত হবে। এরপর প্রতি পদক্ষেপে তার ধারাগুলো লংঘিত হতে থাকবে। এ ছাড়াও মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ প্রদত্ত পথনির্দেশ গ্রহণ করে তাঁর দেখানো পথে জীবন যাপন করে না ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে এ অত্যন্ত নাজুক, ব্যাপক ও জটিল দায়িত্ব পালন করা কোনক্রমেই সম্ভবপর হয় না। আল্লাহ প্রদত্ত এ পথনির্দেশ গ্রহণ না করার ফলে মানুষকে

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾

লোকেরা কি এখন এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, তাদের সামনে ফেরেশতারা এসে দাঁড়াবে অথবা তোমার রব নিজেই এসে যাবেন বা তোমার রবের কোন কোন সুস্পষ্ট নিশানী প্রকাশিত হবে?[১৩৯] *যে দিন তোমার রবের বিশেষ কোন কোন নিশানী প্রকাশিত হয়ে যাবে তখন এমন কোন ব্যক্তির ঈমান কোন কাজে লাগবে না যে প্রথমে ঈমান আনেনি অথবা যে তার ঈমানের সাহায্যে কোন কল্যাণ অর্জন করতে পারেনি।*[১৪০] *হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলে দাও, তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও অপেক্ষা করছি।*

যারা নিজেদের দীনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে নিসন্দেহে তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।[১৪১] *তাদের ব্যাপারটি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত রয়েছে। তারা কি করেছে, সে কথা তিনিই তাদেরকে জানাবেন।*

দু'টি বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এক, অন্য পথ অবলম্বন করার কারণে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র পথ থেকে মানুষ অনিবার্যভাবে সরে যায়। দুই, এ সঠিক পথ থেকে সরে যাওয়ার সাথে সাথেই অসংখ্য সরু সরু পথ সামনে এসে যায়। এ পথগুলোয় চলতে গিয়ে দিকভ্রান্ত হয়ে সমগ্র মানব সমাজ বিক্ষিপ্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মানব সমাজের এ বিপর্যয় ও বিক্ষিপ্ততা তার উন্নতি ও পূর্ণতা প্রাপ্তির সুখ স্বপ্নকে চিরতরে ধূলিস্মাত করে দেয়। এ দু'টি ক্ষতিকে এখানে নিম্নোক্ত বাক্যের মধ্যে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ "অন্য পথে চলো না, কারণ তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে সরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে।" (সূরা আল মায়েদাহর ৩৫ টীকাটিও দেখুন)।

১৩৬. রবের সাথে সাক্ষাতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ নিজেকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করা এবং দায়িত্বপূর্ণ জীবন যাপন করা। এখানে এ

বক্তব্যের দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, এ কিতাবের জ্ঞানগর্ভ শিক্ষার ফলে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে দায়িত্বের অনুভূতি জেগে উঠবে। দুই, সাধারণ মানুষ এ উন্নত জীবন বিধান অধ্যয়ন করে এবং সৎকর্মশীল লোকদের মধ্যে এ হেদায়াত ও রহমতের প্রভাব লক্ষ করে একথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, আখেরাত অস্বীকৃতির ভিত্তিতে সৃষ্ট দায়িত্বহীন জীবনের মোকাবিলায় আখেরাত স্বীকৃতির ভিত্তিতে পরিচালিত দায়িত্বপূর্ণ জীবন যাপন সব দিক দিয়েই উত্তম। আর এভাবে এ পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন তাকে কুফরী থেকে ঈমানের দিকে টেনে আনবে।

১৩৭. অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে।

১৩৮. আল্লাহর আয়াত বলতে কুরআনের আকারে মানুষের সামনে যে বাণী পেশ করা হচ্ছিল তাও বুঝাবে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিলেন তাদের পাক-পাবিত্র জীবনে যেসব নিশানী সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল সেগুলোও বুঝাবে আবার কুরআন তার দাওয়াতের সমর্থনে বিশ্ব-জাহানের যে নিদর্শনগুলো পেশ করছিল সেগুলোও বুঝাবে।

১৩৯. অর্থাৎ কিয়ামতের নিশানী বা আযাব অথবা এমন কোন নিশানী যা প্রকৃত সত্যের ওপর থেকে পুরোপুরি পর্দা উঠিয়ে নেয় এবং যার আত্মপ্রকাশের ফলে পরীক্ষার আর কোন প্রয়োজন থাকে না।

১৪০. অর্থাৎ এ ধরনের নিশানী দেখে নেবার পর যদি কোন কাফের তার কুফরী থেকে তাওবা করে ঈমানের দিকে চলে আসে তাহলে তার এ ঈমান আনাটা হবে অর্থহীন। অনুরূপভাবে এ অবস্থায় কোন নাফরমান মুমিন যদি তার নাফরমানীর কার্যক্রম পরিহার করে অনুগত মুমিনের জীবন যাপন করতে শুরু করে দেয় তাহলে তাও হবে সমান অর্থহীন। কারণ প্রকৃত সত্য যতক্ষণ পর্দান্তরালে রয়েছে ততক্ষণই থাকছে ঈমান ও আনুগত্যের মূল্য ও মর্যাদা। এখানে অবকাশের সুযোগ অনেক দীর্ঘ ও বিস্তৃত দেখা যাচ্ছে এবং দুনিয়া তার আত্মম্ভরিতা ও প্রবঞ্চনার সমস্ত উপকরণ সহকারে প্রতারণা করার জন্য এগিয়ে আসছে। সে তার প্রতারণা জাল বিস্তার করে ঘোষণা করছে ঃ কিসের আল্লাহ খোদা? কোথায় আখেরাত? এসব মিথ্যা। আসলে দুনিয়ায় যে ক'দিন আছো, খাও দাও, ফূর্তি করো।

১৪১. এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহর সত্যদীনের সকল অনুসারীকে সম্বোধন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বক্তব্যের সার নির্যাস হচ্ছে ঃ এক আল্লাহকে ইলাহ ও রব বলে মেনে নাও। আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা-ইখতিয়ার ও অধিকারে কাউকে শরীক করো না। আল্লাহর সামনে নিজেকে জবাবদিহি করতে হবে মনে করে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনো। আল্লাহ তাঁর রসূলদের ও কিতাবসমূহের মাধ্যমে যে ব্যাপক মূলনীতি ও মৌল বিষয়ের শিক্ষা দিয়েছেন সে অনুযায়ী জীবন যাপন করো। এগুলোই চিরকাল আসল দীন হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে এবং এখনো যথার্থ দীন বলতে এগুলোকেই বুঝায়। জন্মের প্রথম দিন থেকে প্রত্যেক মানুষকে এ দীনই দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন যুগের লোকেরা তাদের নিজস্ব চিন্তা ও মানসিকতার ভ্রান্ত উদ্ভাবনী ক্ষমতার সাহায্যে অথবা নিজেদের প্রবৃত্তি ও লালসার মাত্রাতিরিক্ত প্রভাবে বা

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦٠﴾ قُلْ اِنَّنِيْ هَدٰىنِيْ رَبِّيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٦١﴾ قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٦٣﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে হাযির হবে সৎকাজ নিয়ে তার জন্য রয়েছে দশগুণ প্রতিফল আর যে ব্যক্তি অসৎকাজ নিয়ে আসবে সে ততটুকুই প্রতিফল পাবে যতটুকু অপরাধ সে করেছে এবং কারোর ওপর জুলুম করা হবে না।

হে মুহাম্মাদ! বলো, আমার রব নিশ্চিতভাবেই আমাকে সোজা পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। একদম সঠিক নির্ভুল দীন, যার মধ্যে কোন বক্রতা নেই, ইবরাহীমের পদ্ধতি,[১৪২] *যাকে সে একাগ্রচিত্তে একমুখী হয়ে গ্রহণ করেছিল এবং সে মুশরিকদের অন্তরভুক্ত ছিল না। বলো, আমার নামায, আমার ইবাদাতের সমস্ত অনুষ্ঠান,*[১৪৩] *আমার জীবন ও মৃত্যু সবকিছু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য, যার কোন শরীক নেই। এরি নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে এবং সবার আগে আমিই আনুগত্যের শির নতকারী।*

ভক্তির আতিশয্যে এ আসল দীনকে বিকৃত করে বিভিন্ন প্রকার ধর্মের সৃষ্টি করেছে। এ দীনের মধ্যে তারা নতুন নতুন কথা মিশিয়ে দিয়েছে। নিজেদের কুসংস্কার, কল্পনা, বিলাসিতা, আন্দাজ-অনুমান ও নিজেদের দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার ছাঁচে ফেলে তার আকীদা বিশ্বাসে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে এবং কাটাই ছাঁটাই এর মাধ্যমে তাকে পুরোপুরি বিকৃত করে দিয়েছে। অনেক নতুন বিষয় উদ্ভাবন করে তার বিধানসমূহের সাথে জুড়ে দিয়েছে। মনগড়া আইন রচনা করেছে। আইনের খুটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে অযথা চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছে। ছোটখাটো বিষয়গুলো নিয়ে মতবিরোধ করার ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছে। গুরুত্বপূর্ণকে গুরুত্বহীন ও গুরুত্বহীনকে গুরুত্বপূর্ণ বানিয়ে দিয়েছে। যেসব নবী-রসূল এ দীন প্রচার করেছেন এবং যেসব মহান মনীষী ও বুযর্গ এ দীনের প্রতিষ্ঠায় জীবনপাত করে গেছেন তাদের কারোর কারোর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্যধিক বাড়াবাড়ি করেছে আবার কারোর কারোর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ؕ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۶۴﴾ وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَاۤ اٰتٰىكُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۶۵﴾

বল, আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন রবের সন্ধান করবো অথচ তিনিই সকল কিছুর মালিক?[১৪৪] প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু উপার্জন করে সে জন্য সে নিজে দায়ী, কেউ কারো বোঝা বহন করবে না[১৪৫] তারপর তোমাদের সবাইকে তোমাদের রবের দিকে ফিরে যেতে হবে। সে সময় তোমাদের মতবিরোধের প্রকৃত স্বরূপ তিনি তোমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেবেন। তিনিই তোমাদের করেছেন দুনিয়ার প্রতিনিধি এবং যা কিছু তোমাদের দিয়েছেন তাতে তোমাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কাউকে অন্যের ওপর অধিক উন্নত মর্যাদা দান করেছেন।[১৪৬] নিসন্দেহে তোমার রব শাস্তি দেবার ব্যাপারে অতি তৎপর এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

প্রকাশ ঘটিয়ছে এবং তাদের বিরোধিতা করেছে। এভাবে অসংখ্য ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে চলেছে। এদের প্রত্যেকটি ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব মানব সমাজকে কলহ, বিবাদ ও পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত করেছে। এভাবে মানব সমাজ দ্বন্দ্বমুখর দলে–উপদলে বিভক্ত হয়ে চলেছে। কাজেই বর্তমানে যে ব্যক্তিই আসল দীনের অনুসারী হবে, তার জন্য এসব বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় ও দলাদলি থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া এবং তাদের থেকে নিজেদের পথকে আলাদা করে নেয়াই হবে অপরিহার্য।

১৪২. "ইবরাহীমের পদ্ধতি" বলে এ পথকে চিহ্নিত করার জন্য তার আর একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। একে মূসার পদ্ধতি বা ঈসার পদ্ধতিও বলা যেতো। কিন্তু লোকেরা ইহুদীবাদকে হযরত মূসার এবং খৃষ্টবাদকে হযরত ঈসার আনিত বিধান বলে আখ্যায়িত করে রেখেছে। তাই বলা হয়েছে, "ইবরাহীমের পদ্ধতি"। ইহুদী ও খৃষ্টান উভয় দলই হযরত ইবরাহীমকে সত্যানুসারী বলে স্বীকার করে এবং তারা উভয়ে একথাও জানে যে, ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদের উদ্ভবের অনেক আগেই হযরত ইবরাহীমের যুগ শেষ হয়েছিল।

তাছাড়া আরবের মুশরিকরাও তাঁকে সত্যপন্থী বলে স্বীকার করতো এবং নিজেদের সকল প্রকার অজ্ঞতা সত্ত্বেও তারা অন্ততপক্ষে এতটুকু স্বীকার করতো যে, কাবাঘরের ভিত্তি স্থাপনকারী পাক-পবিত্র ব্যক্তি মূর্তি পূজারী ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক আল্লাহর অনুগত বান্দা।

১৪৩. এখানে যে মূল শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেটি হচ্ছে نسك । এর অর্থ কুরবানীও হয়। আর ব্যাপক ও সাধারণভাবে এটিকে বন্দেগী ও পূজা-অর্চনার অন্যান্য বিভিন্ন অবস্থার জন্যও ব্যবহার করা হয়।

১৪৪. অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের সমস্ত জিনিসের রব হচ্ছে আল্লাহ, কাজেই অন্য কেউ কেমন করে আমার রব হতে পারে? সমস্ত বিশ্ব-জাহান আল্লাহর আনুগত্য ব্যবস্থার অধীনে সচল রয়েছে এবং বিশ্ব-জাহানের একটি অংশ হিসেবে আমার নিজের অস্তিত্বও সে পথের অনুসারী। কিন্তু নিজের চেতনাসঞ্জাত ও নিজস্ব ক্ষমতা ইখতিয়ারের আওতাধীন জীবনের জন্য আমি অন্য কোন রবের সন্ধান করবো, এটা কেমন করে যুক্তিসংগত হতে পারে? সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক অবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করে আমি একাই কি অন্যদিকে চলতে থাকবো?

১৪৫. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই নিজের কাজের জন্য দায়ী। একজনের কাজের দায়-দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপবে না।

১৪৬. এ বাক্যটির মধ্যে তিনটি সত্য বিবৃত হয়েছে ঃ এক, সমস্ত মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। এ অর্থে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিলোকের বহু জিনিস মানুষের কাছে আমানত রেখেছেন এবং তা ব্যবহার করার স্বাধীন ক্ষমতা তাকে দান করেছেন।

দুই, আল্লাহ নিজেই এ প্রতিনিধিদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। কারোর আমানতের গণ্ডী ব্যাপক আবার কারোর সীমাবদ্ধ। কাউকে বেশী জিনিস ব্যবহারের ক্ষমতা দিয়েছেন, কাউকে দিয়েছেন কম। কাউকে বেশী কর্মক্ষমতা দিয়েছেন, কাউকে কম। আবার কোন কোন মানুষকে কোন কোন মানুষের কাছে আমানত রেখেছেন।

তিন, এ সবকিছুই আসলে পরীক্ষার বিষয়বস্তু। সারা জীবনটাই একটি পরীক্ষা ক্ষেত্র। আল্লাহ যাকে যা কিছুই দিয়েছেন তার মধ্যেই তার পরীক্ষা। সে কিভাবে আল্লাহর আমানত ব্যবহার করলো? আমানতের দায়িত্ব কতটুকু অনুধাবন করলো এবং তার হক আদায় করলো? কতটুকু নিজের যোগ্যতা বা অযোগ্যতার স্বাক্ষর রাখলো? এ পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে জীবনের অন্যান্য পর্যায়ে মানুষের মর্যাদা নির্ধারণ।